শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

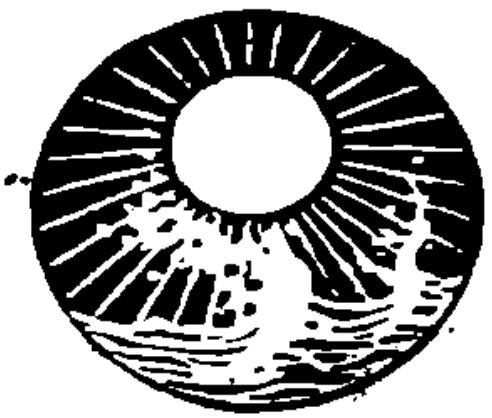

UNIVERSITY

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...	৫
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	...	১৮
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	২৪
নামবাদুলি	দিলীপকুমার রায়	৩৪
আমন্ত্রণ	শ্রীঅরবিন্দ	৩৫
ঈশ্বর		৩৬
দিব্য কর্মী		৩৬
মহাজাগতিক মানুষ		৩৭
গাছটি	"	৩৭
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৩৮
ছোট ছাসিকে লেখা শ্রীমা'র পত্র	রীণা মিত্র	৪৪
ছোটদের গল্প	শ্রীমা	৪৯

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

P 7.3 (4)

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

Freedom does not
come from outer
circumstances but
from inner liberation
Find your soul,
unite with it, let
it govern your life
and you will be free
blessings

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

২য় পর্ব : দ্বিতীয় পর্বটিক

১১শ সর্গ : বৃহত্তর মনোময় লোক এবং তাহার দেবতাবৃন্দ

(৪)

আরও মহিমান্বিত আরও দুঃসাহসিক উত্তরণ এবে—
ত্রিধা সোপানাবলীর বিস্তৃত শিখর অবধি
নিরাবরণ বাষ্পের পর বাষ্প উঠে চলে যেন পুঞ্জমন্ত্র দিগন্তর পুস্তরপুঞ্জ
ধ্বস্ত করে সব পথ করে নিয়ে চলেছে বিশুদ্ধ নিকল আকাশের দিকে।
মহিমার কতিপয় তারা চিন্তারাজ্যের এক্ষত্র অধিপতি,
সমগ্র আকাশ ঘন তাদের বিপুল বিশ্বদৃষ্টি,
নিরীক্ষণ করে চলে কালের বিরাট কর্মধারা :
সর্বাধার চেতনার প্রসার এক
ধারণ করে তার স্বচ্ছ আলিঙ্গনে সৎপুরুষকে।
জ্যোতির্ময় অনুশোর সঙ্গে তাদেরই আশ্রয়ে হয় যোগাযোগ,
বিশ্ব অবধি সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তারাই ধরে রাখে
স্রষ্টাপুরুষের অনুজ্ঞা যত
যেন চলে পৃথিবী যজ্ঞানে আর স্বর্গ সন্ধানে ;
তাদেরই চিন্তাবলী ভারী সব স্রষ্টাপুরুষের বিপুল বিন্যাসে।
মহান্ বিশ্বশান্তা চেতনা রয়েছে সেখানে,
মনোময় পুরুষ অবশে সেবা করে ঊর্ধ্বস্থ এক শক্তিকে ;
বাহকমাত্র সে, উৎস নয় কারও।
বিশ্বসৃষ্টি কালধারায় আকস্মিক ঘটনামাত্র নয় ;
প্রতি আকস্মিক উদ্ভবে রয়েছে অর্থ এক,
নিয়তির প্রতি নবরূপে রয়েছে যাত্রা।
এক মহাজ্ঞান এই যে রহস্যাশ্রয় জগৎ তাকে জানে এবং চালনা করে ;
সত্তা নিরীক্ষণ এক স্তরে সকল সত্তা সকল ঘটনাকে রূপ দেয় .
স্বয়ম্ভু মহাবাহু এক সৃষ্টির শিখরে,
শাশ্বতের কণ্ঠ যেন কালগত লোকমণ্ডলে,
পরাৎপরের যত সৃষ্টির বাণীবহ,
মূল ভাবনার অর্থ সে বপন করে রূপের আশ্রয়ে

আর সেই বীজ হতে কালের সন্তানেরা জন্মগ্রহণ করে।
আমাদের দৃষ্টির বাহিরে তুঙ্গস্থানে আসীন সর্বজ্ঞানময়
একটিমাত্র তবে অভ্রান্ত দৃষ্টি অবতরণ করে,
একটিমাত্র নীরব স্পর্শ পরম যোনি হতে
জাগিয়ে ধরে কর্মরত বিমূঢ় জ্ঞানের মধ্যে
গুপ্ত রয়েছে যে শক্তি নিশ্চেতন গভীরের তলে,
বাধা করে দৃষ্টিহারা দেবশক্তিকে ফুটে উঠতে,
নিয়ন্ত্রিত করে দেয় নির্বন্ধের ছন্দ নর্তন
যখন সে চলে যায় কালক্রমের চক্র অতিক্রম করে,
পার হয়ে যায় সীমাবদ্ধ দৃষ্টির শেষ সীমা,
নেমে যায় যুগ-যুগান্তরের ঘূর্ণমান পরিক্রমণের আশ্রয়ে।
বিশ্ব-আবর্তে দুর্গ্রাহ্য বলধারা সব
তাদের উন্মত্ত নৃত্যপর অঙ্গে অঙ্গে ধরে রাখে সেই স্থাণুতা
আদিম এক ভবিষ্যদ্দৃষ্টির যার নাম নিয়তি।
প্রকৃতির অজ্ঞান অবধি সত্যের যন্ত্র;
আমাদের শ্রমক্লিষ্ট অহংবোধ পরিবর্তন আনে না প্রকৃতির ধারায়
তবুও সে-অহং হল আমাদের অন্তরে সক্রিয় এক সচেতন শক্তি
আর ভাগ্যফল হল ইচ্ছাশক্তির পরিত্যক্ত সন্তান।
অভ্রান্তভাবে সত্যের নিরীক্ষা-নিয়ন্ত্রণে
সকল জীবই এখানে ব্যক্ত করে ধরে তাদের গুপ্ত আত্মাকে,
বাধ্য হয় তাই হয়ে উঠতে যা তারা লুকিয়ে রাখে আপন অন্তরে।
কারণ অন্তি যিনি তিনি কালের ধারায় বেড়ে ওঠেন আপনাকে ব্যক্ত করেন
আর নিহিত দেবশক্তি জীবকোষে বদ্ধ যিনি
তিনি উঠে চলেন আদিম প্রাণপঙ্ক হতে অমৃতত্ব অবধি।
গুপ্ত যদি-না, যদি-না মর্ত্যদৃষ্টি ধরে না তারে,
চিন্ময়ের সত্য অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয়,
অনুক্ত, ধরা পড়ে শুধু অন্তশ্চেতনার নয়নে।
নির্মুক্ত যবে অহং হতে মনোবুদ্ধি হতে তখনই শোনে সে মহাকণ্ঠ;
তখন দৃষ্টি চলে তার আলোক হতে নিত্য বৃহত্তর আলোকের ভিতর দিয়ে,
দেখে শাশ্বত ঘিরে রয়েছে মহাপ্রাণকে।
এই বৃহত্তর সত্য আমাদের চিন্তার অপরিচিত;
মুক্ত মহাজ্ঞান যেখানে কাজ করে চলে সেখানে চিন্তাবৃত্তিরা খোঁজে নিয়মের নির্দেশ;
চোখে দেখি আমরা শুধু যদৃচ্ছার চটুল নৃত্যপর লীলা
অথবা শৃঙ্খলবদ্ধ কষ্টশ্রম নিয়ম-নিগড়িত প্রকৃতির বশীভূত,
মূক চিন্তাহারা মহান্ শক্তির যথেচ্ছ শাসন।
দুরাকাঙ্ক্ষী তারা অনুভব করে সামর্থ্য তাদের ভগবৎ-মত্ত,

দুঃসাহসে তারা এগিয়ে চলে তাদের চিন্তা দিয়ে অধিকার করবে
সত্যের পূর্ণতম সত্তা ;
অনাদ্য দৃষ্টির অমূর্ত বিশুদ্ধি এক
নিষ্কল নিরাকার অনুভব
মনের মধ্যে তারা নিয়ে আসে মন পৌঁছে না যাদের কাছে,
আশা তাদের সত্যের পরম প্রতিষ্ঠা তারা জয় করবে।
এক ধারণা-নিবদ্ধ বাক্যের অদ্বিতীয় অনুজ্ঞা
স্থাপত্যসুলভ গঠনবৈভব, অবিকল্প-শ্রী
রূপায়িত করেছে অচিন্ত্যকে চিন্তাধারায়
নিরাবরণ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্নিশিখা চলে শুভ্র ডানা মেলে,
মানস শ্রবণ বহির্মুখী ছন্দের দোল হতে সরে গিয়ে
আবিষ্কার করেছে শাশ্বত বাক্ বহে যে বীজধ্বনি,
শোনে সেই ছন্দ সেই সঙ্গীত গড়ে যা সকল জগৎ,
অধিকার করেছে সকল বস্তুর অন্তরে বর্তিবার বিদেহী এষণা।
অপরিসীমকে তারা পরিমাপ করে সংখ্যা-দণ্ডে,
সীমাবদ্ধ জিনিসের অস্তিত্ব সূত্র অবধি তারা এসে পৌঁছেছে,
স্বচ্ছ ব্যবস্থার মধ্যে তারা রূপবদ্ধ করেছে অন্তহীন সত্য সব,
কালহীনকে তারা এনে ধরেছে কালগত গণনার মধ্যে,
মূল্যাতীত পরমপদের দিয়েছে মূল্যনির্দেশ।
অনবধারণীয় আনন্ত্য-সকলের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ও স্থিতি করে দেয় তারা,
তুলে ধরে তাই চিন্তার ও বাচনের অনতিক্রমণীয় প্রাচীর সব,
একটা শূন্যস্থান করে দিয়েছে এককে ধরে রাখবার জন্য।
দৃষ্টির সম্মুখে তারা ধেয়ে চলেছে রিক্ত এক শিখর অভিমুখে,
এক হিমশীতল রবিকরোজ্জ্বল বিপুল আকাশের পানে।
তাদের করণীয়কে একীভূত করে ধরবে বলে জীবনধারাকে সরিয়ে রেখে—
কারণ জীবন অনাবৃত গৃহৎকে ধারণ করতে অক্ষম—
তারা বহুলকে শূন্যে পরিণত করেছে,
নেতির মধ্যে তারা সর্বেতির অর্থ লাভ করে
আর অভাবের মধ্যে পরমভাব।
একমাত্র বিধি সরল করে ধরেছে বিশ্বরচনা,
বিপুলা প্রকৃতিকে একই সূত্রের মধ্যে নিবদ্ধ করেছে ;
তাদের আনুমিক পরিশ্রম সকল জ্ঞান এক করে ধরেছে,
আত্মার বিচিত্র গতি মানস বীজগণিতে ধরে দিয়েছে,
জীবন্ত ভগবানকে দিয়েছে বস্তুহীন তত্ত্বের রূপ।
মনের জ্ঞান-বিজ্ঞান এখানেই শেষ হয়েছে ; নিজেকে পূর্ণ বলে অনুভব করেছে ;
চিন্তা করবার জানবার কিছুই অবশিষ্ট নাই আর ;

আধ্যাত্মিক শূন্যে নিজেকে রাজাসনে স্থাপন করেছে,
তার বিশাল নীরবতাকে গ্রহণ করেছে পরম অনির্বচনীয়রূপে।

এই হল চিন্তাবৃত্তির উদ্ভ্রান্ত দেবতাদের লীলা।
কালের মধ্যে তারা আকর্ষণ করেছে কালহীন জ্যোতিকে,
শাশ্বতকে বন্দী করেছে নিমেষাবলীর মধ্যে,
এ পরিকল্পনা তাদের, সত্যের পদক্ষেপ বেঁধে দেবে তারা
ধারণার বাক্যের হিরণ্ময় জালে,
ক্রীতদাসী করবে সেই দেবীকে চিন্তাশীলের আনন্দের জন্য
অমর স্বপ্নাবলীগঠিত তার ক্ষুদ্র জগতে :
সেখানেই তিনি বাস করবেন মানুষী মনের কারাগারে,
সম্রাজ্ঞী যিনি বন্দিনী হবেন তিনি তাঁর প্রজার ঘরে,
পূজিতা বিশুদ্ধা অচল-অটল তিনি তার হৃদয়-সিংহাসনে,
এই হল তার মহান্ সম্পত্তি সযত্নে সুদূরে রেখেছে সে
নীরবতার ঘের দিয়ে তার গুপ্ত অনুপ্রেরণার মধ্যে,
এই যে নিষ্কলঙ্কা শুভ্রা দেবী
চিরকাল এক, চিরকাল অদ্বিতীয়,
এই হল তার সনাতন মহাদেবী, নিত্য করে পূজা তাঁর।
অথবা, তার মনের একনিষ্ঠ সঙ্গিনী
দিয়ে চলেন সম্মতি তার প্রকৃতি ও সংকল্প অনুসারে,
তিনিই দিয়ে চলেন অনুমতি, অনুপ্রাণিত করেন তার বাক্য এবং কর্মরাজি,
তাদের অনুরণন প্রতিধ্বনিত করে তোলেন উদ্গ্রীব শ্রবণে,
তার পথের সহচরী তিনি, তার পথের আলেখ্য এঁকে চলেন তিনি
পার হয়ে মানসের প্রাণের উদ্ভ্রান্ত দেশ এক
শাশ্বত কাল হতে খণ্ডিত অংশ এক।
সৎপুরুষের তুরন্ত বিজয়ী নক্ষত্রের সাক্ষী,
দেবার শক্তিময়ীর সেবিকা রাজসিংহাসনে আসীন মহান্ এক ভাবনার,
তার প্রকৃতিরই সহায়ে পুরুষ শাসন করবে এক অবনত সৃষ্টি ;
পুরুষেরই কর্মরাজির ধারণারাজির নির্বাহক
শক্তিময়ী প্রদান করে ঘরে পুরুষের দিব্য অধিকার—
চালনা করবার শাসন করবার।
অথবা প্রিয় যেমন তার একমাত্র প্রিয়াকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করে,
তার জীবনের পূজার ও কামনার ইষ্ট যেন,
তার হৃদয়ের আরাধনার একমাত্র বিগ্রহ,
শক্তিময়ী তেমনি এখন হয়েছে পুরুষেরই বস্তু, কেবল তারই জন্য :
শক্তিময়ীর পুলক যকৃৎনাৎ তাকে ঘিরে ধরেছে,

তার করতলগত হয়েছে অশেষ আশ্চর্য এক পরম তৃপ্তি নিয়ে,
মহান্ প্রলোভন এক অপরূপ ঘড়া এক নীড়বদ্ধ হয়েছে।
শক্তিময় এখন অবশেষে অধিকার করেছে শক্তিময়ীকে
সুদীর্ঘ উন্নত অনুসরণের পর,
তার দেহের তার অন্তরাত্মার একমাত্র আনন্দ :
শক্তিময়ীর দিব্য আকর্ষণ অনতিক্রমণীয়,
তাঁর বিপুল সম্পদ মৃত্যুঞ্জয়ী শিহরন,
সাধকতা আর উল্লাস
তাঁর আত্মপ্রকাশে বিভিন্ন ভাবের বিপুল আবেগ,
অলৌকিক মহিমা আর বৈচিত্র্য,
তাঁর দেহকে নিত্য নূতন করে ধরে শক্তিময়ের দৃষ্টিতে,
অথবা পুনরাবৃত্তি করে প্রথম মোহকর স্পর্শের,
তাঁর রহস্যভরা বক্ষের উদ্ভাসিত পুলক
তাঁর সুঘম চলন্ত অঙ্গাবলী একটা জীবন্ত ক্ষেত্র
যেখানে ঘটে প্রাণবন্ত অন্তহীন নব নব আবিষ্কার।
নূতন এক আরম্ভ ফুটে ওঠে বাক্যে আর হাস্যে,
নূতন এক শোভা ফিরিয়ে আনে পুরাতন ঐকান্তিক পুলক
পুরুষ হারিয়েছে আপনাকে প্রকৃতির মধ্যে, প্রকৃতি হল পুরুষের স্বর্গ এই এখানে।
সত্যের হাসি ছড়িয়ে পড়েছে এই কমনীয় সোনালী লীলার পরে।
শক্তিময়ী তাঁর শুরু চিরন্তন প্রসার সব থেকে আনত হয়েছেন,
সীমাহীন মহাদেবী নতি স্বীকার করেছেন যেন,
এনে ধরেছেন তাঁর গুপ্তরহস্যের সূর্যস্নাত মাধুর্য।
শক্তিময়ের আলিঙ্গনে আপনার সৌন্দর্যকে দেহবদ্ধ করে
তাঁর অমর অধরোষ্ঠে ক্ষণতরে চুম্বন গ্রহণ করেছেন,
টেনে নিয়েছেন আপন বক্ষোপরে মহিমাময় এক মর্ত্য-শিরোভার
চিন্ময়ী পৃথিবীকে তাঁর আপন ভবন করে নিয়েছেন
স্বর্গ অবধি যাঁর কাছে ছিল একান্ত ক্ষুদ্র।
মানুষী বক্ষের মধ্যে জীবন্ত তাঁর গুপ্ত অধিষ্ঠান ;
আপন সত্তা থেকে পুরুষ কেটে তুলেছে চিন্ময়ীর রূপে আপনার রূপ
চিন্ময়ী আপন দেহের রূপ দিয়েছে এক মনোময় আলিঙ্গনে।
মনের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধের মধ্যে নেমেছে চিন্ময়ী ;
তাঁর আপন মহত্ত্ব নিষ্পেষণে ধরা দিয়েছে
মানস ভাবনার ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে,
নিঃসঙ্গ মনোময় জীবের করতলের বদ্ধ অবকাশে ;
আপন সমুচ্চ শিখর সব নামিয়ে ধরেছেন আমাদের অন্তরাত্মার পরিমাণে,
আমাদের চোখের পাতা ধাঁধিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বর্গের নিরিখ দিয়ে।

প্রত্যেকেই তাই তৃপ্ত তার এই সমুচ্চ অধিকারে,
মনে করে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে গিয়ে ধন্য হয়েছে সে,
সত্যের অধিরাজ সে, পেয়েছে নিজস্ব সিংহাসন।
চিন্ময়ীর অধিকারী যে কালের ক্ষেত্রে
তাঁর মহিমার যে-কণামাত্র দীপ্তি পেয়েছে সে
তাই মনে হয় যেন একমাত্র সত্য জ্যোতি, তারই আপন সুষমার পূর্ণ প্রজ্বলন্ত মূর্তি।
কিন্তু চিন্তাবৃত্তির বা বাক্যের সামর্থ্য নাই শাশ্বত সত্যকে ধরবার :
তার সূর্যের একটিমাত্র নিঃসঙ্গ রশ্মির মধ্যে সমস্ত জগৎ জীবনধারণ করে।
আমাদের মননের সংকীর্ণ, চারিদিকে বদ্ধ, প্রদীপে আলোকিত কক্ষে
আমাদের রুদ্ধ মর্ত্য-মনের আত্মপ্রসাদ
স্বপ্ন দেখে—আমাদের চিন্তার শৃঙ্খল তাকে বেঁধে রেখেছে আমাদের আপন করে ;
আমরা গণনা করি শুধু আমাদের উজ্জ্বল শৃঙ্খলের সঙ্গে :
সত্যকে বেঁধে ধরি যখন তখন আমাদের নিজেদেরই বেঁধে রাখি।
একটি জ্যোতির্ময় বিন্দুর মায়াবশে অভিভূত হয়ে
আমরা দেখি না কি ক্ষুদ্র মূর্তি একখানি তার ধরে রয়েছি ;
অনুভব করি না তার অনুপ্রেরণাময় বশীভূতা,
তার মৃত্যুহীন স্বাধীনতায় ভাগ নেই আমাদের।
এই হল সত্য দ্রষ্টার পক্ষেও, ঋষির পক্ষেও ;
কারণ মানুষীভাব ভাগবত ভাবকে এখনও সীমাবদ্ধ করে রাখে
আমাদের চিন্তাবলী হতে মুক্ত হয়ে আমাদের উঠে যেতে হবে দ্রুতবেগে
দিব্যদৃষ্টির মধ্যে,
নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে হবে তারই ভাগবত সত্যের সীমাহীন দিব্য বাতাস,
স্বীকার করে নিতে হবে তার সহজ বিপুল অধিরাজত্ব,
সাহসে ভর করে আত্মসমর্পণ করতে হবে তার সর্বাধিকারিত্বের কাছে।
তখনই অব্যক্ত তার রূপ প্রতিফলিত করে
নিস্তব্ধ মনের জীবন্ত দর্পণে যেন ;
কালাতীত কিরণরেখা অবতরণ করে আমাদের হৃদয়তলে,
আমরা মুগ্ধ হয়ে ডুবে যাই অনন্তের মধ্যে।
ভাগবত সত্য তার রূপাবলী অপেক্ষা বৃহত্তর, মহত্তর।
সহস্র বিগ্রহ তার প্রস্তুত করা হয়েছে,
যত প্রতিমূর্তি তারা পূজা করে তাদেরই মধ্যে পায় তাকে তারা ;
তবু সে রয়ে যায় আপনি আপনা, অন্তহীন।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—২৭শ সূক্ত

১। অনশ্বন্তা সৎপতির্মমহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ।
ত্রৈবৃষ্কো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈর্বৈশ্বানর ত্র্যরুণশ্চিকেত ॥১॥

অনশ্বন্তা—শকটযুক্ত
সৎপতিঃ—সত্তার অধিপতি
মমহে—দিয়েছে, দান করেছে
মে—আমাকে
গাবা—গাভীযুটি
চেতিষ্ঠঃ—পূর্ণ চেতনাময়
অসুরঃ—বলবান, বলশালী
মঘোনঃ—প্রাচুর্যময়
ত্রৈবৃষ্কঃ—বৃষত্রয়ের সন্তান
অগ্নে—হে অগ্নি
দশভিঃ—দশ
সহস্রৈঃ—সহস্রের সঙ্গে
বৈশ্বানর—হে বিশ্বশক্তি
ত্রি-অরুণঃ—ঊষাত্রয়ী (সহ)
চিকেত—সচেতন হয়েছে

শকটের সঙ্গে যুগলগাভী তিনি আমাকে দিয়েছেন, সত্তার অধিপতি যিনি, যিনি পরম চেতনাময়, যিনি বীর্যময় বিত্তশালী। হে অগ্নি, বৃষত্রয়ী জনক তোমার, দশ সহস্রকে সঙ্গে লয়ে হে বিশ্বশক্তি, ঊষাত্রয়ীরূপে তুমি জাগ্রত হয়েছ ॥১॥

দ্রষ্টব্য : বৃষত্রয়ী : ইন্দ্র, যিনি স্বর্লোকের বা দিব্যমানসের তিনটি ভুবনের বা স্তরের অধিপতি।
ঊষাত্রয়ী : তিনটি লোকে পরাজ্ঞানের উদয়
গাভী : জ্ঞানজ্যোতি—জ্ঞানের ও শক্তির (দক্ষিণ ও বাম)—দুটি অশ্বের (প্রাণশক্তি) সঙ্গে তুলনীয়।

২। যো মে শতা চ বিংশতিং চ গোনাং হরী চ যুক্তা সুধুরা দদাতি।
বৈশ্বানর সুষ্টুতো বর্ধমানোঽগ্নে যচ্ছ ত্র্যরুণায় শর্ম ॥২॥

যঃ—যে, যিনি
মে—আমাকে
শতা—শত
চ—আর
বিংশতিম্—বিংশতি
চ—আর
গোনাম্—গাভীদের
হরী—অশ্বদুটি
চ—আর
যুক্তা—যুক্ত
সুধুরা—সুষ্ঠু ধুরিযুক্ত
দদাতি—দান করে
বৈশ্বানর—হে বিশ্বশক্তি
সুস্তুতঃ—মনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে
বর্ধমানঃ—বর্ধিত হয়ে
অগ্নে—হে অগ্নি
যচ্ছ—দান কর
ত্রি-অরুণায়—উষাত্রয়ীকে
শর্ম—সুখশান্তি

যে আমাকে দিয়েছে শতবিংশতি গাভীরূপী আলোরশ্মি আর যোগ্য শকটে সংযুক্ত জ্যোতির্ময় অশ্বদুটি, হে অগ্নি, মনমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমবর্ধিত হয়ে উষাত্রয়ীকে তুমি সুখশান্তি দাও ॥২॥

৩। এবা তে অগ্নে সুমতিং চকানো নবিষ্ঠায় নবমং ত্রসদস্যুঃ।
যো মে পিতস্ত্রিবিধাতস্য পূর্বীর্ঋতেনাভি ত্র্যরুণো গৃণাতি ॥৩॥

এব—এই রকমে
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
সুমতিম্—সুবুদ্ধি
চকানঃ—আকাঙ্ক্ষা করে
নবিষ্ঠায়—নবপ্রতিষ্ঠিতের জন্য
নবমম্—নবতম
ত্রসদস্যুঃ—শত্রুর ধ্বংসকারী
যঃ—যে

মে—আমার
গিরঃ—বাক্যাবলীর
তুবিজাতস্য—বহুজন্ম যার তার
পূর্বীঃ—বহুল
যুক্তেন—মনসংযোগে, অভিনিবেশ সহকারে
ত্রি-অরুণঃ—উষাত্রয়ী
অভি-গৃণাতি—প্রত্যুত্তর দিয়েছে

এই রকমে, হে অগ্নি, শত্রুদমন্বিতা কামনা করে তোমার নবতম শোভনমতিকে সেই নবপ্রতিষ্ঠিতের জন্য, সেই যে সনাথ উষাত্রয়ী আমার বহুল জন্মের বহুল বাক্যাবলীর প্রত্যুত্তর দিয়েছে পরম অভিনিবেশ সহকারে ॥৩॥

৪। যো ম ইতি প্রবোচত্যশ্বমেধায় সূরয়ে।
দদদৃচা সনিং যতে দদন্মেধামৃতায়তে ॥৪॥

যঃ—যে
মে—আমায়
ইতি—তথাস্তু
প্রবোচতি—বলে উত্তর দিয়েছে
অশ্বমেধায়—অশ্বমেধযজ্ঞ-সাধককে
সূরয়ে—দিব্যদ্রষ্টাকে
দদৎ—যেন দান করে
ঋচা—জ্ঞানোজ্জ্বল বাক্যের সহায়ে
সনিম্—বিজয় বা সিদ্ধি
যতে—চলেছে যে তার জন্যে
দদৎ—দেয় যেন, দান করে যেন
মেধাম্—সুবুদ্ধি
ঋতায়তে—সত্যকামীকে, সত্যজিজ্ঞাসুকে

আমাকে ফিরে বলেছে যে 'তথাস্তু', সে যেন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন অশ্বমেধ-যাজ্ঞিককে জ্যোতির্ময় মন্ত্রের সহায়ে দান করে তার যাত্রাসিদ্ধিকে, সত্যজিজ্ঞাসুকে দান করে যেন সত্য বুদ্ধি ॥৪॥

৫। যস্য মা পরুষাঃ শতমুদ্ধর্ষয়ন্ত্যক্ষণঃ।
অশ্বমেধস্য দানাঃ সোমা ইব ত্র্যাশিরঃ ॥৫॥

যস্য—যার
মা—আমাকে
পরুষাঃ—সমর্থ, বলবান
শতম্—একশত

উৎ-হর্ষয়ন্তি—উর্ধ্বে পবন হর্ষের দিকে নিয়ে চলে
উক্ষণঃ—অভিবর্ষণকারী বৃষভ
অশ্বমেধস্য—অশ্বমেধযজ্ঞের
দানাঃ—দানরাজি
সোমাঃ ইব—সোমরস বা পরমানন্দ যেন, আনন্দ-মদিরা যেন
ত্রি-আশিরঃ—মিশ্রণত্রয় যুক্ত

শত সমর্থ বৃষভ বিকীর্ণ হয়ে আমাকে ঊর্ধ্বে আনন্দের মধ্যে তুলে ধরেছে, অশ্বযজ্ঞে দান সব হল যেন ত্রিধানিশ্রিত আনন্দ-মদিরা ॥৫॥

Notes: অশ্বযজ্ঞ হল প্রাণশক্তির উৎসর্গ। তার বিকিরণ বা প্রসারণ হল তার যাবতীয় বৃত্তির প্রকাশ। শতসংখ্যা হল পূর্ণতাজ্ঞাপক। প্রাণ হল ভোগসামর্থ্য, তা নিয়ে চলে পূর্ণ নিদ্দে। সোমরস ত্রিধানিশ্রিত—গো-দধি-যব—গো হল জ্যোতি, দধি হল মনো-বুদ্ধির মধ্যে সেই জ্যোতির স্থিরপ্রতিষ্ঠা আর যব হল স্থূলবনে তাদের জ্যোতি-রূপায়ণ।

৬। ইন্দ্রাগ্নী শতদাব্ন্যশ্বমেধে সুবীর্যম।
ক্ষত্রম্ ধারয়তং বৃহদ্দিবি সূর্যমিবাজরম্ ॥৬॥
ইন্দ্রাগ্নী—ইন্দ্র (দিব্য মানস) অগ্নি (দিব্য তপঃশক্তি)
শত-দাবি—শতবিধ দাতাকে
অশ্বমেধে—অশ্বমেধযজ্ঞকারীর মধ্যে, যজমানের মধ্যে
সুবীর্যম্—পূর্ণ বীর্য
ক্ষত্রম্—শৌর্য
ধারয়তম্—ধারণ করে থাকে যেন
বৃহৎ—বৃহৎ, বিপুল, বিশাল
দিবি—স্বর্লোকে, স্বর্গলোকে
সূর্যম্ ইব—সূর্যের মত
অজরম্—অক্ষয়

হে ইন্দ্র-অগ্নি, শতধা দান করে যে যজমান তার মধ্যে তুমি ধরে রাখ পূর্ণ বীর্য, বিশাল শৌর্য, আকাশে অক্ষয় সূর্যের মত ॥৬॥

৫ম মণ্ডল—২৮শ সূক্ত

১। সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঞ্চুড়ুষসমুর্বিয়া বি ভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্ববারা নমোভির্দেবী ঈড়ানা হবির্দা ঘৃতাচী ॥১॥
সম্-ইদ্ধঃ—সমিদ্ধ, প্রজ্বলিত
অগ্নিঃ—অগ্নি

দিবি—দ্যুলোকে
শোচিঃ—তেজঃপ্রভা
অশ্রেৎ—লাভ করেছে
প্রত্যঞ্চ্—অভিমুখে
উষসম্—উষায়
উর্বিয়া—বিশাল হয়ে, ব্যাপক হয়ে, বিস্তীর্ণ হয়ে
বি-ভাতি—উদ্ভাসিত হয়েছে, উদ্ভাসিত হয়েছে
এতি—এসেছে
প্রাচী—ঊর্ধ্বমুখী
বিশ্ববারা—বিশ্ববারা, যাবতীয় বরণীয় বস্তুতে পরিপূর্ণ
নমোভিঃ—প্রণতি দিয়ে
দেবান্—দেবতাদের
ঈড়ানা—পূজয়িত্রী, পূজা করে, আকাঙ্ক্ষা করে
হবিষা—আহুতি দিয়ে
ঘৃতাচী—স্বচ্ছভাস্বা, চিদ্‌ঘন

অগ্নি সম্যক প্রজ্বলিত হয়েছে, স্বর্গে সে লাভ করেছে তার শুদ্ধ দীপ্তি, উষাকে সম্মুখে রেখে বিপুল হয়ে সে উদ্ভাসিত। সকল বরণীয় বস্তু নিয়ে সে এসেছে দেবী, চলেছে ঊর্ধ্বে, দেবতাদের সে আকাঙ্ক্ষা করে তার প্রণতি দিয়ে তার আহুতি দিয়ে, সে হয়ে উঠেছে চিদ্‌ঘন ॥১॥

২। সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্কৃণ্বন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎ পুরঃ ॥২॥

সমিধ্যমানঃ—সমিদ্ধ হয়ে
অমৃতস্য—অমৃতত্বের
রাজসি—রাজা হও তুমি
হবিঃ-কৃণ্বন্ত্—আহুতিদাতা, যজ্ঞকর্তা
সচসে—ধরে থাক তুমি
স্বস্তয়ে—তার সুস্থিতির জন্য
বিশ্বম্—যাবতীয়
সঃ—সে
ধত্তে—ধারণ করে
দ্রবিণম্—সারবস্তুকে
যম্—যাকে
ইন্বসি—গ্রহণ কর
আতিথ্যম্—অতিথিরূপে
অগ্নে—হে অগ্নি

নি-ধত্তে—ধারণ করে, স্থাপন করে
চ—আর, এবং
ইৎ—নিশ্চয়ার্থে
পুরঃ—সম্মুখে

যখন তুমি প্রজ্বলিত হও তখন তুমি অমৃতত্বের রাজা হয়ে দেখা দাও, আহুতি-দাতাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে রাখ তার সুখস্থিতির জন্য। হে অগ্নি, যাবতীয় সারবস্তু ধারণ করে সে যার আতিথ্য তুমি গ্রহণ করেছ, সে অন্তরে তোমাকে স্থাপন করে সম্মুখে রেখে ॥২॥

৩। অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুয়মমা কৃণুষ্ব শত্রুয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥৩॥

অগ্নে—হে অগ্নি
শর্ধ—শৌর্য তোমার প্রকট কর
মহতে—বিপুল
সৌভগায়—আনন্দভোগের, ভোগানন্দের জন্য
তব—তোমার
দ্যুম্নানি—দ্যুতিরাজি
উত্তমানি—সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমোত্তম
সন্তু—হয়ে উঠুক
সম্ জাস্পত্যম্—জায়া-পতির সম্মিলনকে
সুয়মম্—সুনিয়ন্ত্রিত
আ কৃণুষ্ব—করে ধর
শত্রুয়তাম্—শত্রুতাকারীদের, আততায়ীদের
অভি তিষ্ঠ—দমন করে রাখ, দমিত রাখ
মহাংসি—মহাবল

হে অগ্নি, শৌর্যশালী হয়ে ওঠ বৃহৎ ভোগসামর্থ্যের জন্য, তোমার দীপ্তিরাজি সর্বো-ত্তম হয়ে উঠুক, জায়াপতির সম্মেলন সুনিয়ন্ত্রিত করে ধর, আর শত্রুতা করে যারা তাদের মহাবল দমন করে রাখ ॥৩॥

৪। সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ম্।
বৃষভো দ্যুম্নবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে ॥৪॥

সমিদ্ধস্য—প্রজ্বলিত যে তার
প্র-মহসঃ—মহত্তম (তোমার), তেজিষ্ঠ
অগ্নে—হে অগ্নি
বন্দে—বন্দনা করি
তব—তোমার
শ্রিয়ম্—শ্রীকে

বৃষভঃ—বৃষভ
দ্যুম্নবান্—দ্যুমান, দ্যুতিমান
অসি—হও তুমি
অধ্বরেষু—যজ্ঞযাত্রায়
সম্-ইধ্যসে—সমিদ্ধ হয়ে ওঠ তুমি

যে অগ্নি, প্রজ্বলিত তুমি, মহত্তম তুমি, তোমার স্তুতি আমি বন্দনা করি, হে বৃষরাজ, জ্যোতির্ময় হয়ে তুমি যজ্ঞযাত্রায় নিঃশেষ সমিদ্ধ হয়েছ ॥৪॥

৫। সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্বধ্বর।
ত্বং হি হব্যবাড়সি ॥৫॥

সমিদ্ধঃ—সমিদ্ধ
অগ্নে—হে অগ্নি
আহুত—আহুতিবান
দেবান্—দেবতাদের
যক্ষি—যাজন কর
সু-অধ্বর—পূর্ণ যজ্ঞসাধক
ত্বম্—তুমি
হি—নিশ্চয়
হব্যবাট্—হব্যবাহক
অসি—হও

হে অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হয়েছ, আহুতি গ্রহণ করেছ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সাধন কর, তুমি পূর্ণ যজ্ঞসাধক, তুমিই হলে আহুতি-বাহক ॥৫॥

৬। আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রযত্যধ্বরে।
বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্ ॥৬॥

আ-জুহোতা—আহুতি অর্পণ কর
দুবস্যত—সেবা কর
অগ্নিম্—অগ্নিকে
প্রযতি—অগ্রগামী
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়
বৃণীধ্বম্—বরণ কর
হব্যবাহনম্—এই হব্যবাহনকে

আহুতি অর্পণ কর, অগ্নির সেবা কর, যজ্ঞযাত্রায় এগিয়ে চলেছে যে বরণ কর সেই হব্যবাহনকে ॥৬॥

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা)

৪৮৫—ভগবানের প্রতি ভালোবাসা ও মানুষের প্রতি উদারতা ও দরদ, এই হলো জ্ঞানলাভের প্রথম পীঠ।

৪৮৬—যে কোথাও কোন ব্যর্থতা ও দোষত্রুটি দেখলেই নিন্দা করে, সে স্বয়ং ভগবানেরও নিন্দা করছে, আর আপন আত্মাকে সংকুচিত ক'রে দৃষ্টিকেও প্রতারিত করছে। নিন্দা বিচার না ক'রে প্রকৃতিকে ঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করো, ভাইবোনদের সাহায্য ও সুযোগ পেতে দাও, সহানুভূতির দ্বারা তাদের মধ্যে সামর্থ্য ও সাহস বাড়িয়ে দাও।

৪৮৭—নরনারীর উপর প্রীতি, সকল প্রতিবেশীকে ভালোবাসা, আর মাতৃভূমিকে ভক্তি করা, পশুপক্ষীদের ভালোবাসা, প্রত্যেক মানুষকেও ভালোবাসা, এ সমস্তই হলো নানাভাবে সেই ভগবানকেই ভালোবাসা, তাঁর নানারূপ বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তিতে। আপন ভালোবাসাতে বলী হয়ে থেকে সব কিছু উপভোগ করো, আর সকলকে ভালোবেসে সকলকেই সাহায্য দান করো।

৪৮৮—যদি নিজের ভিতরে এমন কিছু থাকে যাকে কোনোমতে শোধরানো যাচ্ছে না কিংবা যা ভগবানের ছবিটা নিতে পারছে না, তাকে সজোর টেনে উপড়ে ফেল, কিন্তু হৃদয়কে কোমল রেখে। এবং তার আগে এই বিশেষ কথাটি মনে রেখো যে তোমার ধারালো কৃপাণ ও কর্তব্যবুদ্ধি দুইই সেই ভগবানই দিয়েছেন।

৪৮৯—আমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবো সে আমার কাছের মানুষটি বলে নয়, কারণ কাছের আর দূরের মধ্যে তফাৎ কি আছে? আর শাস্ত্রে যে বলে দিয়েছে প্রতিবেশী আমার ভাই, সেজন্যও নয়, কারণ এ কথার ভিত্তি কোথায়? কিন্তু আমি যে তার মধ্যে নিজেকে দেখি সেইজন্যই তাকে ভাই বলব। নতুবা রক্তের সম্পর্কে, বা স্বদেশের সম্পর্কে যতই কেন ভাই বলো, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন যখন এসে পড়ে তখন কোথায় থাকে সেই ভ্রাতৃভাব? কেবল যখন ভগবানের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তাঁর বিশ্বময় ছবির সঙ্গে মিলে যাই তখন সকল ভাই-এর উপর ভালোবাসা হয় খাঁটি সুগভীর স্বার্থশূন্য, অনিবার্য ও অটুট।

না পরস্পরকে ভালোবাসার পক্ষে যে কোনোরকম মানবীয় কৈফিয়ৎ দেওয়া হোক, তার বিশেষ কিছু সত্য মূল্য নেই। ভগবৎ চেতনা পেয়ে তাঁর সঙ্গে মিলতে পেরে তবেই সকলের সঙ্গে মিলন ও মৌলিক ঐক্য যথার্থ উপলব্ধি হতে পারে। ২০-৪-১৯৭০

৪৯০—আমি যখন কৃষ্ণের মধ্যে ডুবে থাকি তখন আমার নিজের অহংবুদ্ধি ও স্বার্থজ্ঞান

কোথায় তলিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন কেবল স্বয়ং তিনিই আমার সেই অতল গভীর প্রেমের ঠিকানা করতে পারেন।

৪৯১—কৃষ্ণের মধ্যেই থাকতে পারলে তখন শত্রুর শত্রুতাও প্রেমলীলা আর ভাই ভাইতে লড়াইও কুস্তির খেলাতে পরিণত হয়।

৪৯২—আত্মা যার উচ্চ দিব্যানন্দের আস্বাদ পেয়ে গেছে, জীবন তার কখনই অশুভ বা দুঃখ-ভরা বা মরীচিকাময় হতে পারেনা। তখন সারা জীবনটাই তার সেই পরম প্রেমিক ও খেলার সাথীর সংসর্গে থেকে নিত্য হাসি প্রেমের হিল্লোলে তরঙ্গিত হতে থাকে।

মা সকল অবস্থাতেই ভগবৎ সংযোগ বজায় রাখতে জানা, তাই হলো দিব্যানন্দের সন্ধান মেলার গুপ্তরহস্য। ২১-৪-১৯৭০

৪৯৩—ভগবানকে অদেহী অনন্ত অনাদি জেনেও কি তাঁকে তেমনিভাবে ভালোবাসতে পারবে যেমন ক'রে তুমি আপন প্রিয়াকে ভালোবাসো? তুমি তা যদি পারো তো জানবে যে সেই অনন্তের চরম সত্যটি তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আর পারো কি সেই অনন্তকে এমন দেহের আলিঙ্গন দিয়ে জড়াতে ও ধরতে যাতে চোখে দেখা ও ছোঁয়ার মতো সকল দেহের মধ্যেই তাঁকে প্রত্যক্ষে মেলে? তাহলে জেনো যে সব চেয়ে উদার ও গভীর সত্যকে তুমি পেয়ে গেছ।

৪৯৪—দিব্য প্রেম একযোগে কাজ করে দুই ভাবে—বিশ্বগত ক্রিয়াতে তা মহা-সমুদ্রের মতো গভীর প্রশান্ত অতলস্পর্শী-রূপে জগৎব্যাপক হয়, আর সকলের উপরেই সমান-ভাবে আছড়ে পড়ে সেই সমুদ্রের নর্তনশীল উল্লসিত ঢেউগুলির মতো,—আর যাকে সে বিশেষ বেছে নেয় তার উপরে সফেন ধারা সিঞ্চনে ও প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তাকে আচ্ছন্ন আপ্লুত ক'রে রাখে।

মা: শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের অনুভূতির কথা এমন বহু ব্যঞ্জনা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু ভগবৎ মিলনের যে পরম বিস্ময় তা সকল ব্যঞ্জনাকে ছাপিয়ে যায়।

২৩-৪-১৯৭০

৪৯৫—ব্যথা জিনিসটাকে আমি সর্বদাই ভয় ক'রে ও ঘৃণা ক'রে তার সব দুর্গতিকে এড়াতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে তখন যদি সেগুলোতে না ভুগতাম তাহলে সমুচিত শিক্ষার দ্বারা এমন দুরন্ত হয়ে উঠে আমার হৃদয়-মন-দেহে এমন বিচিত্র ও অসীম রকমের আনন্দ উপভোগ করবার মতো ক্ষমতাই লাভ করতে পারতাম না। ভগবান গোড়াতে খুবই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারীর মতো আচরণ করলেও অবশেষে তার কি সার্থকতা তা দেখিয়ে দেন।

৪৯৬—আমি আগে এই পণ করেছিলাম যে জগতের যত রকমের দুঃখ দুর্গতি আর নিষ্ঠুরতা ও নির্বোধিতা ও অন্যায়গুলোতে কিছুমাত্র কাতর না হয়ে সহ্যগুণে হৃদয়কে যাঁতার

পাথরটার মতো কঠিন ক'রে মনটাকে পালিশ করা চকচকে ইস্পাতের মতো মসৃণ ক'রে রাখব। তার ফলে আর কাতর হতাম না বটে কিন্তু ভালোমন্দের বিচিত্র আস্বাদলাভ থেকে বঞ্চিত হলাম। তারপরে ভগবান দিলেন আমার হৃদয়কে ভেঙে মনের উপর লাঙল চালিয়ে। অত্যন্ত নির্মম ও নিরন্তরের পীড়নের ভিতর দিয়ে পেকে শেষে উঠে গেলাম এক নির্বেদন আনন্দের মধ্যে,—শোক দুঃখ অভিযোগ ও বিদ্রোহের পর্বের ভিতর দিয়ে উঠে গেলাম অনন্ত জ্ঞান ও অনাবিল শান্তির মধ্যে।

মা এও সেই এক কথা, ভগবান যার মধ্যে রূপান্তর আনেন তাকে এইভাবে ভুগিয়ে শোধন। ২৩-৪-১৯৭০

৪৯৭—আমি যখন দেখলাম যে ব্যথা আসলে আনন্দেরই উল্টো পিঠ আর তাতে সমুচিত শিক্ষা হয়, তখন ভগবানের দেওয়া নির্যাতনকে নিতান্ত বৃথা নিষ্ফলা ও দীর্ঘ বিলম্বিত ভেবে আমি আরো তীব্রভাবে বেশি ক'রে নিজেকে সর্বাংশে মোক্ষম রকমের আঘাত দিয়ে জর্জরিত ক'রে ফেলতে শুরু করলাম। আমার পরম প্রিয় তখন এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন—"থাক থাক, আমি যেগুলো দিচ্ছি তোমাকে সেইগুলোই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।"

৪৯৮—আগেকার কালের সন্ন্যাসী ও প্রায়শ্চিত্তকারীর দল কেরকমভাবে আত্মনিগ্রহ করতো তা বিকার ও নির্বুদ্ধির পরিচায়ক বটে ; কিন্তু তবু সেই বিকৃতির তলে তলে ছিল গুপ্ত জ্ঞানলব্ধ আত্মার অস্তিত্ব।

৪৯৯—কেবল ভগবানই আমাদের পক্ষে চরম জ্ঞানী ও পরম মিত্র, কারণ একমাত্র তিনিই জানেন কখন আমাদের আঘাত দিতে আর কখন আমাদের আদর দিতে হয়, তিনিই জানেন কখন মারতে আর কখন রাখতে হয়।

মা আসলে জ্ঞান তো একটাই, সে হলো সেই পরম প্রভুরই জ্ঞান। সেই জ্ঞানের সন্ধান পেতে হলে আপন ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলো বর্জন ক'রে দিয়ে কেবল তাঁর ইচ্ছাকেই মেনে নিতে হবে। ২৪-৪-১৯৭০

৫০০—সকল প্রাণীরই যিনি পরমতম সুহৃদ তিনি তাঁর প্রীতিকে আড়াল ক'রে রাখেন শত্রুতার মুখোস লাগিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুখোস রাখেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হতে না পারছি ; তারপর সেই কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসকারী বিপর্যয়কারী রণ-দেবতার মুখোসটা খুলে কৃষ্ণের স্নেহময় ও আলিঙ্গনদায়ক মধুর মূর্তি প্রকট ক'রে বিচলিত ও বিশুদ্ধীকৃত আত্মার চিরন্তনের খেলার সাথী হয়ে থাকেন।

৫০১—ব্যথাবেদনাগুলো আমাদের তৈরি ক'রে দেয় আনন্দ দেবতার পূর্ণ তেজকে সম্যকরূপে ধারণ করবার জন্য ; ওতে আরো প্রস্তুত করে শক্তি দেবতার তীব্র শক্তিলীলাকে সহ্য করতে পারার জন্য। ব্যথাই হলো শক্তির দরজার সঠিক চাবিকাঠি ; ব্যথাই হলো দিব্যানন্দের শহরে পৌঁছবার বাঁধা রাস্তা।

৫০২—হাঁ, হে মানবাত্মা, নিজের থেকে তুমি যেন দুঃখকষ্ট নিতে চেও না, কারণ সেটা ভগবানের ইচ্ছা নয়, তুমি কেবল চাইবে তাঁর আনন্দকে। তাঁর অবোধ নিয়মে দুঃখগুলো তো যথারীতি আসবেই, যতবার ও যতখানি পর্যন্ত তোমার ব্যক্তিগত শোধনের কারণে দরকার হবে; সেই সময়ে সেগুলোকে সহ্য ক'রে যেয়ো যাতে শেষে তুমি আনন্দের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারো।

৫০৩—ওহে মানব, অপর কাউকেও তুমি যেন দুঃখের আঘাত দিও না। দুঃখ দেবার অধিকার কেবল ভগবানের। তিনি যাদের নিজের কাজের জন্য বাছাই করেন তাদেরকেই তিনি ঐ দুঃখগুলি দেন। কিন্তু যেন Torquimada-র বোকামির মতো নিজের বুদ্ধিতে ধরে নিওনা যে তুমি সেই বাছাইএর মধ্যে একজন।

মা এ কথা ভুলো না যে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার জীবন সম্বন্ধে বিচার ও মানুষদের পছন্দ অপছন্দ করার স্বভাবটি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি ভগবানের কাজের যন্ত্র হতে পারবে না। ২৮-৪-১৯৭০

৫০৪—আগেকার কালে কোনো সামর্থ্য বা কর্মসাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা জানাতে একটা বড়ো রকমের শপথ নিয়ে বলা হতো, "তেমনি নিশ্চয় যেমন নিশ্চয় ভগবান আছেন" কিন্তু এখনকার কালে ওর চেয়ে আরো ভালো শপথ এই হবে, "তেমনি নিশ্চয় যেমন নিশ্চয় ভগবানের ভালোবাসা"।

মা বর্তমান দুর্গতির যুগে যখন বুদ্ধিক্রিয়ার প্রাধান্যে সব কিছু শুষ্ক ও নীরস হয়ে উঠেছে তখন ভগবানের ভালোবাসার মতো মহামূল্য ও অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আর কিছু নেই। ২৯-৪-১৯৭০

P 7364

৫০৫—সেবার কাজ করা ভগবৎজ্ঞানী ও প্রেমিকের উভয়েরই পক্ষে এইজন্য উপকারী যে তাতে তারা খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলির থেকেও অবাক হয়ে দেখতে পায় যে সকল দিকেই সেই তাঁর কি আশ্চর্য রকমের নিখুঁত ও সুন্দর কারিগরি। তখন একজন মোহিত হয়ে বলে, "আহা দেখ দেখ সেই পরমাত্মা কেমন সুন্দরভাবে নিজেকে জড়ের মধ্যেও সাজিয়ে মানিয়ে রেখেছেন।" আর অপরজন বলে, "আহা দেখ দেখ, আমার পরম প্রিয় কী সর্বশক্তিময় অথচ কতখানি নিখুঁত রকমের শিল্পী।"

মা :—কিন্তু তাঁর সেবা কি বাস্তবিক তুমি করতে পারো, যখন এই অস্তিত্বও তোমাকে তিনি দিয়েছেন, তাঁরই দেওয়া জিনিস কোনোপ্রকারে সামান্যমাত্রই তুমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে পারো। ৩০-৪-১৯৭০

৫০৬—ওহে সকল বিশ্বের অ্যারিস্টোফিনিস (Aristophenes) তুমি তো দুনিয়ার হালচাল দেখে আপন মনে শুধু হেসেই অস্থির, কিন্তু দিব্যদৃষ্টি পেয়ে তখন আমাকেও কি তোমার হাসির সঙ্গে যোগ দিতে দেবে না?

মা নিশ্চয় ভগবানেরই মতো সার্বগ্রিক ভাবের দিব্যদৃষ্টি পেলে তখন দুনিয়ার সব কিছু দেখেও ঐরকম হাসতে পারা যায়। ১-৫-১৯৭০

৫০৭—কালিদাস খুব সাহসের সঙ্গেই বলতে পেরেছিলেন যে কৈলাসের বরফমণ্ডিত রূপটি যেন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জমে থাকা শিবের জগৎজোড়া আনন্দের অট্টহাসি, সর্বদা শুচিশুভ্র নির্মল জ্যোতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ঠিক কথাই এটি : আবার ঐ ছবি যখন হৃদয়ে প্রতিফলিত হয় তখন সেই শুভ্রতায় জগতের সব কিছু মালিন্য নিচেকার মেঘস্তরের মতো ছিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায়।

মা মানুষের বিজ্ঞান সব কিছুকেই দেখছে ছাঁকা বাস্তবের দৃষ্টিতে, কিন্তু তা ছাড়া আরো অন্যরকম কল্পনার চোখের দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে, এবং তাহলে সেই গুহ্য দৃষ্টিই বা সত্য হবেনা কেন? ২-৫-১৯৭০

৫০৮—আমার কাছে এই সব চেয়ে আশ্চর্য অভিজ্ঞতা যে সে যখন বিপদআপদের বিভীষিকার চেহারাটা দেখেও আদৌ গ্রাহ্য করেনা, তার পরে সেগুলো আর ঘোঁটে তার ধারে কাছে আসে না। আর তখন অজ্ঞাত অদৃশ্য মেঘের অন্তরাল থেকে আমরা শুনি ভগবানের অট্টহাসি।

মা হে প্রভু, তুমি যখন তোমারই মতো ভাবে কোনো আত্মার চেহারা বদ্‌লে দিতে চাও তখন তুমি কি করো? ৪-৫-১৯৭০

প্রশ্ন মা, কাল আপনি ওটা কি লিখেছেন তার অর্থ বুঝলাম না।

উত্তর আর কিছু নয়, শ্রীঅরবিন্দ ওখানে বিভীষিকার "চেহারা" বলতে বিভীষিকার বাস্তব চেহারার কথাই বলেছেন। তাই আমি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলাম যে যখন তিনি কারো বাস্তব চেহারার রূপান্তর করতে চান তখন তিনি কি করেন,—আর রাত্রে দুটি দর্শনে তার জবাবও তিনি দিলেন।

প্রথমটিতে দেখালেন মৃত্যু সম্বন্ধে দেহচেতনার মামুলী ধারণা থেকে মুক্তি। আর দ্বিতীয়টিতে দেখালেন যে অতিমানসের দেহ রূপান্তরে কেমনতরো হবে। দেখছ তো, তাঁকে ঐ প্রশ্ন ক'রে আমি ভালোই করেছি। ৯-৫-১৯৭০

৫০৯—ওহে দানব, হয়েছে কি তোমার চেষ্টা সার্থক? রাবণ আর হিরণ্যকশিপুর মতো পারলে কি তুমি দেবতাদের পদানত ক'রে সারা জগতের অধিপতি হতে? তা হলেও কিন্তু তোমার আত্মা যা চায় তার থেকে বঞ্চিত হলো।

৫১০—রাবনের মন চেয়েছিল যে সারা বিশ্বের অধিপতি হয়ে রামকে সে পরাজিত করবে। কিন্তু ভিতরের আত্মা তার সর্বক্ষণ একদৃষ্টে কামনা করছিল কেমন ক'রে অতি শীঘ্র আবার সে স্বর্গে ফিরে গিয়ে ভগবানের দাস হতে পারে। শীঘ্র ফেরার পথ হিসাবে তাই সে ভগবানের শত্রু হয়ে প্রচণ্ড আক্রমণ করলে।

৫১১—সব চেয়ে বেশি আনন্দ মিলবে নারদের মতো ভগবানের কৃতদাস হয়ে। নিচেকার নরকে ভগবান নেই, তিনি যেন শুধু জগতেরই প্রভু অজ্ঞান মন ভাবে যে এ-ধারণা ভগবানের স্বরূপের খুব কাছাকাছি, কিন্তু বাস্তবিক তিনি এর থেকে অনেক দূরে।

৫১২—ভগবানের দাস হওয়া কিছুটা ভালো, কিন্তু কৃতদাস হওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি।

মা : শ্রীঅরবিন্দ দেখাচ্ছেন আমাদের যে, কেমন ক'রে শাস্ত্র ও পুরাণাদির কাহিনী ও কথাগুলির অর্থ বুঝতে হয়—বিশ্বগত প্রতীক ও সংকেতাদির দ্বারা।

১২-৫-১৯৭০

৫১৩—সারা জগতের কর্তা হতে পারলে খুবই সুখের কথা, যদি সেই সঙ্গে সকল জনের কাছে প্রিয় হতে পারো ; তবে সেজন্যে তোমাকে হতে হবে সকলের দাস।

৫১৪—মোটের উপর যদি হিসাব করো যে ভগবানের সেবার কাজ তোমার কিসে কতখানি সফল হলো, তাহলে দেখবে যে মানব প্রেমের দরুন অপূর্ণ ভাবেও যেটুকু তুমি করেছ সেইটুকুই হয়েছে সব চেয়ে বড়ো কাজ।

মা এইজন্যই বলা হয় যে নানাবিধ সেবার কাজ নিয়ে থাকার চেয়ে সর্বোত্তম জিনিস হবে পুরোপুরি সর্বপ্রকারে ভগবানের হয়ে যাওয়া।* ১০-৫-১৯৭০

---

* অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৬ মে ১৯৫৪

প্রশ্ন মধুময়ী মা, আমরা যে তোমাকে স্বপ্নে দেখি, তা কি প্রতীক মাত্র?

উত্তর না, সব সময়ে তা নয়। বাস্তবভাবে আমাকেই দেখাও হয়। অর্থাৎ তখন এই হয় যে চোখের দৃষ্টিতে দেখার বদলে তুমি দেখ সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা প্রাণ মনের দৃষ্টিতে। তাতে কতকটা আমাকেই বাস্তবভাবে দেখতে পাও, যেমন আমি যদি কাউকে কোনো শক্তিদান বা চিন্তাক্রিয়ার কাজ বা অন্য কোনোরকম জিনিসের স্পন্দন পাঠাই, তোমাদের কারো জন্য কিছু প্রভাব প্রয়োগ করি, সেটি তার আবহাওয়ার মধ্যে গিয়ে আমারই আকৃতি নিয়ে তার মনশ্চেতনার মধ্যে দেখা দেয়। এই ভাবে সে আমাকেই তখন দেখতে পায়। তাকে বাস্তব দেখাই বলে। যদিও তা আমার সত্তার পুরোপুরি চেহারা নয়, তথাপি খানিকটা তাই বটে।

প্রশ্ন কিন্তু মা, সেখানে তাহলে তার বিশেষ কিছু তাৎপর্য থাকে, তাই নয় কি?

উত্তর নিশ্চয় থাকে। একটা কোনো বিশেষ লক্ষ্য থাকে,—যখন আমি কাউকে কিছু বলতে বা করাতে চাইছি, তার কিছু বদলাতে চাইছি, কিছু জ্ঞান দিতে চাইছি, অথবা কোনো বিষয়ে সাবধান করতে চাইছি, হুঁশিয়ার থাকতে বলছি, আবার কখনো বা হয়তো তার ভিতরকার কোনো প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দিতে চাইছি।

আর যা প্রতীকের স্বপ্ন—তাও খুব সুস্পষ্ট ও নিখুঁত রকমের হয়, আর তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত স্মরণ থাকে। তাও খুব বাস্তব ও জীবন্ত ও প্রগাঢ় রকমের হয়ে থাকে, বা বাস্তব জীবনের চোখে দেখার চেয়েও অনেক বেশি উজ্জ্বল ও জীবন্ত হতে পারে, তবে তেমন স্বপ্ন প্রায়ই বিরল। সে এমন স্বপ্ন যা ঘুম ভাঙার পরে সকল খুঁটিনাটি সমেত মনেতে জাজ্বল্যমান থাকবে, আর তুমি অনুভব করবে যে ঐ স্বপ্নের মধ্যে যে কয়টা মুহূর্ত কেটেছে তা সাধারণ জীবনের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রতর রূপে সত্য। তেমন স্বপ্ন মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। তবে এই রকমের স্বপ্ন খুবই কম হয়, নিতান্ত কোনো প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এগুলি আসে।

তোমরা কি কেউ নিজেদের স্বপ্নের কথা বলতে চাও? সেগুলো বেশ চিত্তাকর্ষক হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমি তার ব্যাখ্যা বলে দিতে পারি।

একজন শিশুশ্রোতা মধুময়ী মা, আমি বলতে পারি একটা স্বপ্ন।

মা : ও, তাই নাকি? বলে ফেল তোমার স্বপ্নের কথা।

উক্ত শ্রোতা একদিন দেখলাম যে আশীর্বাদ দেবার সময় আমি যখন কাছে গেলাম তখন তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ আদর করলে।

মা : এইটুকুই মাত্র? ওর পরে আর কি হলো?

উক্ত শ্রোতা তুমি আমাকে কিছু বলেছিলে, কিন্তু...

অন্য শিশু শ্রোতা মা, আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি তুমি কাঁদছো।

মা : সে কি কথা? কাঁদছি আমি?

ঐ শ্রোতা হাঁ মা, তোমাকে কাঁদতে দেখেছি।

মা আমি নাকি কাঁদি? (হাস্য)

ঐ শ্রোতা হাঁ মা।

মা আচ্ছা রও রও...কেউ দুঃখ পেলে তখন কাঁদে, তাই নয় কি?

ঐ শ্রোতা হয়তো তাই।

মা : ওটা খুবই প্রতীক জ্ঞাপক। ওর অর্থটা এই হবে যে...না থাক, সে কথা পরে বলছি। সাধারণ ভাবে এটা বলা যায় যে কেউ যখন খুবই ব্যথিত বা অসুখী হয়, তার অর্থ মূলতঃ এই যে ভগবানের সার্বিক দুঃখের ভাণ্ডারে আরো একটা যোগ হলো।

ভগবান যখন তাঁর গভীর করুণাতে জড়ের মধ্যে প্রবেশ করেন আর যখন সেখানে থেকে তাঁর চেতনা চৈত্য-বেদনাতে (sorrow) রূপান্তরিত হয়—যার কথা এখানে লেখা আছে (The Elements of Yoga) আজ সন্ধ্যায় পড়েছো, তখন তা এইভাবে (হাত জোড় করে আবার খুলে দিয়ে, নিবেদনের ভঙ্গী) উল্টে গিয়ে থাকে।

এই যে ভগবৎ করুণা জড়ের মধ্যে থেকে বিষাদে বা কাতরতায় রূপান্তর হয় তা অহংএর কাতর হওয়ার মতো জিনিস নয়, তা বিশ্বগত কাতরসত্তার সঙ্গে সহানুভূতিতে একার। আমার Prayers and Meditations-এর মধ্যে আমি এই জিনিসের বিশদ বর্ণনা দিয়ে এক জায়গাতে বলেছি—"আমি কাঁদতে থাকলাম...আর সে কান্না হলো আমার জীবনের সব চেয়ে মধুর অশ্রুপাত।" সে কান্না নিজের কারণে নয়, কিসের জন্য তেমন কান্না তা বুঝতে পেরেছ তো। এ কান্না হলো অন্যরকম সেই জিনিস। মানুষ কাঁদে মানবীয় রীতিতে তাদের ব্যক্তিগত কারণে। এমন কি কেউ যখন তার প্রিয়-জনকে হারিয়ে কাতর হয়ে কাঁদে (যে কথা তোমাদের প্রায়ই বলেছি) তখন সে সেই মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা হলো তাই ভেবে কাঁদে না কারণ সে তো জানেই না যে তার কি অবস্থা ঘটল, সে কষ্ট পাচ্ছে না শান্তি পেয়েছে,—কিন্তু তার নিজের কাছে থাকার ও ভালোবাসার মানুষটি যে তাকে ফেলে চলে গেল, অদর্শনের সেই শোকেই তার কান্না এবং শতকরা নিরা-নব্বুই ক্ষেত্রে তাই হয়। সকলের ক্ষেত্রেই মানুষের শোক ও কাতরতার মূলে থাকে তার নিজের ক্ষতির দিকেই চাওয়া, প্রায়ই অল্পবিস্তর সজ্ঞানে ও (কি বলি?) স্বীকার্য ভাবে। এমন কি যখন কেউ অন্যের দুঃখে কাতর হয় বা কাঁদে, তাতেও ঐ ধরনের ব্যক্তিগত মিশ্রণ থাকে। কিন্তু সে মিশ্রণ থাকলেও যেমনি সেখানে চৈত্যসত্তা প্রকট হয় অমনি সেখানে জাগে "পরিবর্ত্তিত করুণা" (যার কথা এই মুহূর্তেই বলছিলাম)। এখন এই দুটি জিনি-সকে তুমি যদি পৃথক করে নিতে পারো, আর নিজের অহংকে ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে এসে বিশ্বময় করুণার সঙ্গে নিজের পরিবর্ত্তিত করুণাকে মিলিয়ে দাও—যে করুণা অতি বিশাল, সর্বপ্রসারী, অতি গভীরে, প্রশান্ত শক্তিগর্ভ, শান্ত মাধুর্যে পরিপূর্ণ—যা স্বয়ং ভগবৎ করুণা। এই কথাই আমি বলতে চেয়েছি যে তুমি যদি ব্যক্তিগত দিকটাকে ছাড়িয়ে উঠে জানতে পারো যে কেমন ক'রে সেই ব্যথা ও কাতরতার অন্তরে তার মর্মস্থলে প্রবেশ করতে হয়,

তাহলে তোমার কাছে এক নতুন উদ্‌ঘাটনের দ্বার খুলে যাবে। তবে তার মানে এই নয় যে সেজন্য তুমি কাতরতার জন্যই কাননা করবে,—কিন্তু এমনি যখন সে জিনিস তোমার মধ্যে এসে দেখা দেবে তখনই যদি তার ভিতর থেকে তোমার ব্যক্তিগত অহংটিকে চিনে ও বুঝে নিয়ে এবং কিসের জন্য তোমার সেই কাতরতা আসছে ও তার ব্যক্তিগত দিকটা কোথায় তা ধরতে পেরে তাকে বর্জন করে কাটিয়ে ওঠো, তাহলে সব কিছু পেরিয়ে তার উপর দিকে গিয়ে গভীরতম ও বিশ্বগত মূল সত্যের কাছে চলে যাবে, আর অনন্ত করুণার রাজ্যে প্রবেশ ক'রে দেখবে যে চৈত্যের দুয়ার যথার্থই খুলে গেল। সুতরাং কেউ তোমাকে কাঁদতে তখন যদি দেখে, এবং ওতে আরো বেশি মিলে যায়, অর্থাৎ বুঝতে পারছ, সেই মূল কান্নার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে তুমি গলে যাও—তাতে সেই দরজা আরো খুলে যাবে। সে দরজা উন্মুক্ত হয়ে তুমি সম্পূর্ণ রকমে এক অসাধারণ অনুভূতি লাভ করবে যা তোমার চেতনার মধ্যে এক সুগভীর দাগ কেটে দেবে। সে দাগ কখনই আর মুছবে না। সে দরজা আবার যদি বন্ধ হয়, আবার তুমি তোমার সাধারণ চেতনাতে ফিরে যাও, তবুও সে দাগ পিছনে কোথাও লেগে থাকবে, আর আবার যখন তুমি তীব্র রকমের একাগ্রতা আনতে পারবে, তখন আবার তুমি সেই পূর্ব জিনিসে ফিরে যাবে। ফিরে গিয়ে আবার সেই অসীম কাতরতার চেতনাকে উপলব্ধি করবে, যা পরিপূর্ণ শান্তিময় ও সব কিছু কথা জানে, কিন্তু তা বুদ্ধি দিয়ে জানা নয়, আর তা সকল শোকদুঃখ বহন ক'রে আরোগ্য করতে পারে।

কিন্তু এখানেও সেই একই জিনিস দরকার—একেবারে পুরোপুরি ভাবে আন্তরিক হওয়া, ঐকান্তিক (sincere) হতে পারা—নিষ্ঠা, এটি অবশ্যই থাকা চাই, নতুবা কাজের কাজ কিছুই হবে না। কেউ যদি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে ঐরূপ চেষ্টা করতে যায়, তাকে ফিরতেই হবে তার আগেকার অবস্থাতে, চেষ্টার সাফল্য কিছুই মিলবে না। আর কেউ যদি ঐকান্তিকভাবেই চায় দুঃখমুক্তি, যদি খাঁটি রকমের আস্পৃহা করে সকল বাধাকে জয় করতে—আপন অহমিকা ও সব রকমের পিছুটানকে কাটিয়ে, সকল রকমের সীমাকে লঙ্ঘন ক'রে সকল প্রকারের ত্রুটিমুক্ত হয়ে এবং বিশুদ্ধ হয়ে,—বাধা সত্ত্বেও দৃঢ়সংকল্প করে যে সে আগেকার অবস্থাতে কোনোমতেই ফিরে যাবে না, অন্ধতা, ও অজ্ঞানতার দখল থেকে বেরিয়ে আলোর রাজ্যে ঢুকে মানবসুলভ দুর্বলতা ও সংকীর্ণ ক্ষুদ্রতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্ত হতে পারে যদি তবেই আশানুরূপ ফল মিলবে। আর তখন সে শক্তির ক্রিয়া খুব জোরালো হবে, কখনো তা সুনির্দিষ্ট ও সামগ্রিক ভাবেও সম্ভব হবে। কিন্তু ওর মধ্যে আগেকার জিনিসের টুকরোমাত্র থাকা চলবে না, অর্থাৎ যে জিনিস কেবল ঐ সময়-টুকু চুপ ক'রে আড়ালে থেকে পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে বলে, "হাঁ হাঁ, খুবই তো করলে, এখন আবার আমার পালা চলুক।" তা যদি হয় তবে তার জন্যে আমাকে দায়ী কোরো না, কারণ প্রায়ই তা প্রতিক্রিয়া নিয়ে আরো প্রবল হতে পারে। তাই আমি বারে বারে এরই কথা বলি।

সত্যিকার ঐকান্তিক হও, যথার্থ ভাবে।

কোনো কিছু যদি আঠার মতো লেপটে থাকে, তাকে সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কখনো কখনো যারা ঐরকম ভুল কাজ পুনঃপুনঃ করতে থাকে তাদের

কষ্টটা তাতে যখন খুব অসহ্য হয়ে ওঠে তখন তারা ঠেকে শিখে শেষে ঐকান্তিক হতে বাধ্য হয়। এই রকমের রীতিটা থাকা ভালো নয়। কারণ ওর ফলে কত কিছু নষ্ট হয়ে যায়, বৃথা শক্তিক্ষয় করা হয়, অশুভ স্পন্দনাদি ঘটতে থাকে। তবে নিতান্ত অপারগ হলে কষ্টের তীব্রতা ঘোচাবার জন্যই পুরোপুরি আশ্রয় করবে।

বস্তুত এমন মুহূর্ত সকলেরই জীবনে আসে যখন গত্যন্তর না থাকায় বিশেষ প্রয়োজনে পুরো ঐকান্তিক হয়ে পড়তেই হয়। নিজের ব্যক্তিগত জীবনে আর সামাজিক ক্ষেত্রেও তেমন মুহূর্ত আসতে পারে যখন প্রকৃত ঐকান্তিক হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। তাতে বিশুদ্ধতা আনতেই হবে। তখন এসে পড়ে জীবন-মরণের সমস্যা, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠির পক্ষেই তার থেকে রক্ষা পেতে চেষ্টা ঐকান্তিক ভাবেই করতে বাধ্য হতে হয়।

(নীরব হয়ে থেকে)

আর কোনো স্বপ্নের কথা কেউ বলতে চাও?

প্রথম প্রশ্নকারী মধুময়ী মা, আপনি আমার স্বপ্নের অর্থ তো বললেন না?

মা ওর আর কোনো অর্থ নেই গো ছেলে। তুমি কি দেখেছিলে সে বিষয়ে তোমার স্বাভাবিক সত্তা চেতন সম্পূর্ণ ভাবে হয় নি, এই পর্যন্ত। আর উপরে উচ্চশক্তিরা তো আছেই সর্বদা তোমাদের জন্য স্নেহ ভালোবাসা ও সাহায্য নিয়ে...কিন্তু সেটা তুমি জানতে পারোনা, কারণ তুমি আছো তোমার ঐ অল্প একটুখানি স্থূল চেতনার মধ্যে যা দেখেছ তার অন্য ব্যাখ্যার দরকার নেই, ও ছাড়া অন্য কিছু ব্যাখ্যা হয় না। আসলে ওটাই বাস্তব সত্য। তুমি ওকে বলতে পারো বাস্তব অনুভূতি, যা ঘটেছিল তাই, তোমার মগজ তার ঐ রকম এক অর্থ করে নিয়েছে। জেগে উঠে তোমার শুধু সেই অর্থটাই মনে আছে। এমন ব্যাপার খুবই কম হয় যে অনুভূতিটির সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তে তার ভিতরকার মর্মটারও উপলব্ধি ঘটল। তার জন্য ঘুমের মধ্যেও তেমনি চেতন থাকার দরকার হয়, সজাগ অবস্থাতে থাকার দরকার হয়, যা প্রায়ই সম্ভব হয় না। সত্তার একটা অংশ দেহ থেকে সরে গিয়ে অনুভূতিটা পায়, তার পর আবার সেই অংশ যখন দেহের মধ্যে ফিরে চলে আসে তখন তোমার মস্তিষ্ক তার কাছে সেটি পেয়ে তাকে আপন ভাবে ও বাক্যে ও অনুভবে একটা কিছু প্রতিচ্ছবিতে তর্জমা ক'রে নেয়। জেগে উঠে তারই খানিকটা স্মরণ ক'রে তোমরা তাকে বলো "স্বপ্ন"। কিন্তু বাস্তবিক যা ঘটেছিল ঐ স্বপ্নটা তারই ছায়া মাত্র, যার মধ্যে কিছু মিল নেই, বস্তুত যা ঘটেছে ঠিক সে জিনিস নয়।

সে রাত্রে তোমার সেই স্বপ্ন অনুভূতির মধ্যে তুমি সেই এ সকল উচ্চ শক্তির সংস্পর্শে এসে থাকবে, যারা তোমার মঙ্গল সর্বক্ষণই করে ও তোমাকে রক্ষা করে—বুঝেছ?—যারা স্নেহ প্রেম ও ভালোবাসার থেকে মঙ্গলকারী কোনো শক্তিকে ডেকে আনে, আর তারা সব জায়গাতে সর্বদা থেকে কাজ করছে। তার থেকেই তুমি ঐ রকম দেখেছ। জেগে উঠে তুমি তার এমন ছবি ক'রে নিলে নিজে যাকে তুমি বিশেষ রকমে চেনো তারই চেহারাতে, অর্থাৎ তুমি দেখলে যে আমারই কাছে তুমি এসেছ ও আদর আশীর্বাদ পেয়েছ, —সেই সব মঙ্গল শক্তিদের চিনতে না পেরে তুমি ঐ নতুন রকমের মনোভাবে এসে অনুভব করলে যে আমিই তোমাকে কোলে জড়িয়ে ধরেছি। তোমার মধ্যে তর্জমা এই ভাবেই হয়েছে। এই হলো আসল ব্যাপার। তোমার মস্তিষ্ক করেছে এই রকমের তর্জমা।

অনেকেই আমাকে দিয়ে এমনি ভাবে কত অদ্ভুত কাজই যে করায়। অস্বাভাবিক কত রকমের গল্পই যে আমি শুনি। অথচ সব কিছুর পিছনেই রয়েছে অন্য রকমের কাজ। হয়তো কোনো বিভূতির বা শক্তির বা অন্য কিছুর ক্রিয়ার সঙ্গে তখন সংস্পর্শ ঘটেছে, যেমন আগে বললাম, আর সেই জিনিসটা নিয়ে তাদের মস্তিষ্ক কত বিচিত্র রকম তর্জমা ক'রে ফেলে। কিন্তু সেগুলো তাদের নিজেরই তর্জমা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর যখন তারা আবার কাছে এসে সেই সব কথা বলে, তখন আমি দেখতে পাই তাদের মন-প্রাণ-দেহের চেতনার প্রকৃত অবস্থাটা কেমন। তাদের সেই বিকৃত তর্জমা থেকেই বুঝতে পারি যে আড়ালে তাদের ভিতরকার মনোভাবটা কেমন। কিন্তু মুখে বলতে পারি-না যে "ওটা শুধু অভিনয় মাত্র।" যেহেতু সে যে তখন আমাকেই দেখেছিল। যার যার স্বভাব অনুযায়ী দৃশ্যটা তারা অজান্তে পাল্টে নিয়েছে, যা হয় মাঝে মাঝে অতি অদ্ভুত। তবে তোমার স্বপ্নের ঐ ছবিটা বেশ ভালো।

এই হলো মোট কথা। আর কেউ কিছু বলতে চাও?

প্রশ্ন : না, গত সপ্তাহে আমি দেখেছি একটা স্বপ্ন।

উত্তর বেশ ত, সেটা বলে ফেল।

প্রশ্ন : একদিন বিকেলে খুব ঝড় হবার পরে আমি যেন সমুদ্রের ধারে রয়েছি। সমুদ্র সেখান থেকে অনেক পিছনে সরে গেছে, আর সেখানে রয়েছে একটা গ্রাম। সেই গ্রামের মধ্যে রয়েছে কতকগুলি পাথরের ঘোড়া, তার মধ্যে চারটে কালো পাথরের তৈরি, আর তার উপর দিকে একটা সাদা পাথরের (বোধহয় সাদা মার্বেল পাথর), আর সেই ঘোড়া থেকে নানা রঙের রোশনাই হচ্ছে।

উত্তর সমুদ্রের ধারে যাবার পরে দেখলে?

প্রশ্ন হাঁ।

উত্তর : সে কি এখানকার সমুদ্র, না এমনি সাধারণ সমুদ্র, যেখানে তুমি গেলে?

প্রশ্ন আমি তো ছিলাম টেনিস গ্রাউণ্ডে।

উত্তর ও! তাহলে টেনিস গ্রাউণ্ড থেকেই দেখেছ?

প্রশ্ন : হাঁ, লাইট হাউসটাও দেখতে পাচ্ছিলাম।

উত্তর : লাইট হাউস, সাদা ঘোড়া একটা, কালো ঘোড়া চারটে—

প্রশ্ন সে ক'টা তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে সাদা ঘোড়া ছিল একটি।

উত্তর : তাই হয়তো। সম্ভবত ওটা পণ্ডিচেরীর ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু সংকেত। কিন্তু ঘোড়ার সঠিক সংখ্যা তোমার মনে নেই। তা থাকলে একটা নির্দেশ পাওয়া যেতো। আর সে সময় কি খুব জোর ঝড় হয়েছিল?

প্রশ্ন হাঁ, বেশ জোর ঝড়ই—

উত্তর : আর সমুদ্র অনেক দূরে সরে গিয়েছিল?

প্রশ্ন : হাঁ।

উত্তর : এ স্বপ্নটি প্রতীক জাতীয়।

প্রশ্ন : তখন কিন্তু আকাশ খুব পরিষ্কার ছিল।

উত্তর হাঁ হাঁ, ঝড়ের পরে আকাশ পরিষ্কার তো হবেই।

তবে এ স্বপ্নের কোনো নির্দিষ্ট অর্থ আমি বলতে পারব না, কারণ ওর মধ্যে কিছু কিছু বিবরণ ছেড়ে গেছে। তথাপি ওটি পণ্ডিচেরীর ভবিষ্যৎ দিন নিয়ে কিছু সংকেত বলে মনে হয়। যা পরে দেখা যাবে।

প্রশ্ন কিন্তু মা, তুমি তো স্বপ্ন ছাড়াই সে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারো?

উত্তর স্বপ্ন ছাড়াই পারি? (মা হাসলেন)

আ। তা সে যাই হোক, আপাতত বর্তমানে আমরা ঝড়েরই মধ্যে রয়েছি। এর পর সমুদ্র সরে গেলে তখন কি হয় দেখা যাবে (হাস্য)।

অন্য শ্রোতা আমিও মা একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি যখন তোমার কাছে আশীর্বাদ নিতে গেলাম তখন তুমি আমাকে তিনটি ফুল দিলে—একটি হলো "মনের সততা" (mental honesty), আর একটি "সমর্পণ" (surrender), আর তৃতীয়টি বোধ হয় "শান্ত মন" (quiet mind)।

মা এটি তো সুন্দর স্বপ্ন। খুবই দরকারী কথা। (হাস্য)

এটি বাস্তব স্বপ্ন। একে সত্য বলে জেনে চেষ্টা করবে যাতে নিজের মনকে শান্ত ও নীরব করতে পারো, আর সেই মনটি যেন পুরোপুরি অকপট ও সমর্পিত হয়। এ একটা তোমার খুব ভালো কর্মসূচী হয়ে রইল আর সেই মনকে পরে আরো একাগ্র করবে।

আচ্ছা, ব্যস্, আমার ছেলেমেয়েরা, আজ এই পর্যন্ত। এবার যাও যাক।

২ জুন ১৯৫৪

মা আজ তো কোনো প্রশ্ন নেই? তাহলে ধ্যানে বসতে বলব ভাবছিলাম।

একজনের প্রশ্ন : মা ধ্যান করতে যে পারি না, এর কারণ কি?

উত্তর তার কারণ জিনিসটা ঠিকভাবে শেখা হয়নি।

কেন হঠাৎ একদিন তোমার এই খেয়াল হয় যে আজকে আমি ধ্যান করব? কিন্তু আগে কোনদিন এটা কখনো করোনি। এ দিন এক জায়গাতে বসে তুমি নিজের মনে সাব্যস্ত করলে যে আমি ধ্যান করা আরম্ভ করছি? কিন্তু লেখাপড়াতে আঁক কষা কিংবা ধরো পিয়ানো বাজানো জিনিসটা রীতিমত ভাবে যেমন শিখতে হয় তেমনি এটিও শিখতে হয়। এমনি শুধু ইচ্ছা করলেই শেখা যায় না। কেবল পা দুটো জড়ো করে আর হাত গুটিয়ে আসন করে বসলেই কাজ হয় না, এই ধ্যান কি ভাবে করতে হবে তা জানা চাই। সব জায়গাতেই নানা রকমের নিয়ম ও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে ধ্যান কি ভাবে হবে। তা শেখা চাই।

যদি তোমাকে খুব ছেলেবেলা থেকেই শেখানো হতো সেই সব নিয়ম, কেমন ক'রে চাপটি খেলে আসনে বসতে হয়, কেমন ক'রে মন থেকে সব কিছু ভাবনা তাড়িয়ে দিয়ে মনকে প্রশান্ত আর চেতনাকে স্তব্ধ করতে হয়, কিংবা কেমন ক'রে একাগ্রতা আনতে হয়, কিংবা চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করতে হয়, অথবা...অর্থাৎ বিবিধ রকম অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে যদি তোমাকে এই ধ্যান করতেও শেখানো হতো,—যেমন শৈশবকালে শেখানো

হয়েছে সোজা হয়ে দাঁড়াতে আর হাঁটতে আর চিবিয়ে খেতে (যদিও তা এখন তোমার স্মরণ নেই যেহেতু তুমি খুবই শিশু ছিলে),—কিন্তু সেই রকম পরে যদি এটাও শেখানো হতো কেমন ক'রে ধ্যান করতে হয়, তাহলে এখন যেদিন তুমি ইচ্ছা করতে সেদিন অনায়াসেই তা করতে পারতে। কিন্তু ছেলেবেলাতে এটা শেখানো হয় না। বস্তুত এ-ধরনের কোনোরকম শিক্ষাই ছেলেমেয়েকে দেওয়া হয় না। সাধারণত খুব কম জিনিসই শেখানো হয়ে থাকে—এমন কি সহজে ঘুমোবে কেমন ক'রে তাও না। লোকে মনে করে যে বিছানাতে শুলেই তো ঘুম, কিন্তু তাই তো ঠিক কথা নয়। ঠিক ভাবে খাওয়া আর ঘুমোনো, এ গুলিও তাকে শেখানো দরকার, সব রকমের কাজই শিখিয়ে দিতে হয়। না শেখালে পরে সব কাজই করা হয় অগোছালো অপটুভাবে। আর নিজে নিজে শিখে নিতে হলে তাতে বছরের পর বছর কেটে যায়, ততদিন পর্যন্ত যেমন তেমন ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে বিস্তর অসুবিধা ও ব্যর্থতা ভোগ করতে হয়। অনেক অসুবিধা ও দুঃখ ভুগে, অনেক ভুলভ্রান্তি ও হয়রানির পরে শেষ পর্যন্ত যখন রপ্ত হয়ে উঠবে তখন দেখবে হয়তো যে বুড়ো হয়ে গেছ, মাথার চুলগুলো সব পেকে সাদা হয়ে গেছে, ঠিক শিক্ষা হয়েছে ততদিনে। কিন্তু ছেলেবেলাতেই যদি তোমার বাপ মা কিংবা অভিভাবকেরা দরকারী কাজগুলি শিখিয়ে দিতেন যে কোনটা কেমন ভাবে করতে হবে, তাহলে অত ভুলভ্রান্তি ও হয়রানি ভোগ করতে হতো না। শুধু তাই নয়, তখন ভুল করলেও কেউ বলে দেয় না যে তুমি ভুল করছ। তাতে যদি ব্যর্থ চেষ্টাতে ক্লান্ত হয়ে অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়ো তখনও জান না যে কি ভাবে কোনটা করা উচিত ছিল, কারণ কেউ তো শেখায় নি। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোনো কিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাই অতি সামান্য সোজা জিনিস ও শিখে বুঝে নিতে অনেক বছর লাগে, এমন কি নিজে শিখে নিতে পরিষ্কার থাকার মতো প্রাথমিক জিনিসটাও।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাপমায়েরা যে শেখাননা তার কারণ নিজেরাই তাঁরা জানেন না। তার কারণ তাঁদেরকেও কেউ শেখায়নি! জীবনভোর নিজেরাই ঠেকে ঠেকে শিখেছেন যে কোন কাজ কেমন ভাবে করবেন বেঁচে থাকার জন্য। অতএব ছেলেমেয়েকে তাঁরা শেখাবেন কেমন ক'রে নিজেদেরই যখন জানা নেই। তোমাকে তোমার নিজের হাতে ছেড়ে দিলে অনেক বছর লেগে যাবে নিজের অভিজ্ঞতায় শিখতে যে সামান্য কাজটুকুও কেমন ক'রে সহজে করা যেতে পারে, আর তার জন্য তোমাকে সে বিষয়ে রীতিমত ভাবতেও হবে। ভেবে না চেষ্টা করলে কোনোকালেই শিখবে না।

সমুচিত ভাবে জীবনধারণ, এও একটা কম আর্ট নয়, বাল্যকাল থেকে তা না শিখলে আর সে বিষয়ে লক্ষ্য না থাকলে ভালো ভাবে সে কাজও করা যায় না। শুধু নিজের দেহ কেমন ক'রে সুস্থ রাখতে হয়, নিজের মনকে কেমন ক'রে শান্ত রাখতে হয়, হৃদয়কে মঙ্গলকামী করতে হয়—ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার পক্ষে এগুলি নিতান্ত অপরিহার্য। (আরামে থাকা কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে থাকার কথা আমি বলছি না, বলছি কেবল ভদ্র ভাবেই থাকার কথা) সে শিক্ষাও খুব কম বাপমায়েরাই তাদের সন্তানদের দিয়ে থাকেন।

সব কিছু শুনলে তো?

প্রশ্ন মধুময়ী মা, লেখাপড়া ছাড়া আর অন্য কি আমার শেখা উচিত?

উত্তর অন্য কাজ? সেটা তোমার নিজেরই উপর নির্ভর করে। যদি তুমি সাধনা করতে চাও তাহলে অন্ততপক্ষে এমন কিছু কাজ আংশিক ভাবেও বেছে নেবে যার সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্ক নেই,—যা নিজের জন্য করা নয়। লেখাপড়া করা খুবই ভালো আর তা অপরিহার্য জেনেই করা দরকার, কারণ একটু আগে যে শিক্ষার কথা বলেছি এটি তার অন্তর্গত জিনিস, আর তা ছেলেবেলা থেকেই শুরু করা চাই, নতুবা বড়ো হয়ে শেখা খুবই কঠিন—কারণ বয়সের একটা সীমা আছে যার মধ্যে এই অপরিহার্য শিক্ষার গোড়া পত্তন করতে হয়। এ ছাড়া যদি সাধনা নিতে চাও তাহলে আরো এমন কিছু কাজ বেছে নেবে যার সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের প্রশ্নই থাকবে না। নিঃস্বার্থ রকমের বিশেষ কাজ কিছু একটা করতে হয়, নতুবা নিজের দরকারের কাজটুকু নিয়ে থাকলে তাতে নিজের সেই সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে বাইরের বৃহত্তর বিশ্বশক্তির দিকে নিজেকে খুলে দিতে পারো না। নিঃস্বার্থ রকমের কোনো কাজ সামান্য একটু করলেও তার মধ্যে অহং ভাব নেই, তারই জোরে ব্যক্তির গণ্ডী ছাড়িয়ে অন্য দিকের দরজা খুলে যাবে।

তুমি রয়েছ আপন মেরা খোলসটুকুর মধ্যে, বাইরের ধাক্কা লাগলে বা আঘাত পেলে কেবল তখনই অন্যান্য খোলসগুলি সম্বন্ধে সচেতন হও। কিন্তু সর্বব্যাপী অনন্ত শক্তি যা সকল সত্তার সংযোগ ক'রে রেখেছে তাকে জানতে চাওয়া হয় খুবই কম, আর সেটাই হলো সাধনার এক অপরিহার্য অঙ্গ।

প্রশ্ন মা, পড়াশোনাও কি ভগবানের জন্যে করা যায় না?

উত্তর তার মানে?

প্রশ্ন অর্থাৎ পড়ছি কেবল ভগবানের কাজের জন্যে, নিজের নয়, তারই জন্যে প্রস্তুত হওয়া?

উত্তর: হাঁ, যদি সেইরকম নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকো, যাতে নিজেকে ভগবানেরই কাজের যন্ত্র হতে পারো, তবে তা খুব ভালো কথা। কিন্তু বাস্তবের কাজের ক্ষেত্রে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে চলতে হলে তখন ব্যাপারটা একেবারে আলাদা রকমের হয়ে যাবে, তাই নয় কি? প্রথমত পাঠ্য নির্বাচন করতে কোন বিষয়টা নিতে চাও আর কোনটা নিতে চাও না তাই নিয়ে কোনো বাছাবাছি থাকবে না, কোন ক্লাসে পড়তে মন যায় আর কোন ক্লাসে যেতে ইচ্ছা হয়না এ সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ করা হবে না। যে বিষয়টি কঠিন আর যেটি কঠিন নয় সে সম্বন্ধে কোনো পছন্দ বা অপছন্দ করা ছেড়ে দিতে হবে, কোন শিক্ষক ভালো আর কে মন্দ তাই নিয়েও কিছু মতামত পোষণ করবে না। এই সব নিয়ে ভালোমন্দের তারতম্য করা একেবারেই ঘোচাতে হবে।

এর ফলে এমন একটা অবস্থা আসবে, তাতে যাই কেন হোক আর যাই কেন আসুক, তাকেই ভগবৎ কর্মের প্রস্তুতি রূপে নিয়ে তারই মধ্যে সমুচিত সুযোগ খুঁজে নিতে হবে, আর সব-কিছুই প্রয়োজনীয় মনে করে হাসিমুখে গ্রহণ করবে।

এই ভাব নিয়ে সত্যই যদি চলতে পারো, সে তো খুবই সুন্দর জিনিস।

প্রশ্ন মা, আপনি বুলেটিনে বলেছেন educating the mind অর্থাৎ মনকে শিক্ষা দেওয়ার কথা, তার মানে তো নিজের মনকে সেই শিক্ষাটা দেওয়া যে পড়াশোনা ও জীবন রক্ষা সবই ভগবানের জন্য। তা কি তাহলে ভগবানেরই কাজ নয়?

উত্তর হাঁ-হাঁ-হাঁ। মনকে সর্বদা ঐ লক্ষ্যে রাখলে খুবই ভালো, কিন্তু আসল কথা প্রকৃত ভাবেই ঐ লক্ষ্যটি থাকা চাই। যথা, তুমি যদি চাও জীবন রহস্যের নূন আইন-গুলি জানতে, ভগবৎ নির্দেশগুলি জেনে তা মেনে চলতে, ভগবৎ অভিব্যক্তির যুক্ততম রহস্যের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তার সন্ধান পেতে, যাতে মনের আরো উন্মীলন ও প্রসার হয়,—তাহলে সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। তাতে তখন শিক্ষা নিয়ে কোনোরূপ বাছাই বা বিচার থাকা চলবে না, কারণ জীবনের অতি তুচ্ছতম ঘটনা থেকেও তোমাকে শিখতে হবে, সামান্য জিনিস থেকেও তুমি শিখবে, আর গ্রহণ করবে তোমার ভাবনার সহায়তা ও পথচলার নির্দেশ। এমন কি (আমি আগেও হয়তো এ কথা বলেছি) কোনো অবোধ শিশুও যে কথাটি বলছে তার থেকেও হঠাৎ হদিস পেয়ে বুঝে নেবে যে কথা আগে বুঝতে পারোনি। তোমার এই গ্রহিষ্ণু মনোভাব তখন হবে আলাদা রকমের। যেন তুমি একটা কিছু বিশেষ রকম আবিষ্কারের প্রত্যাশা করছ, তোমার ভুলভ্রান্তিকে ধরে নিয়ে নতুন এক ধাপ এগিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছো, যেন চুম্বক পাথর হয়ে সব কিছুকে টেনে নিতে চেষ্টা করছ। যাতে অতি সামান্য জিনিস থেকেও দামী কিছু নিলে যেতে পারে। আর তোমার চেতনা ও ইচ্ছা যতই চাইবে অগ্রসর হতে, ততই তুমি সব দিক থেকে তার সুযোগও পেয়ে যাবে, আর সুযোগ পেলেই অমনি চেতনা ও ইচ্ছাকে সেই দিকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

আর এরূপ হলে এতে যে শুধু তোমারই উপকার তা নয়, এমন কি তোমার আশেপাশে যারা আছে তাদেরও উপকার হবে।

এর উদাহরণস্বরূপ তোমাদের পড়ার ক্লাসের কথা নিয়েই বলি, কেমন? মনে করো ক্লাসে যদি একটি বেয়াড়া নষ্টবুদ্ধি বদ ছেলে থাকে, তাহলে সে সমস্ত ক্লাসটাকেই এমন অশান্ত অশিষ্ট ক'রে তুলবে যে অসহ্য (সেইজন্য বাধ্য হয়ে তাকে ক্লাস থেকে বের ক'রে দিতে হবে নতুবা একজনের জন্যে সমস্ত সমস্ত ক্লাসটাই বিগড়ে যাবে)। কিন্তু ওর বদলে যদি একটি সুবুদ্ধি নেধাবী ভালো শান্ত ছেলে থাকে যে প্রত্যেকটি শিক্ষা তৎক্ষণাৎ সহজে গ্রহণ করে ও সহপাঠিদের উৎসাহিত করে তাহলে তার দৃষ্টান্তে গোটা ক্লাসটাই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। তার কোনো দোষত্রুটি থাকলেও যদি সে সচেতন হয়ে তা শুধরে নিতে আস্পৃহা করে তাহলে তার দেখাদেখি অনেকেই সেরূপ চেষ্টা করবে।...তবে কিনা এ কথা সত্য যে বর্তমান কালে ভালোর চেয়ে মন্দের দৃষ্টান্তই বেশি ছোঁয়াচে! ভালোর চেয়ে মন্দ দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করা অনেক সহজ, তবে ভালোরও একটা প্রভাব আছে, অর্থাৎ ক্লাসে যদি সত্যকার তেমন ভালো ছেলে থাকে যে সর্বদা শিক্ষার দিকেই একাগ্র হয় আর সে পক্ষে সকল সুযোগকেই গ্রহণ করে—তাহলে তার প্রভাবে সমস্ত ক্লাসটির মধ্যে এক নিরেট ভালো আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে।

অতএব ঐ ভাবে তুমি তোমার দৃষ্টান্তের দ্বারা অন্যদেরও সাহায্যকারী হতে পারবে।

প্রশ্ন মা, এখানে এমন রকমের জিনিস কেন হচ্ছে যে এখানকার নানারকম কাজগুলির মধ্যে কোনো কোনো কর্মী আপন খেয়াল অনুযায়ী যেমন খুশি তেমন ব্যাপার করে, আর সেইজন্যে অনর্থক এখানকার কত টাকাকড়ি বৃথা নষ্ট হয়?

উত্তর শুধু যে অর্থ নষ্ট হয় তাই নয়।

ওতে শক্তির ও চেতনার অপচয় ও অপব্যয় হয়ে যায়, যা অর্থ নাশের চেয়ে হাজারগুণ বেশি। কিন্তু এমন অপচয় যদি কোনো কিছু নাই হতো—তাহলে হয়তো এই আশ্রমই এমন ভাবে গড়ে উঠতে পারতনা। এমন একটি সেকেণ্ডও নেই যখন কোনো কিছুর অপচয় না হচ্ছে,—আর কখনো বা তার চেয়েও বেশি রকম খারাপ কাজ হচ্ছে। এ একটা রীতিমত অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেছে (আশা করি তা চেতনভাবে নয়). প্রত্যেকের আপন আপন মনের ব্যক্তিগত সন্তোষলাভ করতে চেয়ে অযথা বেশি বেশি মাত্রাতে শক্তির ও চেতনার বাজেখরচ করা। প্রতি মিনিটে মিনিটে এই জিনিস হচ্ছে। নিত্য যতটা পরিমাণে শক্তি ও চেতনাকে তোমাদের দিকে অযথা প্রয়োগ করা হচ্ছে তা যদি আসল উদ্দেশ্যের দিকে প্রয়োগ করা হতো, অর্থাৎ ভগবৎ কর্মের দিকে ও তারই প্রস্তুতি আনবার দিকে, তাহলে এত দিনে আমরা এর চেয়ে অনেক বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারতাম, এখন যতটা হয়েছে তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। কিন্তু প্রত্যেকেই তোমরা অল্পবিস্তর চেতনভাবে এবং অচেতনভাবেও যতখানি বেশি পারো এই চেতনাকে ও শক্তিকে নিজেদের দিকে টেনে নাও, আর যেমনি সেটা নিজের দখলে এসেছে বলে বোধ করো অমনি তা নিজেদেরই স্বার্থের কাজে লাগিয়ে দাও।

বস্তুত কেই বা এ কথা ভেবে দেখেছে যে এখানে যে উচ্চশক্তি নিত্য নিয়মিত ভাবে অসীম অধ্যবসায় ও ধৈর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে সর্বদা সঞ্চারিত করা হচ্ছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যাতে ভগবৎ ইচ্ছা সফল হতে পারে,—সেই শক্তির বৃথা অপব্যয় ঘটানো কোনোমতেই উচিত নয়,—কেই বা ভেবে দেখে এই নিয়ে? কেই বা ভেবে দেখে বা উপলব্ধি করে যে যথাসম্ভব উন্নতি ক'রে নেওয়া, আরো ভালো ক'রে সব কিছু বুঝতে ও জানতে শেখা, আরো সার্থকভাবে বাঁচতে পারা, এগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই অতি পবিত্র কর্তব্য? কারণ তোমরা যে বেঁচে আছো সে তো কেবল ভগবৎ শক্তি ও ভগবৎ চেতনার দৌলতে, আর সেই জিনিসকে লাগাচ্ছ নাকি আপন তুচ্ছ স্বার্থের দিকে।

তুমি কেবল কয়েক হাজার টাকার অযথা লোকসান দেখে দুঃখবোধ করছ, কিন্তু এতে তো কিছু শক পাওনা যখন...যখন দেখ যে এতটা চেতনা ও শক্তির প্রবাহ সঠিক উদ্দেশ্যের অভিমুখে বাহিত হবার পরিবর্তে তাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পৃথিবীতে থেকে যদি ভগবানেই কাজ করতে চাও তাহলে চলে এসো অসীম ধৈর্য ও সহ্যশক্তি নিয়ে। বস্তুত চিরন্তনের মধ্যে বাস করতে জানা চাই, আর জানা চাই সকলের মধ্যে চেতনার জাগরণের জন্য প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করতে—যে চেতনা হবে সর্বতোমুখী ও সর্বসার্থক।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

নামমাদুলি

দিলীপকুমার রায়

আলোর কথা বলবে সে কে ?—
ধন্য যে হয় মা-কে দেখে—
মা-র নামে কে দুলে ওঠে ?—
তার নয়নেই শুধু ফোটে
বেদনায়ও শান্তি ঝরে
শূন্য হৃদয় ওঠে ভ'রে
মা-র প্রসাদে খসে তারি
অভয় পেয়ে হয় দিশারি

মা-র জাদু ঘটায় অঘটন
চাউনিতে মা-র লক্ষ ভুবন
কেবল যদি ফাঁকি থাকে—
কার-সে ছোঁওয়ায় গোলাপ জাগে,
ডাকতে হবে শিশুর মত'ই
মা-র আদরে দুলব যতই—
মায়ার বাঁধন কাটবে তখন—
মা-কে বরণ করব যখন

খসেছে যায় চোখের ঠুলি।
সে-ই ওঠে মা-র নামে দুলি'।
বেসেছে যে মা-কে ভালো।
করুণ রাতে অরুণ আলো।
মা-র করুণায়—দেখে ধ্যানী,
বিশ্বে শুনে মায়ের বাণী।
বাঁধন যত, চোখের ধুলি,
সেই—প'রে মা-র নামমাদুলি॥

ঝড়তুফানেও অলে তারা
ধায় পুলকে আপনহারা
যায় না দেখা—কাঁটাবনে
শরণ নেওয়া চাই চরণে॥
কান্না কেঁদে "আয় মা কাছে!"
মিলবে মা-কে বুকের মাঝে।
পড়বে খ'সে চোখের ঠুলি,
প'রে মায়ের নামমাদুলি॥

আমন্ত্রণ ॥ শ্রীঅরবিন্দ
(Invitation)

মূল কবিতার প্রথম পংক্তি :
With wind and the weather beating round me

হাওয়া আবহাওয়া চারপাশে আমারে আঘাত হানে
আমার গন্তব্য শৈলগিরি আর ঐ গুল্মকান্তার।
কে আমারে সঙ্গ দেবে? কে যাবে পর্বত-অভিযানে?
যাবে নদীনালা ভেঙে-ভেঙে, দলে চলবে তুষার?

থাকতে পারি না আমি শহরের ক্ষুদ্র-পরিধিতে
প্রাচীরে ও দরোজায় তোমরা করেছ যারে রুদ্ধ;
ওপরে আমার ঊর্দ্ধ অম্বরে রহেন সুনীল ঈশ্বর—
আবার বিরোধিতায় মাতে ঝঞ্ঝা, বিদ্রোহী, বিক্ষুব্ধ।

নিজস্ব এলাকা ঘুড়ে বেলি আমি নির্জনতা নিয়ে
দুঃসাহসিক ভুল অভিযানে বন্ধু করি আমি।
কে বাঁচবে গরিমায়? কে বেঁচে থাকবে মুক্ততাবে?
চড়বে এখানে এই ঝটিকাতাড়িত বালতুমি।

ঝঞ্ঝা আর পর্বতের আমিই তো রাজ-অধিরাজ
স্বাধীনতা ও দম্ভের আমিই তো প্রাণিত বিগ্রহ।
দৃপ্ত হতে হবে তারে, আর বিপদের একাত্মীয়
যে আমার রাজভোগী, হাঁটে একত্রিত অহরহ।

অনুবাদ সুনীথ মজুমদার

ঈশ্বর ॥ শ্রীঅরবিন্দ
(God)

মূল কবিতার প্রথম পংক্তি:
Thou who pervadest all the worlds below,

যে তুমি রয়েছ নিম্নে, ভুবনে বিরাজ,
সে-ই বলো ঊর্ধ্বলোকে,
জ্ঞানী, কবী আর শাসকের অধিরাজ,
রহ প্রেমের সেবকে।

যে তুমি কীটে-পতঙ্গে বাটির দেলায়
করনা যে অনাদর—
আমরা তাইতো জানি ঐ বিনম্রতায়
তোমারে পরমেশ্বর।

অনুবাদ সুনীথ মজুমদার

দিব্য কর্মী ॥ শ্রীঅরবিন্দ
(The Divine Worker)

মূল কবিতার প্রথম পংক্তি:
I face earth's happening with an equal Soul;

ধরিত্রীর কর্মস্রোতে আছি মুখোমুখি, আত্মায় আত্মিক—
তোমার চরণধ্বনি বাজে সবখানে; তোমার গোপন পদভার
সমুখে আমার পথ করে যায় গন্তব্যের। জীবনের সামগ্রিক
জটিল উপপাদ্যের তুমিই তো দাও শেষ সমাধান পূর্ণতায়।

আত্মার প্রগাঢ় শান্তি ব্যাহত হবে না সঙ্কট-জর্জরে—
আমার সকল কাজ তোমারি, থাকি সে-কর্মসমর্পণে;
আমার ব্যর্থতা দোলে তোমারি ওই মৃত্যুঞ্জয়ী বাহুডোরে;
জয় যে তোমারি পথ, প্রতিবিম্বিত সৌভাগ্যের দর্পণে।

মানুষের নিয়তির সঙ্গে সুকঠিন এই সংগ্রামে
হৃদয়ে তোমার হাসি আমারে যে ক'রে তোলে বলদীপ্ত—
হৃদয়ে তোমার শক্তি বহানপ্রকল্পে যাতে পরিশ্রমে;
সময়-সরীসৃপের কুণ্ডলীর দৈর্ঘ্য-বিষয়ে নিলিপ্ত।

কোন শক্তি হত্যা করবে আমার সে-আত্মা, যে তোমাতে বহতা!
হৃদয়ে তোমার স্থিতি আনে আমার শাশ্বত অমরতা॥

অনুবাদ: সুনীথ মজুমদার

মহাজাগতিক মানুষ ।। শ্রীঅরবিন্দ
(The Cosmic Man)

মূল কবিতার প্রথম পংক্তি :
I look across the world and no horizon walls my gaze;

পৃথিবী ছড়িয়ে দৃষ্টি মেলেছি, কোনো দিগন্ত আড়াল করে না দৃষ্টিরে
দেখছে প্যারিস, টোকিয়ো এবং নিউইয়র্ক
-দেখছি ফাটছে বোমাগুলো সব বার্সিলোনা আর কান্টনের পথে-ঘাটে
মানুষের অজস্র ভুল আর কদাচিৎ শুভকাজ
রয়েছে আমারই এক আত্মার মিশে—
আমিই তো সেই পশু, সে-পশুরে সে হত্যা করে, আমিই তো সেই পাখি
সে-পাখিটিরে সে খাওয়ায় দাওয়ায়, আগলায়
কতনা অজানা মনের ভাবনা-হিল্লোল শিহরণ আনে আমাতে—
লাখো মানুষের দুখের বেদনা আমি বহে চলি হৃদয়ের নির্জনে।

অনুবাদ সুনীথ মজুমদার

গাছটি ।। শ্রীঅরবিন্দ
(A Tree)

মূল কবিতার প্রথম পংক্তি :
A tree beside the sandy river-beach

গাছটি দাঁড়িয়ে আছে বালি-ছাওয়া নদীটির সৈকতে
সবচেয়ে উঁচু ওর শাখা আর প্রশাখা ধরেছে মেলে
যেন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধ আকাশে, আকাশ পারে না ছুঁতে,
রয়েছে মাটির টানে আঁকড়িয়ে, স্বর্গের প্রেমে হেলে।

এইতো আত্মা মানুষের ; আছে শরীরে ও চিন্তায়
মাটির তৃষ্ণা, স্বর্গবিহারে তাই দেরি হয়ে যায়।

অনুবাদ সুনীথ মজুমদার

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা রায়

(৩৬)

বিশ্বচেতনার (Cosmic Consciousness) মূল কথা—চৈতন্যের ব্যাপ্তিতে ব্রাহ্মীস্থিতির অবস্থা। চৈতন্য ব্যাপ্ত বা বৃহৎ হতে থাকে, সেই বৃহৎ হওয়ার ভাবকে বলি ব্রহ্ম, আর গুটিয়ে যাবার অবস্থাকে বলি আত্মা। আত্মা ব্রহ্ম দুই মিলে অনুভব "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। আমার মধ্যে স্থির এক বিন্দু আছে। তাতে মগ্ন হয়ে একাকার হয়ে গেলে জগতের যে আর কারও বা কিছুই রইল না। নিজেকে বৃহৎ করার প্রেরণা যেমন সর্ব জীবেই বর্তমান, তেমনিই আছে গুটিয়ে যাবার অন্তর্নিহিত টান। তাই, বৃহৎ হওয়ার আকাঙ্খায় নিজেকে ছড়িয়ে ছাপিয়ে উধাও হওয়ার চাহিনা যেমন জীবচৈতন্যে অনুস্যূত, তার এই ব্যাপ্তিধর্মের কেন্দ্রে ওই যে স্থির বিন্দুটি আছে, সেখানে অচল ধ্রুবস্থিতিটুকুও ঐসঙ্গে চাই ; সেই কেন্দ্রবিন্দুটি ধরতে না পারলে, সীমা অসীমে মুক্তি পেতে পারে না। তাই গুটিয়ে গিয়ে ওই আত্মানুভব বিন্দুলীন হয়ে আবার সব ছাওয়া সব ছাপানো অক্ষর ব্রহ্মে একাকার হয়ে যেতে থাকে সেই অক্ষরানুভবের পর ক্ষর ব্রহ্মে আসতে গেলে বৈশ্বচৈতন্যে আসা চাই। অধ্যাত্ম, অধিদৈবত ও অধিভূত, এই ভাবে বিশ্বাতীতে, বিশ্বসমগ্রে আবার জীবনে এই তিন ভাবের ভাসা, ব্রহ্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য জীবচৈতন্য এই তিন ক্রমে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের প্রকাশ।

আত্মচৈতন্যেই বিশ্বচৈতন্যের অনুভব, তাই আত্মচৈতন্যের ক্রম ধরেই আমাদের বুঝতে হবে। কঠোপনিষৎ সেই স্তরগুলি দেখাতে যে শ্লোকটি নিয়েছেন, "যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি..." ইত্যাদি, এর অর্থ বাক গুটিয়ে আসবে মনে, কেননা বাহিরের জগতের সঙ্গে বাক্ নিয়েই সম্বন্ধ। বাক্‌নিরোধ বা কথা কম বলা, বাক্ সংযম ইত্যাদি সাধনাঙ্গ রূপে পরিচিত। তাই বাক্ মনে গুটি যাওয়া অর্থ বাক্‌কে মনে আহুতি দিতে হবে, আর মনকে যেখানে আহুতি দিতে হবে, তিনিই জ্ঞানাত্মা। জ্ঞান-আত্মাকে মহান্ আত্মায় আর মহান্ আত্মাকে শান্ত আত্মায় আহুতি দিতে হবে। স্বাভাবিক ভাবে আত্মার এই তিন অবস্থা প্রতিভাত হতে পারে। এ থেকে আত্মচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বাতীত চৈতন্য, চেতনার ওই তিন পরিণাম বোঝানো হয়েছে, এ তিনের পরম সমন্বয় অদ্বৈতানুভবের যথার্থ স্বরূপ।

জ্ঞানাত্মাকে পেলে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যের উদ্দীপনে "পাকা আমি" বা জীবাত্মাকে চেনা যায়। দেখা যায়, অন্তরে যিনি চিন্ময়, মৃণ্ময় আধারের অন্তরালে তিনিই আবার বিচিত্র বর্ণের আবরণে, সে তো 'আমি'ই। আত্মদর্শনের পথে সবই দেখে যেতে হয়, কিন্তু চেতনার সাধারণ ভূমিকে প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষ জড়িয়ে আছে বলে, দেখায়ও দোলা লাগে। যে আমি এই অধঃপরিণামের সঙ্গে যুক্ত, তাকে বলা যায় 'ভূতাত্মা' বা কাঁচা আমি। আর উর্ধ্ব পরিণামের সঙ্গে যুক্ত জীবাত্মাই যোগের সাধক।

কিন্তু জীবাত্মা এক ভূমিতে নিজেকে অনুভব করে প্রকৃতির উর্ধ্বে অপরিণামী চিৎস্বরূপ বলে, যিনি শত আঘাতেও বিচলিত হন না, আন্দোলিত হন না। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির শাশ্বত ধ্রুব তাঁর সেই স্থিতি। বেদান্ত তাঁকে বলেছেন কূটস্থ আত্মা। তিনিই সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ, তাঁরই আলোয় সব কিছুর প্রকাশ। কূটস্থ আত্মায় অনুভব, পরিণামে এক বিশুদ্ধ সত্তার বোধ এবং তাও অবশেষে অবর্ণ শূন্যতার বোধে বিলিয়ে যেতে পারে। তাই কূটস্থ সৎ আর অসৎ এই তিন ভাবে বা ভূমিতে জীবাত্মার অতিস্থিতি বা বিশ্বোত্তীর্ণতা, আর তার সামনেই চলে বিশ্বপ্রকৃতির লীলা। অতিস্থিতিতে অস্পর্শ দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা আর বিশ্বপ্রকৃতিতে স্পন্দ, লাভ-ক্ষতি জয়-পরাজয় সবরকমের দ্বৈতলীলার দোলা। এই দুয়ের মাঝে হলেন বিশ্বচেতন পুরুষ বা "বিশ্বাত্মা"। এই বিশ্বাত্মার অনুভব "মদাত্মা সর্বভূতাত্মা", সবার গভীরে যে আমি আর আমার মধ্যে যে আমি, দুই-ই এক। এই আত্ম-চৈতন্য সবার মধ্যে ব্যাপ্ত, যেমন তা দেখি নিজের গভীরে দৃষ্টি মেলে দিয়ে, তেমন এই আত্ম-চৈতন্যে, এই আত্মার মধ্যেই সব আত্মা এই বিরাট অনুভব আসে মহান আত্মায়; তখন তাকে বলি মহাত্মা, আর তাই হল বিশ্বাত্মা বিশ্বচেতনা। জ্ঞানস্বরূপ বোধে এল, আর আলোয় সব আলোময় হয়ে উঠল। সে যে আলো, তার ধর্মই আলো দেওয়া, আলো হয়ে ছড়িয়ে পড়া। মূলে কিন্তু সংহত সেই বিন্দু। আর ওই নিষ্কম্প বিন্দুই আলো ছড়িয়ে সব ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে যায় বিরাটে—ব্রহ্মের একরূপ। তার মধ্যে ডুব দিলে আরও আরও গভীরে... আলোও নেই আঁধারও নেই যেন কিছুই নেই। যেমন কিনা এক সূর্য আকাশে, কী দীপ্ত বিরাট তার প্রকাশ, আবার তাকেও ছাপিয়ে অবর্ণ এক আকাশ। যে আমি গুটিয়ে, সে-ই বৃহৎ হয়ে মহান্, সেই ব্যাপ্ত হয়ে শান্ত, এই দুই বোধই আবার একই সঙ্গে না হলে ব্যাপ্তির ভাব হারিয়ে, সাধনায় সঙ্কট আসে। তখন বিশ্বকে প্রত্যাখ্যান করে নাস্তির গহ্বরে হারিয়ে যাবার ভয় থাকে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তাহলে হল কোথায়? এ অনুভব জাগ্রতের। উপনিষৎ তাই বলছেন, সমাধিস্থ হয়ে চোখ বুজে যে শুধু অন্তরে দেবতাকে দেখি, তা নয়। চোখ মেলেই দেবতাকে দেখছি, "এষ ওষধিষু বনস্পতিষু"। ইন্দ্রিয়ের বোধেই বহির্জগতের মূল্যবোধ রূপান্তরিত হয়ে দেখছি বৈচিত্র্যের লীলা। তবুও সব ছাপিয়ে, সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই দেখি। তখন আর ব্রহ্মের সক্রিয় অক্রিয় সগুণ নির্গুণ বিবাদ থাকে না। সব দেখার মধ্যে ওই সচ্চিদানন্দ অমৃতকে যখন নামিয়ে আনতে পারা যায়, তবেই আমার চেতনার সার্থকতা, সেই হবে দিব্য জীবন, Life Divine। তাই তো তিনি বলেছেন, বিশ্বাত্মক বা বিশ্বচেতন না হলে দিব্যজীবন সম্ভব নয়।

ওই সমগ্রের বোধ একসঙ্গে না আসাতে, এযুগে দেখতে পাই, One World, One Law এসব করতে গিয়েও হানাহানি থেকে যাচ্ছে। সবাই বলতে চায়, আমারটা ঠিক ওরটা নয়। আর তা নিয়ে বিবাদের অন্ত নেই। তাইতো বলি, লক্ষ্য হওয়া চাই ঐ অদ্বৈতবাদের ভিত্তি। এটাই বিশ্বের বিশ্বচেতনার মূল সূত্র। সেই নিরুপাধিক অনুভূতি লাভ না করা পর্যন্ত বিরোধের সমাধান হবে না। তাই, ভাল করতে বা ভাল দেখতে হলে দ্বন্দ্ববোধের উর্ধ্বে উঠতে হবে এবং সেই কারণেই নিরালায় নিজেরই গভীরে ডুবতে হবে...গভীরে আরও গভীরে ডুব দিয়ে আত্মদীপের খুঁটিটি পেয়ে গেলে তবেই স্বভাবেরও উপলব্ধি হবে, আত্মারও যাত্রা শুরু হবে। তখনই দেখা ও বোঝা সম্ভব যে সকলের

মধ্যেই এক আত্মা, আর সেই আত্মাকে ধরেই মঙ্গল চিন্তা মঙ্গল কর্ম সম্পাদিত হতে পারে। বাহিরের পরিচয়ে মানুষকে চিনলে বুঝলে হবে না, মর্মের সঙ্গে মর্ম মিশিয়ে পরিচয় করতে পারলেই মঙ্গল কিসে আসে, তা উদ্ভাসিত হবে। নিবেদিতার এই সাধ্বী দৃষ্টি খুলে গিয়েছিল, তিনি তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে বলেছিলেন "I address the soul within"। বিপ্লব পরিচালনা করতে হলেও অন্তরলোকে প্রবেশ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নিজেকে অবিপ্লুত অবিক্ষুব্ধ রেখে চলতে হবে। আত্মদর্শন হলে, তবেই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র হয়ে উঠবে। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রথচক্র দিয়ে ভীষ্মকে বধ করতে যাচ্ছেন, তাও দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখানো হয়েছে।

একদিকে পাকা আমি জ্ঞান আত্মা, আর অপর দিকে শান্ত আত্মা (Passive Brahman), মাঝে বিশ্বাত্মক মহান আত্মাকে ভুলে গেলে চলবে না। সেই ভুলটাই নাকি অনেক ক্ষেত্রে পেয়ে বসে। ধ্যানে স্বপ্নসমাধিতে সুষুপ্তিতে পেলেই তো শুধু হল না, ওই সুপ্তিকে স্বপ্নকে জাগ্রতে নামিয়ে আনতে হবে। সুষুপ্তি শক্তির উৎস। জাগ্রত ব্যবহারে শক্তির প্রচোদনা তা হতেই আসে। অন্তরের স্বপ্ন ধ্যানচিত্র, আর ওই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি তিনটি ভূমিকেই আলোকিত করে রয়েছে তুরীয় চতুর্থ ভূমি—"ত্রিষু চতুর্থং তৈলবৎ আসীচ্য..." জলের ভেতর তেল ছড়িয়ে দিলে যেমন, তেমন করেই সেই তুরীয় সর্ব ভূমিতে অনুস্যূত। এই ভাব নিয়ে যদি দেখি, দেখব জীব ও ব্রহ্মের মাঝে বহু জীবন সমষ্টি, তাকেই বলি শক্তি, তিনিই অদিতি অবন্ধনা চেতনা, সবই তিনি পিতা মাতা পুত্র ভ্রাতৃ অনিত্বৃ পিতা মাতা পুত্র ভূত ও ভবিষ্যৎ প্রাণীবৃন্দ। পুরাণে শিব শক্তি কুমার, শৈবদর্শনে পশুপতি পাশ (শক্তি) পশু (জীব) এই ত্রয়ী। জীব ব্যক্তিচৈতন্য মহানাত্মা মহাশক্তি, শান্ত আত্মা পুরুষ-পিতা, সবই অদিতি মাতা—এই ভাব আনতে ও বুঝতে হবে।

সেজন্য প্রথমেই চাই চেতনার ব্যাপ্তি, বিস্তার—বৃহৎ হওয়া। ধ্যানে যা পাই, তাকে যদি জাগ্রতে বহন করতে না পারি, তাহলে ধ্যান সার্থক বা পূর্ণ হল না, তীর্থ পরিক্রমা হল না। বৌদ্ধেরা বলেন ধ্যানচিত্তের কথা, সর্বদাই তাকে বহন করে চলতে হয়। কিন্তু এই ধ্যানভূমি সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা চাই। একাগ্রভূমিতেও ভুল হয়ে যেতে পারে, কেননা মন সেখানে গুটিয়ে যায়, ছড়াতে চায় না। তাই মনের মায়াতে বিষ্ণু আসে। "লব্ধভূমিকত্ব" যাকে বলা হয়, সেটা পেতে হলে শুধু বৃত্তির একাগ্রতা নয়, ভূমির একাগ্রতা-বোধ চাই। অগ্র্যাবুদ্ধিতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর আবরণ ভেদ করে একেবারে কেন্দ্রে গিয়ে আবার ছড়িয়ে পড়া। কেন্দ্র বিন্দুগুলিও সব একই কেন্দ্র, এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে প্রবেশ করলে পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে, আর তা-ই হল বিশ্বাত্মক চেতনায় প্রবেশের কৌশল। যতই উর্ধ্বে গতি হয়, ব্যক্তির নির্বর্ণ অনুভব আর বিশ্বাত্মক অনুভব নিয়ে চেতনার পরিধিও বিস্তৃত হতে থাকে। পরপর তিনভূমির কথা পাওয়া যায়, "সর্বম্ আপ্নোতি", কিনা সব কিছুই আত্মাতে। চোখ খোলা ইন্দ্রিয়মন সবই আছে, কিন্তু সব অনুভবের আধার আত্ম-প্রত্যয়ের নির্বর্ণ অনুভব এক গভীর প্রশান্তি। তারই মধ্যে আবার ধ্যানচিত্তের বিন্দু-ঘনতা ব্যাপ্ত হলে ভাবলোক স্ফুরিত হয়। তাহলে দেখি ঐ অবর্ণের অনুভব দিয়ে সংব্রহ্ম দিয়েই অধিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা হয়—"সন্মূল সদায়তন সৎপ্রতিষ্ঠা"—"একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। সেই একেরই আবার পরম্ বিস্তার—"এতৎ আত্মম্ ইদম্ সর্বম্"।

এই ভাবে ক্রমে সবই আত্মা, আবার আত্মাতেই সব। অতিমানসের প্রথম বিভাব, এই সদ্‌-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠা যাকে বলা হয়েছে, জাগ্রতে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি। এর গভীরে যে বিশ্বচেতনা, সত্তার চৈতন্যের আবির্ভাব, আর তখনই অর্ধ উদ্‌ঘাটিত হল—"তদিদ্গো অর্ধং চেততি"। ...অর্ধং ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। সব যেন আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠল, মৃত্যু হতে পেল প্রাণ। যিনি অন্তর্যামী পুরুষ, ব্রহ্ম, সবাকার অন্তরে একজন হয়ে রয়েছেন, তিনিই পৃথিবীরও অন্তরে। তিনি পৃথিবীকে জানেন, নিয়ন্ত্রিত করেন। কিন্তু পৃথিবী তো তাঁকে জানে না। এই অন্তর্যামীকে পেলে সবার মধ্যে দেখলে ভূতে ভূতে ব্রহ্মদর্শন—অতিমানসের এই হল দ্বিতীয় বিভাব। সৎচিৎ ব্রহ্মের চৈতন্যরূপে অনুভব হল, শুধু তটস্থ লক্ষণে নয়, সবার মধ্যেই এক আমি। তখন ব্রহ্মই যে সর্বাধার অন্তর্যামী—"আত্মৈবাভূদ্বি জানতঃ" "তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বম্ অনুপশ্যতঃ"। বিজ্ঞান প্রতিভাত হল, দেখলাম আত্মস্বরূপই সব, তখনই সেই প্রেম আনন্দের সাক্ষাৎ অনুভব। এই রকমে তিন ভাবে বিশ্বাত্মক ব্রহ্মের অনুভব উপলব্ধিতে কায়েম হলে ব্যাপ্তিচৈতন্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। "আনন্দরূপম্ অমৃতম্ যদ্বিভাতি"...সেই আনন্দই আবার হৃদয়কমল হয়ে ফুটে উঠল, আবার তারই মধ্যে আকাশ পরিব্যাপ্ত আপূরিত—দহর পুণ্ডরীকের মধ্যে আকাশ, এ-ই ব্যাপ্তিচৈতন্যের পরিধি বলা যায়। এই আকাশ আনন্দ যদি না থাকত, কে বেঁচে থাকত, কে শ্বাস নিতে পারত। এ তো মন দিয়ে পাবার নয়, এ বিজ্ঞান। মনকে পেরিয়ে না গেলে তাকে পাওয়া যায় না। এই ভাবের জগৎ এত স্পষ্ট যে, ব্যক্তি সেখানে লুপ্ত, তাতেই ভাবের সার্থকতা এবং ব্যক্তিও তাতেই সার্থক। এই বিজ্ঞান অবলম্বন করে অন্তর্যামী আনন্দকে লাভ করতে হবে, আবার বিপরীতমুখে তাকে নামিয়ে আনতেও হবে, সুষুপ্তি থেকে স্বপ্নে তা থেকে জাগ্রতে দিব্যমনের ভূমি, তা থেকে দিব্য প্রাণে এবং তারপর দিব্য দেহে তার অবতরণ ঘটাতে হবে। আর বিশ্বচেতনার প্রতিষ্ঠা তখনই সম্পূর্ণ হবে। মনের গণ্ডী নিঃশেষে না ভাঙলে তা হবে না, আর তা না হলেই দেহ প্রাণের ভেদের সংস্কার প্রবল হয়ে আড়াল হয়ে দাঁড়াবে।

মূল কথা, সেই চেতনার প্রসার চাই, তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। চৈতন্যের ব্যাপ্তি-রূপে যে ব্রাহ্মী স্থিতির কথা বলা হয়, তাই বিশ্বচেতনা। প্রাচীনেরা বলতেন বৃহৎ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা সর্ব জীবে অনুস্যূত। এই হল সেই নিজেকে বৃহৎ কর, বৃহতী হয়ে যাও, অনন্ত আকাশে উধাও হয়ে যাও, আর তাইতেই তোমার নিজের প্রকাশ। এই নিজেকে বৃহৎ করার প্রেরণা যেমন জীবনের অন্তরে বাঁধা পড়ে আছে, তেমনি আছে তার কেন্দ্রে এক অচল ধ্রুব শান্ত স্থিতি। আমারই মধ্যে সনাতন ধ্রুব সেই বিশ্বু তাতে ডুবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারি, আবার সেই সঙ্গেই জগৎ যেমন আছে, তাতে আছি, তাকে ছাপিয়ে লোকোত্তর তার যে শিবসত্তা তাকে পেয়ে বিশ্বলোকে স্থান পেয়ে স্বধামে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জীবসত্তায় স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া, এই তিন ভাবেই জানা থাকা হওয়া চলে।

আবার দেখি, নিজেকে নিয়ে তো শুধু জীবন ধারণ হয় না, জগৎ সংসারেও নিজের গণ্ডী কেটে বড় পরিধিতে ক্রমে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে হয়। তা থেকে সমাজ পরে রাষ্ট্র এই ভাবে পরিধি বেড়ে চলে। তাই সেক্ষেত্রেও বিশ্বচেতনার কথা আসে। তাই তো U.N.O. ইত্যাদি সব সংগঠনের প্রচেষ্টা চলেছে। কিন্তু তাকে সুষ্ঠু ও পূর্ণাঙ্গ

রূপ কি করে দেওয়া যেতে পারে, সেটা এই যোগের জ্ঞানে পর্যায়ক্রমে শিখে নিতে হবে। আত্মযোগের সাধনায় প্রথমে নিজেকে প্রস্তুত করার সময়, চারাগাছকে বেড়া দিয়ে রাখার মত আত্মসংযমে প্রযত্নশীল হতে হবে। কঠোপনিষৎএর বাণী পূর্বেই উল্লেখ করে আত্মার স্তরগুলি আলোচনা করে দেখেছি প্রথমে মনকে বশে আনাই আসল কথা...শেষ পর্যন্ত থাকুকে মনে ডুবিয়ে দিয়ে মনস্বী হওয়া। "থোরো" বলেছিলেন, মনকে বশে আনার শিক্ষা তিনি উপনিষৎ থেকে লাভ করেছেন। চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে আনতে পারলে, শেষে চিন্তা আর থাকে না। বিক্ষেপটা কোথা হতে কি ভাবে আসছে, এটাই দেখতে হয়, বুঝতে হয়। অবশেষে এই দেখাটাই হয়, তিনি জাগলে পর সাক্ষী দ্রষ্টা স্বরূপে অবস্থান। এই শিক্ষাধারা ইউরোপেও এখন সুরু হয়েছে যে, নিজেকে দেখা নিজেকে চেনা করতে পারলে স্থিরবুদ্ধি জাগবে। আর এই ভাবে চলেও যদি নিজেকে দেখতে শিখে নিজের বিচারক হতে পারি, তবে জ্ঞানাত্মাকে পাওয়া যাবে আর তখন কোনো কিছুই বিচলিত করতে পারে না।

এর পরের অবস্থাকে 'কূটস্থ' আত্মা নাম দিতে হয়, যেখানে সব কিছু ছাপিয়ে পেরিয়ে যেতে হয়। Life Divine গ্রন্থে Triple status of Supermind অধ্যায়ে তিন ভূমির উল্লেখ করেছেন প্রথমে এক বৃহত্তের বোধ দিয়ে আরম্ভ করাই সহজ ধর্ম। কিন্তু তা করতে গিয়ে পদে পদে বাধা দেখা দেয়। অফুরন্ত ভালবাসা থাকলে সেটা সম্ভব। আঘাত পেলেই শামুকের মত গুটিয়ে গেলে চলবে না। তাই এক বিরাট বিশ্বচৈতন্য সদা বর্তমান, আর তারই মধ্যে আমি রয়েছি, এই বোধ এলে সহজ ভাব আসে। জ্ঞানাত্মার ভাব আসে। জ্ঞানাত্মার পরিপাকে দেখা যায়, চেতনা লঘু হয়ে হাল্কা যেন তুলোর মত হয়ে যায়, আর তখন এই দুঃখপ্রদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। জ্ঞানে চৈতন্যের প্রসার ঘটে, আলো জ্বলল, একটা আগুনের ফুলকি। কিন্তু আলো হয়ে তা ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তাই চিৎ এর নিকটতম জড়কণায় যখন আলো পড়ে, আলো হয়ে ফোটে, তখন জড়বস্তুও স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর হতে থাকে, তাকে বলা হয় ধাতু-প্রসাদ। ওদিকে চৈতন্য যতই গুটিয়ে যেতে থাকবে, এদিকে ততই শিব শান্ত হয়ে যাবে। জ্ঞানাত্মা হতে মহানাত্মায় যেতে স্বভাবতই এটা ঘটে। এই জগৎব্যাপী আত্মায় মহানাত্মা, বিশ্বচৈতন্য। এর পরের অবস্থা শান্ত আত্মা। দেখলাম, জ্ঞানাত্মায় নিজেকে জানা, আর সব ছাপিয়ে তুরীয় স্থিতিতে হল শান্ত আত্মা মাঝখানে যে বিশ্ববোধ, এই হল মহানাত্মা, তাকেই বলতে পারি Cosmic Consciousness।

সমষ্টি চৈতন্যকে যদি বিশ্বের পশ্চাতে ভাবনায় আনতে পারি, আর তারই মধ্যে ক্ষুদ্র একটি বিন্দু, অণু এই আমি, তাহলে গীতার সেই 'যেন সর্ববিদং ততম্' যা কিছু সব ছেয়ে আছে, অবিনাশী অনন্ত সেই তত্ত্বকে জানার বোধও সহজে হয়। অনন্তের পটভূমিতে জীবন দেখতে পারলে চিনতে পারলে বোঝা যাবে, জীবনও সচ্চিদানন্দময়। সঙ্কীর্ণ বোধ ছিল বলে বিশ্বের সব কিছু আঘাত করত, পীড়া দিত। বৃহতে চিত্তের প্রসার ঘটলে সব কিছু ক্ষমা করতে পারা যায়, দেখা যায় সবই শাশ্বত সত্যের পানে চলেছে, তবে আর ঝগড়া কিসের? ওই ভাবের সব ছাপানো সব ছাওয়া চৈতন্যে পুরুষবিধতা (Personality) আরোপ করে বলতে পারি, তিনিই সব ছাপিয়ে সব হয়ে আছেন। আবার তাঁরই অভিব্যক্তিতে এই সব ছোট ছোট ঝগড়া-বাগড়া থেকে যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত সবই ব্রহ্মসনুত্রে উঠছে পড়ছে।

এ-ই আত্মদর্শন—উপনিষৎ যেমন বলেন, "আত্মাতে দেখ, সব কিছুই আত্মার অভিব্যক্তি"। তখন জগৎ সুসহ হয়ে আসবে।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনায় তাঁর প্রথম উপলব্ধির কথা জানা যায় "বাসুদেব সর্বমিতি"। যিনি অধিষ্ঠান হয়ে সব ছেয়ে আছেন, তিনিই অন্তর্যামী রূপে ঘটে ঘটে বিরাজিত। তখনই না জীবনের অর্থ পরিস্ফুট হয়, বিশ্বশক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে, বিশ্বকমলের সাথে একীভূত হয়ে সব সমস্যার সমাধানও মিলে যায়। বিশ্বভুবন কালীর নৃত্য। গীতার বাণীতে তাঁর আত্মপরিচয় "কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ..."। তিনি কাল রূপে সংহারমূর্তি না ধরলে, কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ না ঘটালে, ওদিকে ওদিকে বৃন্দাবনের স্বপ্নবিলাস হয় না। এটাই Cosmic Law. কিন্তু আসুরীবুদ্ধি পেয়ে বসলে, অহং এত ক্ষেপে ওঠে যে, জগৎকে জোর করে ধ্বংসের ভিতর দিয়ে নিজের কবলে আনতে চায়। তাই সাধনাও কঠিন হয়ে পড়ে। আত্মবোধের সংস্কার হলে, বিশ্বচৈতন্যের মাঝে একাকার হয়ে যেতে হবে। গীতার ভাষণে তিনিই যেমন সব ছাওয়া সব ছাপানো, আবার তিনিই ঘটে ঘটে বাসুদেব। তটস্থ থাকা সম্ভব হলেও শক্তির বোধই চরম কথা। চৈতন্য ধীরে ধীরে সহস্র দল কমলের মত দল মেলে মেলে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবে।

সমস্ত কর্মজগৎ শক্তির এলাকায়, সবই তাঁর উৎসারণ। তিনিই সব হয়েছেন, হয়ে চলেছেন, এ দর্শন এ বোধ মনের বাধা না কাটলে আসে না। অতিমানস দৃষ্টি খুলে গেলে তবেই পূর্ণ দর্শন সম্ভবপর। 'তিনি' হয়ে জগৎকে দেখা ও ব্যবহার করা সাধর্ম্য মুক্তি, তখনই সাধন পূর্ণাঙ্গ। মন থেকে বড় কঠিন বাধা সব এসে পড়ে, বিশ্বচেতনার বোধে মনের বাধা সম্বন্ধে কয়েকটি স্তরও তিনি দেখিয়েছেন। প্রথম তো মনের সংস্কারে এসে জগতে সত্য হারিয়ে যায়। তারপর, বিশ্বাতীত থেকে বিশ্বচৈতন্যে মগ্ন হয়ে দ্রষ্টা হয়ে যে চরম অবস্থা তাতেও নীচের জগৎ বাদ পড়ে যেতে পারে। নীচে নেবে ব্রহ্মদর্শন হলে বিশ্বচৈতন্যের বোধও অদ্ভুত হয়, এ মন বিশ্বেরই মন, প্রাণ বিশ্বেরই প্রাণ আর এই দেহেই বিশ্বাত্মা। তাই বলে অপরের দুঃখে কাতর হয়ে, মনের বোধ নিয়ে ক্ষমতার অভাবে হাপুস নয়নে কাঁদলেই বিশ্বচৈতন্য হয় না। এই মনুষ্যের অহন্তা আর বুদ্ধের করুণা এক নয়, এটা প্রথমেই বোঝা দরকার। সেই করুণা প্রসাদ, তা শক্তিময়, তাতে শক্তি ঝরে ঝরে পড়ে। বুদ্ধের করুণা-হৃদয় হতে বিশ্বের মূল আরোগ্য শক্তির সঙ্গে এক হয়ে তাঁর প্রসাদ হয়ে যদি দাঁড়াতে পারি, সেটাই বিশ্বচৈতন্যের কর্ম।

মূলকথা বিশ্বচৈতন্যের অনুভব সিদ্ধ হবে চেতনার রূপান্তর ঘটলে পরে। তা মনে নয়, বিজ্ঞানে; মন বিজ্ঞানে পরিণত হলে অতিমানসে আরূঢ় হওয়া যায় যাতে, উত্তর-মানস প্রভামানস বোধিমানস অধিমানসের স্তরগুলি খুলতে থাকে। এরকমে বিশ্বচৈতন্যকে আবার দেহগত প্রাণগত মনোগত করা হল সেই অতিমানস শক্তির অবতরণ। সব কিছু, আধিব্যাধি পর্যন্ত তাঁর কাছে আহুতি দিয়ে জ্বলতে জ্বলতে চলা...অগ্নিস্নাত হয়ে পরম দেবতার পূর্ণাহুতি হয়ে যেতে হয়, তবেই চেতনার পরিপূর্ণ রূপান্তরের ফলে বিশ্ব-চেতনার সিদ্ধি।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

"ছোট্ট হাসি"কে লেখা শ্রীমা'র পত্র

অনুবাদ : রীণা মিত্র

[এই চিঠিগুলি শ্রীমা লিখেছেন আশ্রমের প্রথম শিশুটিকে, যাকে তিনি ১৯২৮ সালে যোগের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। বালিকাটির বয়স তখন ১৪ বছর, এবং সেই সময় থেকেই সে শ্রীমার জন্য সূচী-শিল্প করতে আরম্ভ করে। পরে সে শ্রীমা'র ব্যক্তিগত সেবিকার কাজে নিযুক্ত হয়।]

আগস্ট, ১৯৩১

শ্রীমা—তুমি শাদা শাড়ীর উপর লাল ফুলের সূচী-শিল্প আরম্ভ করবে। লাল গোলাপ-গুলি আমার ভাল লাগে। এত বড় কাজ শেষ করতে তোমার কতদিন লাগবে মনে করো?

উত্তর—এক বছরের মধ্যে আমি এই কাজ শেষ করবো।

শ্রীমা—তবে ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে আমি এই শাড়ী পরতে পারবো।

আগস্ট, ১৯৩১

এই গাছটির গন্ধ "তারবেনার" মত। আমরা এর অন্তর্নিহিত অর্থ দিলাম "কন্-করারিং ফারভার্"—অর্থাৎ বিজয়ী আগ্রহ।

আজ বড্ড দেরী হয়ে গেল। ১৫ই আগস্ট—এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিও এসে পড়েছে খুবই নিকটে। সুতরাং আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত। আজ আর সুন্দরী ছোট্ট মেয়েটিকে, আমার সুদক্ষ ফুলে পরীটিকে বেশীক্ষণ সময় দিতে পারবো না।

১০ই মে, ১৯৩২

মধুময়ী মা,

আমি তোমাকে এই টাকা পাঠালাম। এখন আর আমার হাত-খরচার বিশেষ প্রয়োজন নেই। ইতি—

শ্রীমা—তোমার টাকা পেয়েছি। আমি এই টাকা আমার ছোট মেয়েটিকে পুনরায় উপহার দিলাম। এই সঙ্গে রইল আমার আশীর্বাদ। তুমি যে ক্লেস পরীক্ষায় পাশ করেছ তার জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

আমার আশীর্বাদ জেনো।

১লা আগস্ট, ১৯৩২

আমার ছোট্ট হাসি,

তোমার চিঠিখানি পেয়ে আমি খুবই খুশী হয়েছি। আমার মনে হয়, তুমি এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছো।

এই সব জিনিষগুলির উপর তুমি খুব বেশী গুরুত্ব দেবে না। ছোট শিশুদের, যাদের এখনো জীবনের ভাল-মন্দ মঙ্গলামঙ্গলের কোনো রকম অভিজ্ঞতাই নেই, এ-সব হলো তাদের কল্পনাপ্রসূত চিন্তা। কারণ, গল্প বা উপন্যাসে আমরা জীবনের যে ছবি পাই তা সত্যকার জীবন নয়। সত্যকার জীবন রয়েছে প্রতিদিনের ছোট বড় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সত্যকার আনন্দের মধ্যে পৌঁছানোয়।

তোমার পরিপূর্ণ নির্ভরতা রেখো, তাহলে দেখবে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

আমার ভালবাসা নিও। ইতি—

...১৯৩...

শ্রীমা—অলসতা 'তমোগুণ' থেকে আসে, কল্পনাপ্রসূত কোনো কাজ-কর্ম যখন সেই তমোকে চঞ্চল করে তোলে তুমি তখন তমোগুণের বাইরে বেরিয়ে পড়তে পার। কিন্তু তামসিকতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার এটাই একমাত্র উপায় নয়। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিত উপায় হলো ঊর্ধ্বতন চেতনার ও আলোকের কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে খুলে ধরা। তামসিকতার পরিবর্তে সেই চেতনা এবং আলোকেই বহি:চেতনাতে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করা।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩২

প্রশ্ন— ...আমার মন সর্বদাই চঞ্চল থাকে—যেন পাগলের মত চারদিকে ছুটে বেড়ায়।

শ্রীমা—হ্যাঁ, মন সবসময়েই অমন পাগলের মতই ছুটে বেড়ায়। সর্বপ্রথমে চেতনাকে অমন এলোপাতাড়ি চিন্তা থেকে পৃথক করতে হবে। মনকে তার পথে ছেড়ে দিয়ে তুমি নিজে শান্ত হয়ে থাকবে। তারপর এমন হবে যে, মন আর ওইভাবে ছুটে বেড়াতে আনন্দ পাবে না, এবং ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে যাবে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

প্রশ্ন— ...মা, যখন তুমি অর্গান বাজাও অন্যদের মত আমিও ভাবি, তুমি আমার জন্যই অর্গান বাজাচ্ছ। আর এই চিন্তা আমাকে বেশ দাম্ভিক করে তোলে। আমি সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারি যে এটা আমার ভুল হচ্ছে, এমনতর ভাবা উচিত হয়নি কিন্তু তবুও এ থেকে নিজেকে মুক্ত করতেও পারি না।

মাগো, তবে আমার বিশ্বাস আছে যে, আমি যদি একলা নির্জনে বাস করতে পারি তাহলে হয়তো আনন্দে থাকতে পারতাম। আমি খুবই খারাপ—জানি না সকল খারাপ জিনিষগুলি আমার মধ্যে থেকে কবে দূর হবে?

মা, তুমি আবার প্রতি করুণা করো। —তোমার সন্তান।

শ্রীমা— ...অনেক গতিবিধির মধ্যেই অহং-এর খেলা রয়েছে বটে—যাকে মনে হতে পারে একেবারেই ছেলেমানুষী, কিন্তু সেটাই সবটুকু নয়। আমি নিশ্চিত জানি যে যখন তুমি বাজনা শোনো তার মধ্যে খুঁজে পাও শুদ্ধ আনন্দ। আবার যখন তুমি আমার কাছে আস তখন তোমার মধ্যে থাকে সহজ এবং অকপট আনন্দ—ঠিক যেমনটি হয় ছোট শিশু তার মায়ের কাছে।

প্রকৃতি সর্বদাই সত্য-মিথ্যা ভাল-মন্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে জটিল হয়ে থাকে। মানুষের নিজের দুর্বলতা বা দোষ কোথায় এটা তার দেখা একান্ত প্রয়োজন কিন্তু কেউ তা দেখে না। সুতরাং সব কিছু হয়ে ওঠে একপেশে। প্রত্যেকেরই জানা উচিত প্রকৃতির মধ্যে কোনটি ভাল বা সত্য। মানুষ যখনই আগ্রহী হয় তখনই এই সত্য ও ভালর দিকটি খুঁজে পেতে থাকে। অবশেষে, প্রকৃতির রূপান্তর হয় পরিপূর্ণরূপে।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

আজ সকালে প্রণামের সময় তোমাকে দেখে আমার মনে হলো তুমি খুবই গম্ভীর রয়েছো।

আমি যা-কিছু চিন্তা-ভাবনা করি সবই তোমাকে লিখে জানাই এই কারণে যে, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি—আমার সকল প্রকার চিন্তা ও অনুভূতি তোমায় লিখে জানাব যাতে কোনো কিছুই তোমার অজ্ঞাত না থাকে। আমি তোমাকে ঠকাতে চাই না, আর নিজেও ঠকতে চাই না। তোমাকে আমার বিষয়ে ভাল কিছুই বলবার নেই বরং আমার মধ্যে রয়েছে মন্দ, কুৎসিৎ, বোকামি ও হীনতায় ভর্তি একটি ভাণ্ডার। এই সবই তোমাকে জানাবার আছে। যদি কিছু ভাল থেকে থাকে সেটা হলো তোমার জন্য যে কাজটুকু করি সেইটুকু (তোমার শাড়ী তৈরীর কাজ)। একেই আমি ভাল বলি।

আজ সমস্ত দিনই আমি বিমর্ষ ছিলাম। একটুও হাসতে পারিনি। এই ধরনের অনেক কিছু আজ তুমি চিঠিতে পাবে। কিন্তু যদি তুমি আজ সকালের মত অমন গম্ভীর থাক, তাহলে এ সব কিছুর এখানে আমি শেষ করে দেবো।

আজ আমি সাত ঘন্টা কাজ করেছি। —ইতি

শ্রীমা—না গো মেয়ে, আমি গম্ভীর ছিলাম না। অন্য দিন যেমন হাসিমুখে থাকি আজও ঠিক তেমনিই ছিলাম। তোমার ওই ছোটট মুখটিতে ছিল বেদনা মাখা, আমার মনে হয়, আমার চোখে তুমি তোমারই দুঃখের ছায়া দেখে থাকবে। আমি বুঝতে পারছি—তোমার জীবনের ওই যে স্বীকারোক্তি আমাকে বরং গম্ভীর করে তুলেছে। তোমার ওই

স্বকারোক্তিগুলি সম্বন্ধে যে রকম মনোভাবই তোমার থাক না কেন, এগুলি কিন্তু সেরূপ খারাপ নয়। এবং যখন তুমি আমাকে তোমার দুঃখকষ্টের কথা জানাও তখনই তুমি দেখতে পাবে সেগুলি তোমার কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে তুমি অনুভব করছ মুক্তি ও আনন্দ।

আমার ছোট্ট মেয়ে, সব সময় তোমার মুখটি হাসিখুশি রাখবে। তাই-ই তোমাকে দেবে শক্তি সামর্থ্য।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

মা, কেন জানিনা আজ দু'তিনদিন ধরে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে রয়েছে।

মাগো, মাঝে মাঝে যখন আমি হতাশ হয়ে পড়ি—আমার মনে হয়, আমি হয়তো যোগ করতে পারবো না। আমি কল্পনা করি—"যদি মা আমাকে বলেন, আমি যোগ করতে পারবো না এবং তিনি যদি আমাকে আদেশ করেন আশ্রম থেকে চলে যেতে, তবে আমার এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে থাকতে পারি বা এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। এখানে আমি একজন অতি সাধারণ চাকরাণীর মত হয়ে থাকতেও রাজি আছি কিন্তু অন্য কোথাও গিয়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

এতসব চিন্তা করে আমি দিনের পর দিন বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়ছি।

মা, আজ আমার মনে হচ্ছে তোমাকে চিঠি লিখবার মত শান্ত মন আমার নেই। আজ আমি ন' মনটা কাজ করেছি। —তোমার দুষ্টু ছোট্ট মেয়েটি

আমার স্নেহের ছোট্ট মেয়ে,

হতাশাকে কেউ যেন প্রশ্রয় না দেয়। কখনোই না। এমন কি হতাশার এতটুকু ইঙ্গিতও পর্যন্ত গ্রহণ করা উচিত নয়। ভাবতে পার—এ কেমন ধরনের বোকামি ও অবাস্তব ধারণা যে আমি তোমাকে বলবো আশ্রম ছেড়ে চলে যাও? এমন কথা তুমি কি করে চিন্তা করতে পারলে? তুমি এখানে নিজের ঘরের মত নিশ্চিন্তে রয়েছো—তুমি কি আমার ছোট মেয়ে নও? তোমার স্থান সব সময়ই আমার কাছে থাকবে—থাকবে আমার আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

শোনো মেয়ে, আমি তোমাকে আজ একটা বিষয়ে বুঝিয়ে বলি, বেশ মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করবে:

তুমি যে কখনও সন্তুষ্ট হতে পার না, তার কারণ হলো, তোমার যা প্রয়োজন তা আমি তোমায় দিই না। কিন্তু এর প্রকৃত কারণ হলো আমি তোমাকে অনেক—অনেক বেশী দিচ্ছি, এত বেশী যা তুমি গ্রহণ করতে অসমর্থ। নিজেকে খুলে ধর। তোমার গ্রহণ ক্ষমতাকে বর্দ্ধিত করো। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করো। তখন দেখবে তোমার সকল অসন্তোষ দূরীভূত হয়েছে।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩২

প্রশ্ন— ...আমার কোনোরকম দৃঢ় সংকল্প নেই...

শ্রীমা— ...তোমার দৃঢ় সংকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু আমার প্রয়োজনের জন্যে।

সতর্ক হও বাছা, হতাশার দরজা খুলে রেখ না। নিরুৎসাহ এবং বিদ্রোহ দূরে ঠেলে দেয়—ঠেলে দেয় প্রকৃত চেতনা থেকে বহু দূরে। অবচেতনের মধ্যে তোমাকে নামিয়ে এনে ফেলে দেয় বাধাবিপত্তির মধ্যে—যেখানে সুখ প্রবেশ করতে পারে না। তোমার অমোঘ শক্তি ছিল তোমার হাসিটুকু; কারণ তুমি জানতে জীবনের চলার পথে কেমন করে হাসতে হয় এবং উদ্দীপনার সঙ্গে কেমন করে কাজ করতে হয় তাও ছিল তোমার জ্ঞাত। এই সব দিকগুলিতেই ছিলে তুলনাতীত। কিন্তু তুমি চাও অন্যকে অনুসরণ করে চলতে। চাও তাদের মত অতৃপ্ততা, অবাধ্যতা ও হতাশার শিক্ষা গ্রহণ করতে। এমন করেই তুমি তোমার হাসিটুকুকে ঢেকে ফেলেছো। এই সমস্তের মধ্যে থাকলে আমার প্রতি তোমার বিশ্বাস ও ভক্তি—যার উপর ভগবৎ-শক্তি কাজ করে চলেছে—তা সবই লুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি অসমর্থ হয়ে পড়বে তা গ্রহণ করতে।

পুনরায় তোমার সব ফিরে পাবার একটি উপায় আছে—তুমি আবার খুশীর মধ্যে ডুবে যাও। পরিপূর্ণরূপে বিশ্বাসী হয়ে ওঠো। পূর্বের মতো আবার বাধ্য শিশুটি হও। তোমার সকল রকম দোষ ত্রুটি বা বাধা বিপত্তির পরিবর্তন করে দিতে পারে তোমার হাসিখুশি ভাবটি।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩২

শ্রীমা—এমন বিমর্ষ হয়ে পড়ছো কেন? প্রত্যেকেরই এমন অসুবিধে রয়েছে। তোমার অসুবিধেগুলো অন্যের তুলনায় এমন কিছু অনতিক্রম্য নয়। উৎফুল্ল এবং বিশ্বাসী থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

ছোটদের গল্প

[অপ্রকাশিত রচনা]

শ্রীমা

জ্ঞানবিজয়

মহাঋষি ভৃগু আপন ঐশ্বর্যে জ্যোতিষ্মান, তিনি গিরি কৈলাসের চূড়ায় আসীন আর ভরদ্বাজ তাঁকে প্রশ্ন করছিলেন :

পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন ?

আকাশ কত বিশাল ?

কে তৈরি করল জল আগুন বাতাস মাটি ?

জীবন কী ?

ভালো কী ?

পৃথিবীর ওপারে কী আছে ?

আর এরকম আরো নানা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলি বিরাট এবং যে ঋষি সবের উত্তর দেবেন তিনিও নিশ্চয় বিরাট।

কিন্তু ভরদ্বাজের মন মানুষের মন, যা প্রশ্ন করে, নিরন্তর ও আরো জানতে চায়, যার জানতে চাওয়ার শেষ নেই।

প্রশ্ন করতে শিশুর তুলনা নেই। সর্বদা তার জিজ্ঞাসা কী এটা ? কী ওটা ? কী করে এটা হল ? কী এ জিনিসটাকে নড়ায় ? বিদ্যুৎ কে আলে ? জোনাকি-পোকা কেন ? কোথা থেকে আসে সোনা আর কয়লা ? আর লোহা ? কী ক'রে বই ছাপা হয় ? এরকম আরো অনেক প্রশ্ন।

শিশু এবং বড়রা জিজ্ঞাসা করে। তারা উত্তরও দেয়। আমরা যখন কিছু জিনিস জানি তখন উত্তর দিতে পারি। আমরা অপরকে শেখাতে, জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে পারি।

কী শিখব আমরা ? কী শেখাব ? যুগ যুগ বেয়ে যা এসেছে তা-ই শিখতে চেষ্টা করব ? মানুষের জিহ্বা যত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে সে সব শিখতে সচেষ্ট হব আমরা ?

মহাভারত কাব্যে পাণ্ডব ও অন্যান্য যোদ্ধাদের দ্বারা নিক্ষিপ্ত তীরের নানা রকমারি বোঝাতে নিম্নলিখিত নামগুলি ব্যবহৃত হয়েছে : শর, বাণ, ইষু, শায়ক, পত্রী, কাণ্ড, বিসিপ্প(?) নারাচ, বিজাত, পৃষত, ভল্ল, তোমর, শল্য, ইষীকা, শিলীমুখ, অঞ্জলিকা। তীরের এই সব নাম শেখার অবশ্য আমাদের প্রয়োজন নেই। কত জিনিসের আরো কত নাম আছে যা শেখবার দরকার নেই।

আমরা নানারকম খবরের কথা বলি : চিন্তায় আসে জাহাজডুবি, খুনখারাপি, চুরি, বিবাদ, মামলা, যুদ্ধ, অগ্নিকাণ্ড, বাদ্যিবাজনা, বিয়ে, কবর, এবং হাজার রকম জিনিস কয়েক মিনিটে পড়া এবং পরমুহূর্তে ভুলে যাওয়া যেতে পারে।

*

আমরা কোরাণ খুলি এবং এই পবিত্র গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায়ের শিরোনামায় পড়ি এই শব্দ "সমাচার" আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ভাবি জাহাজডুবি খুনখারাপি...কিন্তু দাঁড়াও।

পয়গম্বর মহম্মদ হাল্কা মনের মানুষ ছিলেন না যে কুকীর্তির সংবাদে মজা পাবেন কিম্বা এমন বাচালও নন যে মহৎ কিছুই শেখান না। 'সমাচার' অধ্যায়ের আরম্ভটা পড়া যাক :

কোমল হৃদয় দয়ালু আল্লার নামে।
তারা সব মিলে কী আলোচনা করে?
মহৎ সংবাদ।
এই বিষয়ে বিতর্ক করে তারা?
না, তবে তারা জানতে চায়।
অবশ্য জানবে তারা।
"মাটিকে আমরা খাটের মত করিনি?
পাহাড়দের তাঁবুর খোঁটার মতো?
তোমরা কি সৃষ্ট হও নি জোড়ায় জোড়ায়?
তোমাদের ঘুম পাড়াইনি যাতে বিশ্রাম পাও?
রাত্রি করিনি ঢেকে রাখার মতো?
দিন রুটি-রোজগারের জন্য?
তোমাদের মাথার ওপরে বানাই নি সপ্ত আকাশ?
আর রাখিনি সেখানে একটি দীপ যে জ্বলে?
ঘনীভূত মেঘ থেকে বারি বর্ষণের ব্যবস্থা করি নি,
যাতে তৃণ শস্য সর্বত্র গজিয়ে গজিয়ে ওঠে
আর যত বাগান গাছে গাছে ছেয়ে যায়?"

এমনি করে পয়গম্বর মানুষের হৃদয়ে ও মনে আশার আলো ফেলে দিয়েছিলেন মহৎ জিনিস ভাবতে শিখিয়ে, এমন সব জিনিস যার সৌন্দর্য স্থায়ী, এমন জিনিস যা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় জীবনের জগৎ কত মহিমাময়।

তাহলে স্বীকার করব এমন কথা এমন জিনিস এবং এমন সংবাদ আছে যা শোনার বা পুনরাবৃত্তির যোগ্য নয়। অন্যদিকে আবার এমন জিনিস যা শ্রবণ ও পুনরুচ্চারণের উপযুক্ত, যদিও তাদের আবিষ্কারের জন্য অনেক কষ্ট অনেক সময় ও শ্রমের মাশুল দিতে হয়।

*

মানুষের শক্তি তার চিন্তায়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, এত কুশল দুই হাত, তার সেই চিন্তার দাস যে সিদ্ধান্ত করে ও চালায়।

যেদিন থেকে মানুষ পৃথিবীর উপর বসবাস নির্বাচন করেছে সেদিন থেকে প্রকৃতির ওপরও কত না তার মহৎ বিজয়।

তার শক্তির এক পরিচয় দেখি রামের সমুদ্র পার হওয়ার চিত্রে।

যখন তিনি ভারতবর্ষের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছালেন এবং জানলেন যে তাঁর প্রিয়

পত্নী সীতা লঙ্কাদ্বীপে বন্দী তখন জলধি অতিক্রমের উদ্যোগ শুরু করলেন। তাঁর সেনা-বাহিনী অসংখ্য, তবে তা তৈরি বাঁদর আর ভালুক দিয়ে। সেই বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ কী করে তিনি পার হবেন।

রামের বুদ্ধি গভীর, তাঁর জ্ঞান মর্মভেদী, তাঁর হৃদয় বীরত্বে পূর্ণ।

প্রথমে তিনি বুড়ো সমুদ্রকে মৃদুগলায় ডাকলেন এবং বললেন

—"মহাসমুদ্র, তোমায় মিনতি করি, আমার সেনাদলকে যেতে দাও।" কিন্তু সেই থেকে তিন দিন অপেক্ষা করার পরও সেই তরঙ্গমালার উত্তর পেলেন না।

রাম তখন তাঁর ভাইকে ডাকলেন :

—"লক্ষণ। আমার তীর ধনুক নিয়ে এস। এই সাগরের সঙ্গে বৃথাই কথা বলেছি, ঠিক যেমন একজন লোক বালিতে সুন্দর বীজ পুঁতে সেসব হারায়।"

বীর দেবতা রাম সেই গভীর জলে তীর নিক্ষেপ করলেন, সমুদ্রে তার যাত্রাপথে জাগল এক অনন্ত বেদনা, মাছেরা দারুণ ভয় পেয়ে গেল। তখন সমুদ্র-দেবতা এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সোনার থালায় মণিমুক্তার অর্ঘ্য ভ'রে প্রণত হলেন দেবচূড়ামণির সামনে।

সমুদ্র রামের কমলোপম চরণ আলিঙ্গন করে বলল

—"দেবোত্তম, আমার পাপ মার্জনা করুন। আমি আমার আত্মীয় বায়ু পৃথিবী অগ্নির মতোই। তারা ভারী নশ্বর এবং ক্ষমতায় এত অত্যন্ত যে আপনার মতো দেবতার ডাকে সাড়া দেয় না। আপনার আগে আর কোনো বীর আমাকে তার ইচ্ছার অনুগত করাতে পারে নি। আপনার ভিতরে আমি দেখছি আমার প্রভুকে। আপনার যা ভালো মনে হয় করুন।"

দেবোত্তম রাম হাসলেন :

—"বলো আমাকে," বললেন তিনি, "কী করে আমার সেনাবাহিনী তোমার উর্মি-মালা ও ঝঞ্ঝার রাজ্যের উপর দিয়ে পার হবে।"

—"আমার জলে আমার উদর বহন করবে পাথরের রাশি" সমুদ্র বলল, "সেগুলি আপনার সেনাদল ছুঁড়ে ফেলতে পারে যাতে ওরকমে ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যে একটা সেতু গড়ে ওঠে।"

রাম তাঁর সেনাদলের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন :

—"সেতু তৈরি হয়ে যাক," বললেন তিনি।

—"জয় হোক রামচন্দ্রের," সেনাবাহিনী সমস্বরে ধ্বনি করে উঠল।

তারা উপড়ে ফেলল গাছ পাথর, পাড়ির মাথায় বড় বড় চাঙড়া পর্যন্ত ; নিয়ে এল সেসব দুই সুদক্ষ স্থপতির—নল ও নীলার—কাছে ; নল ও নীলা কাঠ-পাথর এমনভাবে জড়িয়ে বাঁধল যে অটুট হয়ে তারা সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল। রামের সেনাবাহিনী তার ওপর দিয়ে পার হয়ে গেল।

রাম ভারতবর্ষের এক পাহাড়ের চূড়ায় বসে দেখছিলেন তাঁর অগণিত সেনাদল সেতুর ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

রাম যে-রকম সমুদ্রের অন্তরকে বাধ্য করেছিলেন তেমনি মানুষের চিন্তা—যা মানুষের গৌরব—সাগর জয় করেছে। এবং সমুদ্রের সঙ্গে আরো অনেক কিছু। মানুষ

বায়ুকে অধীনে রাখে যাতে সে নৌকার পাল ফাঁপিয়ে তোলে, আর মিলের পাখা ঘোরায়। সে জয় করেছে বরফ ও তুষার, কারণ অভিযাত্রীরা গিয়েছে উত্তর মেরু এবং দক্ষিণ মেরুর বরফাচ্ছন্ন দেশে, পার হয়েছে উচ্চতম পাহাড়। সে জয় করেছে পশুদের, যেহেতু পৃথিবীর সর্বত্র যে-সব জন্তুজানোয়ার তার নিজের পরিবারস্থ অন্যদের পক্ষে বিপজ্জনক তাদের মেরেছে—সিংহ, বাঘ, নেকড়ে, সাপ, এমন কি হাঙ্গর পর্যন্ত যাতে বিশাল সমুদ্রে তার ক্ষমতা হয় ন্যূনতম, পৃথিবীর উপরও তার দাপট রেখেছে বোধগম্য; আর যেমন সে অনিষ্টকর পশুদের বিনাশ করেছে তেমনি তার কাছে উপকারীদের আবার রক্ষণ পালন করেছে—ষাঁড়, ঘোড়া, ভেড়া, হাতি ইত্যাদি।

কিন্তু এসবই বাহুবলের দ্বারা, যন্ত্রপাতি এবং অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা জয়লাভ, আর বাহু যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র হল চিন্তার দাস।

মানুষ জয় লাভ করে জ্ঞানের দ্বারা। আবার জ্ঞানকেও সে জয় করে সে প্রশ্ন তোলে, আরো আরো জিজ্ঞাসা করে, থামতে চায়না যতক্ষণ না সে সত্যিকারের জেনেছে।

ইতিহাসে বর্ণিত কিছু লোককে বলা হয় দিগ্বিজয়ী: যেমন আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, যিনি পশ্চিম এশিয়া ও মিশর জয় করেছিলেন; জুলিয়াস সিজার, যিনি ফরাসীদেশ ও ইংলণ্ড জয় করেছিলেন; সম্রাট বাবর যিনি উত্তরভারত করতলগত করেছিলেন নেপোলিয়ন, যিনি কিছু কালের জন্য য়ুরোপের অধীশ্বর হয়েছিলেন।

কিন্তু বিজয়ী হবার অন্য পথও আছে।

তুমিও বিজয়ী হতে পার। পৃথিবীতে এমন জিনিস আছে যা জানা ও শেখা দরকার। জিজ্ঞাসা করো, খোঁজো, শেখো, বিজয় লাভ করো। তখন নিজেকে বলতে পারবে: দিগ্বিজয়ী।

দাতা

রন্তীদেব ছিলেন রাজা, হলেন বনের মধ্যে সন্ন্যাসী। তিনি নিজের ধনরত্ন গরীবদের বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং অরণ্যের নির্জনতায় যাপন করেছিলেন সরল জীবন। তাঁদের শুধু সেইটুকুই ছিল যা দিয়ে পরিবার সহ নিজের জীবনের প্রয়োজনীয়টুকু মিটে যায়।

একদিন আটচল্লিশ ঘন্টা উপবাসের পর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য সামান্য পরমান্নের ব্যবস্থা করেছিল।

এক গরীব ব্রাহ্মণ তখন তাঁর কুটিরের দুয়ারে এসে অন্ন প্রার্থনা করল। রন্তীদেব তাঁর পরমান্নের অর্ধেক ভাগ তাঁকে দিলেন। তারপর অনেক শূদ্র এসে সাহায্য চাইল, অবশিষ্টের অর্ধেক রন্তীদেব তাকে দিলেন।

এমন সময় শোনা গেল একটি কুকুরের চিৎকার; বেচারা পশু মনে হল ক্ষুধার্ত। রন্তীদেব বাকিটা তাকে দিয়ে দিলেন। শেষে সন্ন্যাসীর দরজায় এসে ভিক্ষা চেয়ে দাঁড়াল এক পারিয়া অচ্ছুৎ। রন্তীদেব তাকে একটু দুধ আর চিনি দিয়ে আবার উপবাসে থাকলেন।

তারপর চারজন দেবতা এসে তাঁকে বললেন:

—"তুমি যে অন্ন দিয়েছ তা আমাদেরকেই ; আমরাই সেই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কুকুর ও গরীব অচ্ছুৎ-এর রূপ ধরেছিলাম। সকলের প্রতিই তুমি সদয় হয়েছিলে, প্রেমার্দ্র চিন্তার জন্য আমরা তোমার গুণগান করছি।"

এই রকমে সদয় হৃদয় যাঁর তিনি সকল লোক এবং পশুকে পর্যন্ত একটি পরিবারের, এক অখণ্ড মানবজাতির একজন বলে বিবেচনা করেন।

*

রোজ কি এমন লোকেদের সঙ্গে দেখা হয় না যারা আমাদের চেয়ে কম জানে? উপকারী হতে পারে এমন জিনিস—যেমন আহার্য, বস্ত্র, ব্যায়াম, কাজকর্ম, আমোদ-প্রমোদ বিষয় নিয়ে তাদের কাছে বলা আমাদের সাধ্যের মধ্যে?

ক্ষুধার্তকে অন্ন দেওয়া আমাদের কর্তব্যের অঙ্গ, তেমনি আমাদের জ্ঞানের ভাগ দেওয়াও কর্তব্যের অঙ্গ।

অজ্ঞ লোক নিজের অনিষ্ট করে : সে তার প্রতিবেশীর অনিষ্ট করে, যেমন অপটু বাঁশীবাদক এক ব্রাহ্মণকে যন্ত্রণা দিয়েছিল। শোন নি কী করে তা ঘটেছিল?

একদা এক ব্রাহ্মণ যখন গ্রামাঞ্চলের পথে চলছিল তখন একটি ফুলের ভিতর থেকে নিঃসৃত গলা শুনে অবাক হল। বার কয়েক সেই গলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, আদেশ দিল পুকুরে গা না ধুতে, সন্ধ্যা-আহ্নিক না করতে, না খেতে, তাকে ফেলে দূরে না যেতে।

তখন সে চেঁচিয়ে উঠল :

—"কে তুমি, যা আমার কাছে একটুও ক্ষতিকর না তা করতে বারণ করছ?' (যাতে মন্দ কিছু নেই) লাইলাক ফুলের ভিতর থেকে কণ্ঠ উত্তর দিল :

—"আমি একজন ব্রহ্মরাক্ষস। পূর্বজন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণ এবং সঙ্গীতশাস্ত্রে এক মহা-পণ্ডিত, কিন্তু অপরকে সেই জ্ঞানের ভাগ দেবার ইচ্ছা আদৌ ছিল না। আমার জ্ঞান আমার জন্যই রেখেছিলাম। এখন শাপগ্রস্ত ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে আছি এবং রোজ আমাকে একজন লোকের বাঁশী শুনতে হয় ; আর বলতে পারি না কত বীভৎস তার বাজনা। মারাত্মক ব্যাপার। কতবার চেয়েছি গাছ ছেড়ে যেতে, বাজনাটা কেড়ে নিয়ে ওর সদ্ব্যবহার দেখাতে, তার আঙুলগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দিতে, কি করে নিঃশ্বাস নিতে হয় বোঝাতে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয় ; আমাকেও তাই বাধ্য হয়ে শুনতে হয় তার বেসুর..."

গল্পের বাকিটা তোমাদের এখানে বলতে পারছি না শুধু বলে রাখি সুখের বিষয় যে তার যন্ত্রণামুক্তির একটা উপায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ কু-কর্ম, কু-শিল্প কিম্বা আশেপাশের লোকেদের কু-সংগীত আমাদের কেমন পীড়া দেয়।

*

যে ক্ষুধার্ত, কোন একটিমাত্র জিনিস তাকে তৃপ্ত করবে? খাদ্য। যে তৃষ্ণার্ত, কোন জিনিস তাকে তৃপ্ত করবে? জল। কেউ যদি অজ্ঞ, কোন একটিমাত্র জিনিস তাকে সাহায্য করবে? জ্ঞান।

ক্ষুধার্তকে অন্ন, তৃষ্ণার্তকে জল, অজ্ঞকে জ্ঞান দেওয়া ভালো।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র, মহান পঞ্চ পাণ্ডব, এক প্রাসাদে ছিলেন যা বাইরে থেকে দেখতে সুন্দর ও আরামদায়ক। কিন্তু ওটি শত্রুর তৈরী : পুরোচনার নির্দেশে তার মেঝে, দেয়াল, ছাদ এমন জিনিসে গড়া যে একটুতেই আগুন লেগে যায় ; আর তার মতলব ছিল রাত্তিরে যখন পাণ্ডবরা ঘুমন্ত তখন তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া ; যে পাঁচজন রাজপুত্রকে সে হিংসা করত তাদের সরিয়ে দেবার এই পন্থা।

এমন ছিল তার ছলনা। এই দুষ্ট উদ্দেশ্যে সে লাগিয়েছিল স্থাপত্যে তার চতুরতা এবং ষড়যন্ত্রে তার সূক্ষ্মতাকে।

একদিন এই প্রাসাদে এল জনৈক খনিবিশারদ। সে চুপিচুপি রাজপুত্রদের বলল :

—"তোমাদের এক বন্ধু আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, তোমাদের সেবা করতে। আমি খনির কর্মী। বলো, কোন রকমে তোমাদের উপকারে আসতে পারি। নিশ্চিত সূত্রে জানি যে তোমাদের শত্রু, পুরোচনা স্বয়ং, এই গৃহে তোমাদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করবে।"

তখন জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব খনির কর্মীটিকে বললেন

—তোমার খনিকাটার দক্ষতা লাগিয়ে, প্রিয় সজ্জন, আমাদের জন্য সুরঙ্গ একটা কেটে দাও যাতে দুয়ারে প্রহরা থাকলেও আমরা পালাতে পারি ; কারণ তোমার খনিতে খনন এবং তোমার বুদ্ধির দ্বারা ব্যবহার্য করে তোলা এই গোপন পথের সাহায্যে আমরা প্রাণ বাঁচাতে পারব।"

ভূগর্ভে, প্রাসাদের একেবারে মাঝখানে খনিকার খুঁড়তে শুরু করল। পাণ্ডবরা তক্তা নিয়ে তৈরী ছিল গর্ত ঢেকে ফেলতে এবং তক্তাগুলির ওপর গালিচা টেনে দিতে—যদি পুরোচন এসেই পড়ে। এরকমে ব্যবস্থা হয়েছিল শঠে শাঠ্যং।

শেষে পাঁচজন রাজকুমারের কাছে খবর গেল যে সুড়ঙ্গ তৈরী। তা গিয়ে উঠেছিল বনে মধ্যে এক অতি সুন্দর জায়গায়।

এক রাত্তিরে রাজপুত্ররা ওই প্রাসাদে আগুন লাগিয়ে দিলেন, এবং ওই পাতালপথের দৌলতে তাঁদের মা কুন্তী সহ আপন জীবন রক্ষা করলেন। রাস্তা অন্ধকার ছিল কিন্তু নির্ভুল। মহাবীর ভীম যখন দেখলেন সঙ্গীরা যথেষ্ট তাড়াতাড়ি পালাতে পারছে না তখন তিনি মাকে তুলে নিলেন কাঁধে, দু ভাইকে কাঁকে, আর অন্য দু ভাইকে দুই বাহুতে, এরকম বোঝা নিয়ে দুনিবার ঝড়ের মতো ছুটলেন তিনি, এলেন প্রাণান্তক আগুন থেকে দূরে।

পুরোচনার চক্রান্ত ভণ্ডুল হয়েছিল একজন সহৃদয় খনি-কর্মীর পটুতায়। খনির লোকটি শুধু নিজের জন্য গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় মাটি খুঁড়তে প্রয়াসী হয়নি ; সে কোদাল চালিয়েছিল পরের জন্য। নিজের জ্ঞান দিয়ে সে অপরদের সাহায্য করেছিল, তার বিজ্ঞান সে বিতরণ করে দিয়েছিল।

*

পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠতম দেশও সব জেনে ফেলতে পারেনি। আমাদের পরস্পরকে শেখাতে হবে, মানুষ থেকে মানুষকে, দেশ থেকে দেশকে, বিশ্বের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে, আর প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক মানুষ নিজে যা জানি তা শেখাতে সুখী বোধ করা উচিত।

প্রাচ্যের কাছে প্রতীচ্যের লোকেরা এনেছে তাদের বৈজ্ঞানিক, যান্ত্রিক, আর্থিক ইত্যাদি প্রজ্ঞা।...

প্রতীচ্যকে দিয়েছে প্রাচ্য বরাবর তার দার্শনিক ও নৈতিক জ্ঞান।

ভারতবর্ষ অপর সব দেশকে দিয়েছে সেই জ্ঞান যা নিহিত বেদে, বুদ্ধের সত্যপথের নির্দেশ-বাণীতে, আর অন্য সকল পবিত্র গ্রন্থে।

একটি শিশুও জ্ঞান দিতে পারে। একটি শিশু অপরকে বর্ণপরিচয় করাতে পারে। একটি শিশু অন্যকে সহজ হিসাব শেখাতে পারে, কিম্বা চেনাতে পারে উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব পশ্চিম, আর না হয় একটা গিঁট বাঁধা, একটি বীজ পুঁততে শেখাতে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা সবাই দাতা হতে পারি। একটি শাস্ত্রে বলেছে: "পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার মধ্যে অনেক বেশি আশীর্বাদ।"

নম্রতা

এই জাপানী বাড়িতে ঢুকতেই দোরগোড়ায় কী চোখে পড়ে?

ফুলের শিল্পী যে মানুষটি ফুল সাজাতে নিপুণ।

গৃহকর্তা থালা হাতে করে নিয়ে আসেন যার ওপর ফুল, কাঁচি, ছুরি, ছোট্ট একটি করাত আর সুন্দর একটি ফুলদানি।

"মহাশয়", তিনি বলেন, "এমন সুন্দর ফুলদানির যোগ্য সুন্দর তোড়া আমি সাজাতে পারিনা।"

—"আমি জানি আপনি নিশ্চয় পারবেন," গৃহস্বামী ঘর থেকে বের হয়ে যেতে যেতে বিনয়ভরে বলবেন।

নিজে একলা বসে শিল্পী কাজ শুরু করেন—কেটে, ছেঁটে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, বেঁধে, যতক্ষণ না নয়নরঞ্জন একটি সুন্দর তোড়া ফুলদানিতে রাখা হয়।

গৃহস্বামী এবং তাঁর বন্ধুরা ঘরে ঢুকলেন; শিল্পী সরে দাঁড়ালেন ও মৃদুস্বরে বললেন: আমার তোড়া অতি সামান্য, দয়া করে তা-ই গ্রহণ করুন।

"না", গৃহস্বামী উত্তর দেন, 'এ তো খাসা।"

টেবিলের পাশে তোড়ার কাছে শিল্পী রেখেছেন কাঁচি। তিনি যেন বলতে চান তোড়ায় আছে কোনো ত্রুটি, কেউ তুলে নিতে পারেন কাঁচি এবং যা দৃষ্টিকটুকর তা কেঁটে-ছেঁটে দিতে পারেন।

শিল্পী কাজ করেছেন সুন্দর কিন্তু তার কদর নিজে করতে বসেন নি। দোষত্রুটি থাকতে পারে স্বীকার করলেন তিনি। তিনি নম্র।

হতে পারে জাপানী শিল্পী সত্যিই ভাবেন তাঁর কাজের প্রশংসা পাওয়া উচিত। তাঁর মনের কথা বলতে পারব না। তবে আর যাই হোক তিনি তো হামবড়াই করেন না, আর তাঁর ব্যবহারও নয়।

*

অন্য দিকে, যারা আন্তরী তাদের দেখে হাসব।

এমনি হলেন দামাস্কের খলিফা—সুলেমান। এক বৃহস্পতিবার গরমস্নান থেকে উঠে তিনি পরলেন সবুজ পোষাক, মাথায় বাঁধলেন সবুজ পাগড়ি, বসলেন সবুজ এক সোফায়, চারদিকের পরদাও সব ছিল সবুজ। তারপর আয়নায় মুখ দেখে নিজে সন্তুষ্ট বোধ করে বললেন "নবী মহম্মদ ছিলেন পয়গম্বর; আবু বকর সত্যের বিশ্বস্ত সেবক; ওমর সত্য ও মিথ্যার তফাৎ জানতেন; ওৎমান ছিলেন বিনয়ী, আলি সাহসী, মুয়াইগা দয়ালু, ইয়াজিদ ধৈর্যশীল, আবদুল মালিক একজন সুশাসক, ওয়ালিদ দুর্দান্ত মনিব, কিন্তু আমি হলাম তরুণ ও সুদর্শন।"

ফুলগুলি পাত্রে খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে, তাতে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য বাহাদুরি দেবার দায় আমাদের, শিল্পীর নয়।

সুলেমান সুদর্শন, তিনি যে তা জানেন তাতেও কোনো দোষ নেই। কিন্তু আমাদের হাসি পায় যখন দেখি আয়নায় তিনি স্বরূপে মশগুল এবং বলেন তাঁর স্বরূপ সত্যবান ওমর কিম্বা ধৈর্যশীল ইয়াজিদের চেয়েও তাঁকে বেশি সুন্দর করেছে।

*

আরো অলীক হল সেই মানুষটির অহংকার যিনি ভাবেন তাঁর মহিমার তুলনায় পৃথিবী নিতান্ত ছোট, যাঁর উচিত আরো উঁচু আকাশে উড়ে যাওয়া।

গল্পটা এই রকম।

পারস্যরাজ কাই খাঁ অনেক যুদ্ধ করেছেন এবং অনেক যুদ্ধে জিতেছেন। শত্রুর ধনরত্ন কবলিত করে তিনি এত ধনী হলেন যে আলবের্জ পাহাড়ে দুটি প্রাসাদ গড়লেন; ঘরে ঘরে সোনা রুপোর এত প্রাচুর্য যে সেই মসৃণ ধাতুর চকমকিতে দিনের আলোই ফুটে উঠত।

কাই খাঁ সুবিনীত অহংকারে টইটম্বুর, নিজেকে ভাবতে লাগলেন পৃথিবীর সেরা রাজা।

দুষ্টবুদ্ধি ইবলিস দেখল রাজার নিজের সম্বন্ধে তুঙ্গ ধারণা আর মনে মনে মতলব আঁটল তাঁকে ঠকাতে। সে প্রাসাদে চাকরের ছদ্মবেশে এক দৈত্য পাঠাল, যে রাজাকে দেবার জন্য হাতে নিয়ে চলেছে একটি ফুলের তোড়া।

চাকরটি কাই খাঁর সামনে আভূমি নত হয়ে বলল:

—"খোদাবন্দ, পৃথিবীতে আপনার তুল্য রাজা আর নেই। কিন্তু একটি রাজ্য জয় করা আপনার এখনো বাকি আছে, উচ্চতর জগৎ, সৌর রাজ্য, চান্দ্র দেশ, নক্ষত্রলোক, এবং আকাশের সব গোপন প্রান্ত। হে বাদশা, পাখিদের অনুসরণ করুন, উড়ে যান আকাশে।"

—"কিন্তু পাখা ছাড়া উড়ব কী করে?" জিজ্ঞাসা করলেন রাজা।

—"আপনার পণ্ডিতরা তা বলে দেবেন, শাহান শাহ্।"

তখন রাজা কাই খাঁ জ্যোতিষীদের জিজ্ঞাসা করলেন কী করে তিনি উড়ে যেতে

পারবেন নভলোকে, এবং তাঁরাও আবিষ্কার করলেন এক অভিনব পন্থা। তাঁরা বললেন সাধারণ উপায়ের কথা কিন্তু রাজার তা পছন্দ হল না।

বাসা থেকে ধরে আনলেন চারটি ঈগলপাখির ছানা, তাদের খাইয়ে দাইয়ে তালিম দিয়ে শক্তসবল বড় করে তুললেন।

বানালেন কাঠের একটি সমচতুর্বাহু পাটাতন, তার প্রত্যেক কোণে আঁটা দাঁড়ে একখণ্ড ছাগমাংস। প্রত্যেক কোণে আবার বাঁধা থাকল একটি ঈগল।

রাজার সিংহাসন সেই পাটাতনের উপর বসান হল ; সিংহাসনের পাশে থাকল একপাত্র মদিরা। রাজা বসলেন।

চারটি ঈগল মাংসখণ্ড ধরতে গেল এবং সেজন্য সোজা উপরে ওড়াতে তুলে নিয়ে চলল সেই সঙ্গে পাটাতনটিও জনতার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে। ঈগলরা উপরে উঠতে লাগল, আরো উঠতে লাগল, ক্রমে চাঁদের কাছে পর্যন্ত, যতক্ষণ না ওড়ার ক্লান্তিতে থেমে গেল বাতাসের গায়ে তাদের ডানার আঘাত। তারপর সেই পাটাতন, সিংহাসন, রাজা, সুরার পাত্র, যাবতীয় কিছু এক দারুণ শব্দে পড়ল চীনদেশের এক নিরালায়। রাজা থাকলেন চিৎপাৎ, নিঃসঙ্গ, মুমূর্ষু, ক্ষুধার্ত, বেচারা ; যতক্ষণ না এল অনুচরেরা এবং তাঁকে নিয়ে গেল প্রাসাদে।

রাজা তখন বুঝলেন কত মূঢ় এবং অহংকারী হয়েছিলেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করলেন নিজের সাধ্যের ওপরে উড়তে আর কখনো চেষ্টা করবেন না। রাজ্যের কাজকর্মে মন দিলেন এবং এত ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য শাসন করলেন যে সকলে ধন্য ধন্য করল।

এই রকমে আত্মম্ভরিতার উঁচু আকাশ থেকে তিনি নেমেছিলেন সুন্দর সুদৃঢ় মাটির নম্রতায়।

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

শ্রীঅরবিন্দ-স্মরণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, Benaras Road,
H O W R A H.
Phone : 66-2434

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু অভ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দ

জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে

(১৫ই আগস্ট ১৯৭২)

সম্পূর্ণ রচনাবলী

বিষয়বিন্যাস : ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ

মূল্যনির্ধারণ : সাধারণ সংস্করণ—১৩০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

ডুয়িং সংস্করণ—১৫০৲ টাকা
(ডাকমাশুলসহ)

ভাষান্তর : শ্রীঅরবিন্দের মূল বাংলায় রচিত
(গীতার ভূমিকা, বেদ ও
ভারতীয় সংস্কৃতি, কারাকাহিনী,
পত্রাবলী, বিবিধ রচনাদি)
পূর্ণাঙ্গ খণ্ড-সহ অন্যান্য রচনাবলী
নয় খণ্ডে অনুবাদ : ১৬০ টাকা

পাক্ষলিক ভাষা :
[illegible] গুজরাটী, মারাঠি, ওড়িয়াতেও অনুবাদ

বুক সেলস্ ডিপার্টমেন্ট, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

12 JUN 1976

প্রাপ্ত পত্রিকা অভিমত

বর্তিকা

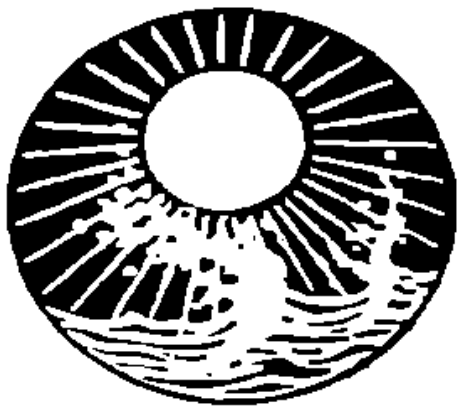

CALCUTTA UNIVERSITY

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মায়ের মন্ত্রমালা		৫
সাবিত্রী	...	৭
বেদমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১১
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা	১৫
ছোট হাসিকে লেখা শ্রীমা'র পত্র	রীণা মিত্র	২৩

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

There is a
Supreme Divine Consciousness.
We want to manifest this
Divine Consciousness in the
physical life.

Blessings

পরম ভাগবত চেতনা এক রয়েছে।
আমরা এই ভাগবত চেতনাকে পার্থিব
জীবনে অভিব্যক্ত করতে চাই।

আশীর্বাদ।

—শ্রীমা

মায়ের মন্ত্রমালা

জীবন হল রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে পথ বেয়ে চলা—আমাদের জেগে থাকতে হবে অন্তরে আলো জ্বালিয়ে নিয়ে।

ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর একমাত্র উপায় হল সর্বদা সরল হাসিমুখে থাকা।

নিশ্চিত জেনো আমি সর্বদাই রয়েছি তোমাদের মধ্যে, তোমাদের পথ দেখাই, সাহায্য করি তোমাদের কাজে তোমাদের সাধনায়।

চল আমরা নিয়ত এগিয়ে যাই, কখনও থেমে না গিয়ে, নিয়ত একটা পূর্ণতর প্রকাশের দিকে নিয়ত একটা পূর্ণতর উচ্চতর চেতনার দিকে।

অধ্যবসায়ের সঙ্গে একটা সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই সকল সুকর্ম সুসম্পন্ন হয়।

যা তুমি সবচেয়ে ভাল বলে জান তাই করবে সব সময় যদিই-বা ঠিক তাই হয় আবার সবচেয়ে কঠিন কাজ।

আত্মজয় অপেক্ষা বৃহত্তর জয় কিছু নাই। কি সুন্দর, কি মহান্, কি সহজ, কি প্রশান্ত হয়ে ওঠে সব জিনিষ যখন আমাদের মন ভগবানের দিকে ফিরে দাঁড়ায় আর তাঁর কাছে আমরা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করি।

এস আমরা সদাসর্বদা ঠিক ঠিক কাজটি করে চলি, তাহলে আমরা সর্বদাই শান্ত হয়ে সুখী হয়ে থাকতে পারব।

ভগবান জাগ্রত রয়েছেন প্রত্যেকের হৃদয়-অন্তরে, এই হল প্রমাণ যে ভবিষ্যতের এবং সকল সম্ভাব্যের পূর্ণসিদ্ধি অধিগত হবেই।

প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে আমাদের সঙ্কল্প হবে ঠিক কাজটি ঠিকপথে সর্বদাই করে চলা।

কেবল ভগবানের মধ্যে পাওয়া যায় পূর্ণ শান্তি আর অখণ্ড তৃপ্তি।

কি তুমি হয়েছ তা ভাববে না, ভাববে শুধু তুমি কি হতে চাও—তা হলে নিশ্চয় উন্নতির পথে এগিয়ে চলবে।

পিছনে তাকাবে না, সর্বদা তাকাবে সম্মুখে, কি তুমি করতে চাও তার দিকে, তা হলে নিশ্চয় তুমি পথে এগিয়ে চলবে।

আজ যা করা যায় না, তা নিশ্চয়ই করা যাবে পরে : ক্রমোন্নতির জন্য কৃত কোন প্রয়াসই কখনও বৃথায় যায় না।

ভগবান আমাদের যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর যে কাজ তিনি চেয়েছেন, তাই করে যেতে হবে সব দুর্বলতা, মিথ্যা দুরাকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে মুক্ত করে।

প্রতিদ্বন্দ্ব আর বিরোধের পরিবর্তে স্থান করে দিতে হবে সহযোগ আর ভ্রাতৃত্বের জন্য।

মন আমাদের থাকবে নীরব, শান্ত আর হৃদয় আমাদের থাকবে অনন্ত অভীপ্সায় পরিপূর্ণ।

হৃদয়ের মধ্যে আসীন চিরন্তন, এই অনুভবে যে আনন্দ তার সঙ্গে আর কোন আনন্দেরই তুলনা হয় না।

———

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

১২শ পর্ব—উত্তর সর্গ
পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

(১)

অতল সমাধি হতে জাগে চিত্ত তার।
মাতা পৃথিবীর শান্ত নিশ্চেতন বক্ষে শায়িত সে,
দেখে উর্ধ্বে সবুজে আবৃত আনত যে শাখাবলী
ধরে রয় সৃষ্টি তার তাদের মন্ত্রপূত প্রাণশক্তি সহায়ে,
মাথার উপরে উল্লাসের নীলপক্ষ
শাখায় শাখায় তরঙ্গিত হয়ে চলে উচ্চারি অন্তরের কণ্ঠধ্বনি।
মহারণ্যের নিভৃত রহস্য-অন্তরে,
দৃষ্টি হানে পত্রাবলী অবকাশে নীল গবাক্ষজাল ভেদ ক'রে
ক্ষীয়মাণ দিন, এলায়িত অলস আকাশ-প্রসারে,
ধীরে ক্রমে হয়ে যায় লীন সান্ধ্য শান্তিতলে।
সত্যবানের জীবন্ত তনু বাঁধে সাবিত্রী গাঢ় আলিঙ্গনে
বাঁচিবার বহিবার নির্বাক আনন্দে ভরপুর তনুপরে
বক্ষপুটমাঝে রাখে উষ্ণ সমাদরে
সুখসার প্রিয়-শিরভার,
আপনার অঙ্গে অঙ্গে জাগ্রত আনন্দ করে অনুভব
সত্যবানের অঙ্গে অঙ্গে যে স্বর্গের ভার,
স্পর্শে মাত্র ধরা দেয় বিশ্বের আনন্দ,
সকল জীবন সচেতন তার জীবনে,
তাকে ঘিরেই উল্লসিত সকল সত্তা।
সমাধির সুদূর স্থিতি যায় মুছে;
মানুষী হয়েছে পুনঃ সাবিত্রী, হয়েছে পৃথিবীর,
তবে করে অনুভব আপন অন্তরে সীমাহীন রূপান্তর।
অন্তরে তার রয় মহাশক্তি এক, পৃথিবীর সামর্থ্য বহন করে না তারে,
হৃদয় পোষণ করে আনন্দ এক, স্বর্গের প্রসার ধরে না যারে।
তীব্র জ্যোতি এক অতি উগ্র চিন্তার পক্ষে, সীমাহীন প্রেম—
পৃথিবীর বুকে ঠাঁই নাই তার—দীপ্ত করে তার মানস আকাশ,

ছড়িয়ে পড়ে তার অন্তরাত্মার প্রসন্ন গভীর প্রসারে।
বিশ্বে যেথায় যা-কিছু আসে তারা
দিব্য অনুমেল চিত্তের সকাশে তার।
কণ্ঠে এক অপরূপ নীরবতা যতে উচ্চারে চিন্তারাজি তার।
দেশের কালের সত্তার করেছে সে সবি আপনার;
তারি মাঝে বেঁচে বর্তে রয় তারা, সে-ই তাদের সকল সত্তা,
নিখিল-বিশ্ব আনন্দের তরে আঁকড়ে ধরে রয় তারে,
সৃষ্টি তারি প্রীতিরভসালিঙ্গন তরে।
অন্তরাত্মার সীমামুক্ত অবাধ প্রসারে তার
অসংখ্য বৎসর হয়ে ওঠে দীর্ঘায়িত মুহূর্তের ধারা যেন,
শাশ্বতের সমুজ্জ্বল কাল-চূর্ণ যত।
জ্যোতির্ময় নীড় হতে বিহঙ্গ যেন উড়ে এসে ছড়িয়ে দেয়
তার পার্থিব ভোরে এইসব আনন্দের উড়ন্ত দীপন।
সীমাবদ্ধ নাহি তার, অনন্তরূপিণী।
মুহূর্তের স্পন্দে নিমজ্জিত নহে আর,
অন্তশ্চেতনা তার অনুভব করে অন্তহীন ভবিতব্য,
বাস করে অনাদি যত অতীতের সঙ্গে মিলিত হয়ে।
উষার বিজয়-উন্মেষ জীবন তার,
অতীত আর আগামী দিন যত মিলিয়ে ধরেছে তাদের স্বপ্নরাজি,
পুরাতন বিলুপ্ত সায়াহ্ন আর দূর ভবিষ্যতের আগামী মধ্যাহ্ন সব উভয়ে
এনে ধরে তার দৃষ্টিতলে ত্রিকালজ্ঞ মুহূর্ত সব।
ধ্যানমগ্ন আনন্দে শয়ান সে ক্ষণতরে,
নিমগ্ন জাগ্রত-সমাধির বিস্ময়পুরে;
অর্ধোত্থিত তবে চেয়ে দেখে চারিভিতে,
পুনরায় তুলে নিতে চায় বুঝি হাতে তুচ্ছ পুরাতন মধুময় সূত্র সব,
অতীতের সুখ-চিন্তা, স্মৃতির কণিকামালা,—
সবারে একসঙ্গে ধরে গেঁথে তোলে অমর একটি দিন।
বুকের স্বর্গের পরে ধরে রাখে সদা
প্রিয়জনে—বিমোহিত সুপ্তির অতলে,
শয়ান চেতনাহারা শিশুপ্রাণ যেন
সবচিত্ত যুগল জগতের সীমানাপরে।
ক্ষণপরে দয়িতের পাশে এসে আনত হয়ে ফিরিয়ে ডেকে আনতে চায়
নিজের কাছে সত্যবানের মনকে, তার মুদিত নয়নপরে বুলায়ে দিয়ে
আদরের আপন স্পর্শ; অটল আনন্দের স্তব্ধ-দৃষ্টি তার
এবে লভিল স্থিরপ্রতিষ্ঠা, নাহি সেথা আকুলতা—ধরে আছে আয়ত প্রসারে
অন্তহীন পরিতৃপ্তি, অন্তির আনন্দের পরাকাষ্ঠা,

বিবল, আবেগোচ্ছল দেবের আবেগে।
উড়ে চলে না সে উধেল বাসনায়; বিশ্ববন্ধ সব
ঘিরে রয়েছে চারিদিক স্বর্গ হতে আনত কিরণমালা যেন
প্রান্তরের পরে আত্ম-সমাহিত অধিকার যেন গগনের,
স্বর্গ নেমে এসে পৃথিবীকে করে আলিঙ্গন চারিদিকে হতে,
সবই প্রশান্ত পুলক এক, বিশাল অভয়।
ক্ষণপরে স্পর্শে তার ফেলি দীর্ঘশ্বাস ওঠে সৃষ্টি ধীরে সুকোমল ডানা মেলি
পুষ্পদল সব পক্ষ্ম হতে উড়ে যায়
ছড়িয়ে ধ্বনির তরঙ্গ যেন। জেগে সে দেখে আঁখি সাবিত্রীর
অপেক্ষায় রয় তারি আঁখির তরে, অনুভব করে হস্তস্পর্শ তার—চেয়ে দেখে
ধরাতল আপন ভবন এই আবার এসেছে ফিরে আপনার কাছে,
সাবিত্রী পুনরায় হয়েছে তার, তারই আপন মূর্ত প্রাণাবেগ।
বাহুবন্ধ করে ধরে চারিদিক হতে নিবিড় আলিঙ্গনে,
প্রাণগ্রন্থি যেন দৃঢ় করে আরো আপনার স্বাধিকার,
ধীরে করে নাম তার কম্প্র ওষ্ঠাধরে,
অস্পষ্ট স্মৃতির টানে বিস্ময়-আবেগে কহে গদগদ-ভাষে,
"কোথা হতে নিয়ে এলে আমারে বন্দী করে প্রেমের শৃঙ্খলে,
তোমার সান্নীপ্যে, সূর্যালোকের আবেষ্টনে,
সোনার কিরণ তুমি অমৃত-মধুমা, হে সাবিত্রী,
দেবী তুমি, মানবী তুমি, চাঁদের আলোক তুমি মর্ম মাঝে মোর?
কতই না অপরূপ লোকে করেছি ভ্রমণ—
সঙ্গিনী সর্বদা তুমি, অনুগামী দেবী,
দুজনেই একসঙ্গে তুচ্ছ করে চলেছি রাত্রির দুয়ার সব,
মুখ ফিরিয়ে চলে গেছি স্বর্গের প্রমোদ হতে,
তোমার বিহনে দ্যুলোক অবধি তুচ্ছ।
বিকট আকার সেই, কোথা গেল উবে?
উঠে যে দাঁড়াল রোধি পথ, মূর্ত মহাশূন্য—
চেয়েছিল জগৎকে শুধু মৃত্যু আর নাস্তির তরে,
নাহি মানে ভগবান কিম্বা অন্তরাত্মা? স্বপ্ন শুধু সব
কিম্বা চিত্র ভাসে কোন আত্মার সুষুপ্তিপটে,
প্রতীক যেন কালের বিপরীত লীলার,
অর্থপূর্ণ মানস-আলোর নিশানা
অন্ধকারের অবরোধে পথ ধরে উজ্জ্বল ক'রে,
মৃত্যুর সংকীর্ণ প্রণালীর ভিতরে সাঁতারুকে হাতে ধরে নিয়ে চলে,
অথবা তার কিরণের কৃপাবলে আবিষ্কার করে,
অলিগলির মাঝে অনিশ্চিতের ভীড় করা রাস্তার কোলে,

সেই জীবকে এসেছে যে বিশ্ব-অভিযানে
চির এক, পথচারী এক শাশ্বত হতে?"
সাবিত্রী উত্তরে বলে, "বিচ্ছেদ আমাদের স্বপ্ন শুধু;
আমরা মিলিত, বেঁচে রয়েছি আমরা, সত্যবান।
চেয়ে দেখ চারিদিকে, দেখ চেয়ে আমাদের গৃহ এই বনভূমি
তেমনি রয়েছে সমানে সুখময়, নিয়ে তার সহস্র কলরব
আর পত্রাবলী মাঝে বাতাসের মর্মর;
আর, নবকত-সবুজশোভার ফাঁকে ফাঁকে সান্ধ্যগগন ওই
ভগবানের সুনীলিম চন্দ্রাতপ—তলে তার আমাদের জীবন পেয়েছে আশ্রয়;
পাখীরা সব উচ্চকণ্ঠ উৎফুল্ল হৃদয়ে,
সুপর্ণ কবি যত আমাদের একচ্ছত্র রাজত্বে,
পাত্রমিত্র আমাদের রাজা ও রাণী আমরা যেখানে।
আমাদের অন্তরাত্মা শুধু পিছনে ফেলে রেখে এসেছে মৃত্যুর অমানিশা,
নবরূপ পেয়েছে সে মহান্ এক স্বপ্নময় বাস্তবের কল্যাণে,
উদ্ভাসিত সে প্রতীক লোকরাজির আলোকে
বিশ্ব-আত্মার দুস্তর তুঙ্গশিখরে,
দেবত্বের তোরণের সম্মুখে এসে দাঁড়াল সে রিক্তবন্ধন, মুক্ত।"

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—২৮শ সূক্ত

১। সমিদ্ধো অগ্নির্দিবি শোচিরশ্রেৎ প্রত্যঙ্‌ষুষসমুর্বিয়া বি ভাতি।
এতি প্রাচী বিশ্বধায়া নমোভির্দেবী ঈড়ানা হবিষা ঘৃতাচী ॥১॥

সম্-ইদ্ধঃ=সমিদ্ধঃ—সমিদ্ধ, প্রজ্বলিত
অগ্নিঃ—অগ্নি
দিবি—দ্যুলোকে
শোচিঃ—তেজঃপ্রভা
অশ্রেৎ—লাভ করেছে
প্রত্যঙ্—অভিমুখে
উষসম্—উষার
উর্বিয়া—হয়ে, বিশাল হয়ে, ব্যাপক হয়ে, বিস্তীর্ণ হয়ে
বি-ভাতি—উজ্জ্বল হয়েছে, উদ্ভাসিত হয়েছে
এতি—এসেছে
প্রাচী—ঊর্দ্ধমুখী
বিশ্বধায়া—যাবতীয় বরণীয় বস্তুতে পরিপূর্ণ
নমোভিঃ—প্রণতি দিয়ে
দেবান্—দেবতাদের
ঈড়ানা—পূজয়িত্রী, পূজা করে, আকাঙ্ক্ষা করে
হবিষা—আহুতি দিয়ে
ঘৃতাচী—স্বচ্ছতনু, চিদ্‌ঘন

অগ্নি সম্যক প্রজ্বলিত হয়েছে, স্বর্গে সে লাভ করেছে তার শুদ্ধদীপ্তি, উষাকে সম্মুখে রেখে বিপুল হয়ে সে উদ্ভাসিত। সকল বরণীয় বস্তু নিয়ে এসেছে সে দেবী, চলেছে ঊর্ধ্বে, দেবতাদের সে আকাঙ্ক্ষা করে তার প্রণতি দিয়ে, তার আহুতি দিয়ে সে হয়ে উঠেছে চিদ্‌ঘন ॥১॥

২। সমিধ্যমানো অমৃতস্য রাজসি হবিষ্মন্তং সচসে স্বস্তয়ে।
বিশ্বং স ধত্তে দ্রবিণং যমিন্বস্যাতিথ্যমগ্নে নি চ ধত্ত ইৎপুরঃ ॥২॥

সমিধ্যমানঃ—সমিদ্ধ হয়ে
অমৃতস্য—অমৃতত্বের

রাজসি—রাজা হও তুমি
হবিঃ-কৃণুষ্ব—আহুতিদাতা, যজ্ঞকর্তা
সচসে—ধরে থাক তুমি
স্বস্তয়ে—তার সুস্থিতির জন্য
বিশ্বুঃ—যাবতীয়
সঃ—সে
ধত্তে—ধারণ করে
দ্রবিণম্—সারবস্তুকে
যম্—যাকে
ইন্ধসি—গ্রহণ কর
আতিথ্যম—অতিথিরূপে
অগ্নে—হে অগ্নি
চ—আর, এবং
নি-ধত্তে—ধারণ করে, স্থাপন করে
ইৎ—নিশ্চয়ার্থে
পুরঃ—সম্মুখে

যখন তুমি প্রজ্বলিত হও তখন তুমি অমৃতত্বের রাজা হয়ে দেখা দাও, আহুতিদাতাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে রাখ তার সুস্থস্থিতির জন্য। হে অগ্নি, যাবতীয় সারবস্তু ধারণ করে সে যার আতিথ্য তুমি গ্রহণ করেছ, সে অন্তরে তোমাকে স্থাপন করে সম্মুখে রেখে ॥২॥

৩। অগ্নে শর্ধ মহতে সৌভগায় তব দ্যুম্নান্যুত্তমানি সন্তু।
সং জাস্পত্যং সুযমমা কৃণুষ্ব শত্রুয়তামভি তিষ্ঠা মহাংসি ॥৩॥

অগ্নে—হে অগ্নি
শর্ধ—শৌর্য তোমার প্রকট কর
মহতে—বিপুল
সৌভগায়—আনন্দভোগের, ভোগানন্দের জন্য
তব—তোমার
দ্যুম্নানি—দ্যুতিরাজি
উত্তমানি—সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমোত্তম
সন্তু—হয়ে উঠুক
সম্-জাস্পত্যম্—জায়াপতির সম্মিলনকে
সুযমম্—সুনিয়ন্ত্রিত
আ-কৃণুষ্ব—করে ধর
শত্রুয়তাম্—শত্রুতাকারীদের, আততায়ীদের

অভি-তিষ্ঠ—দমন করে রাখ, দমিত রাখ।
মহাংসি—মহাবল

হে অগ্নি, শৌর্যশালী হয়ে ওঠ বৃহৎ ভোগসামর্থ্যের জন্য, তোমার দীপ্তিরাজি সর্বোত্তম হয়ে উঠুক, জায়াপতির সম্মেলন সুনিয়ন্ত্রিত করে ধর, আর শত্রুতা করে যারা তাদের মহাবল দমন করে রাখ ॥৩॥

৪। সমিদ্ধস্য প্রমহসোঽগ্নে বন্দে তব শ্রিয়ম্।
বৃষভো দ্যুমবাঁ অসি সমধ্বরেষ্বিধ্যসে ॥৪॥

সমিদ্ধস্য—প্রজ্বলিত (যে তার)
প্র মহসঃ—মহত্তম (তোমার), তেজিষ্ঠ
অগ্নে—হে অগ্নি
বন্দে—বন্দনা করি
তব—তোমার
শ্রিয়ম্—শ্রীকে
বৃষভঃ—বৃষভ
দ্যুমবান্—দ্যুমান, দ্যুতিমান
অসি—হও তুমি
সম্-ইধ্যসে—সমিদ্ধ হয়ে ওঠ তুমি
অধ্বরেষু—যজ্ঞযাত্রায়

হে অগ্নি, প্রজ্বলিত তুমি, মহত্তম তুমি, তোমার শ্রী আমি বন্দনা করি ; হে বৃষরাজ, জ্যোতির্ময় হয়ে তুমি যজ্ঞযাত্রায় নিঃশেষ সমিদ্ধ হয়েছ ॥৪॥

৫। সমিদ্ধো অগ্ন আহুত দেবান্ যক্ষি স্বধ্বর।
ত্বং হি হব্যবাড়সি ॥৫॥

সমিদ্ধঃ—সমিদ্ধ
অগ্নে—হে অগ্নি
আহুত—আহুতিবান
দেবান্—দেবতাদের
যক্ষি—যাজন কর
সু অধ্বরে—পূর্ণ যজ্ঞসাধক
ত্বম্—তুমি
হি—নিশ্চয়
হব্যবাট্—হব্যবাহক
অসি—হও

হে অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হয়েছ, আহুতি গ্রহণ করেছ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞসাধন কর, তুমি পূর্ণ যজ্ঞসাধক, তুমিই হলে আহুতি-বাহক ॥৫॥

৬। আ জুহোতা দুবস্যতাগ্নিং প্রয়ত্যধ্বরে।
বৃণীধ্বং হব্যবাহনম্ ॥৬॥

আ-জুহোত—আহুতি অর্পণ কর
দুবস্যত—সেবা কর
অগ্নিম্—অগ্নিকে
প্রয়তি—অগ্রগামী
অধ্বরে—যজ্ঞযাত্রায়
বৃণীধ্বম্—বরণ কর
হব্যবাহনম্—এই হব্যবাহনকে

আহুতি অর্পণ কর, অগ্নির সেবা কর, যজ্ঞযাত্রা যখন এগিয়ে চলেছে; বরণ কর সেই হব্যবাহনকে।'৬।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৯ জুন ১৯৫৪

(এই দিনে বৃষ্টির জন্য ক্লাস হয়েছিল জিম্‌ন্যাসিয়মে)

Elements of Yoga, Chap. XI-এর শেষের দিকে প্রশ্ন ছিল Transformation (রূপান্তর) সম্বন্ধে, মা পড়ে শোনালেন—"স্বপ্নের মধ্যে সাধক যদি কোনো আধ্যাত্মিক সত্যের নির্দেশ লাভ করে তখন কি এই বোঝায় যে রূপান্তরের দিকে তার অগ্রগতি হচ্ছে ?" এর উত্তরে বলা হয়েছে—"ঠিক তা নয়। তবে ওতে এই বোঝাবে যে তার চেতনা সাধারণের চেয়ে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু স্বপ্নের দ্বারা কারো প্রকৃতি বদলায় না।"

মা : যেমন ধরো কোনো বই পড়ে তোমার কিছু পরিবর্তন আসতে হয়তো পারে। তার মানে যে সেই বইটাই পরিবর্তন এনেছে ; এমন কথা ঠিক নয়। তেমনি একটা স্বপ্ন থেকে জানা যায় যে তোমার ভিতরকার চেতনার অবস্থাটি এখন কেমন, তোমার পারিপার্শ্বিকের অবস্থাই বা কেমন, এবং তার থেকে হয়তো রূপান্তর আনা সম্বন্ধে কিছু হদিশ পেতে পারো। কিন্তু সেই স্বপ্নের কথার দ্বারাই রূপান্তর আসতে পারবে তা নয়।

এখন দেখ...কেবল মুখ দিয়ে একটা কোনো বিশেষ কথা তুমি সর্বদাই বলতে পারো, কিন্তু মুখে বলা ও কাজে করার মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। এই বইটি থেকে বাছাই করা কোনো ছত্র আমি তোমাদের কাছে এমন কি একশো বার পড়ে শোনাতে পারি। তেমন তেমন বিশেষ কথা বইটির মধ্যে অনেক আছে তোমরা জানো। সেগুলো বারে বারে আর দফায় দফায় তোমাদের কাছে অসংখ্য বার বলেছি, আর শ্রীঅরবিন্দ সেগুলি তো খুবই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ভাষাতে লিখেছেন, তাই নয় কি ? সেগুলি কী কথা ? (বইএর পাতা উল্‌টে মা সেগুলি খুঁজতে লাগলেন), এখন আবার আমি তাই শোনাতে চাই একশো বার করেও, কিন্তু নিজেরা তোমরা সেটা যদি মন থেকে যথার্থভাবে গ্রহণ করতে না চাও যে...(এই সময় রেকর্ডার যন্ত্রের মধ্যে বিকট আওয়াজ হতে থাকায় মা হেসে উঠে বললেন) এই দেখ নিজেরাই আমরা কথার উপর যেন বজ্রপাত করছি (ইতিমধ্যে মা বইটির থেকে বিশেষ কথাগুলি খুঁজে পেয়েছেন) এই শোনো—"তোমার মন যদি কেবল আপন ভাব ও চিন্তাটিকেই শুধু আঁকড়ে থাকে"—এ কথা যে কতবারই বলা হয়েছে।...আর "প্রাণসত্তা যদি থাকে তার কামনাগুলিকে আঁকড়ে নিয়ে"—আর মনও সেই সঙ্গে বুদ্ধির সাহায্যে আশ্চর্য রকমের যুক্তির দ্বারা তাকে সমর্থন করে আর সেই সব কামনাকে রীতিমত ন্যায্য বলে এমন বাড়ায় যাতে তা খুবই দরকারী বলে বোধ হতে থাকে (এমন কি আমি অনেকের মুখেই শুনি এক অদ্ভুত থিওরি যে কামনাকে সোজাসুজি পূরণ হতে দিলেই নিবৃত্ত হয়ে খেমে যাবে।) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে একটা কামনা পূরণ হলেই আবার অন্য কামনা তখনই স্বাভাবিক নিয়মে এসে উপস্থিত হবে অতি সহজে, তখন আবার তুমি তাকেও মেটাতে যাবে, নিষ্কৃতি পেতে। এই উপায়েতেই যদি চলতে থাকো তাহলে এই করতে করতে একশো জীবন পার হয়ে যাবে।

আর শেষকালে তোমাদের যত সব দৈহিক অভ্যাসের কথা ! অতি সহজ সুন্দরভাবে শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন,—"দেহ আঁকড়ে থাকে যদি তার আপন গড়া অভ্যাস-গুলিকে।" শ্রীঅরবিন্দকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে দেহের দিকে কোন অভ্যাসগুলি ঘোচাতে হবে? যা ছেলেবেলা থেকে খেতে অভ্যাস করেছি সেই দৃঢ়বদ্ধ অনেকদিনের খাদ্যাভ্যাস, যে দেশে জন্মেছি সেখানকার নিয়মে ও রীতিতে যে ভাবে যেমন খেতে অভ্যস্ত হয়েছি, তেমন খেতে না পেয়ে এখন খুবই কষ্ট পাচ্ছি, ছাড়ব কি করে?

এই আশ্রমে বোধকরি এমন এক ডজন ব্যক্তিও মিলবে না যারা এখানকার খাবার খেয়ে বলেনা..."ওঃ, এমন খাওয়া জীবনে তো কখনই খাইনি, এ যে একেবারে অসহ্য।" আর সেইজন্য এখন দেখবে যে শত শত লোকে নিজেরা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমত খাদ্য বানিয়ে নিয়ে যায়, এখানকার তৈরি খাদ্যগুলি না খেয়ে। আর (মা বইটি মুড়ে চুলের উপর রেখে আবার বললেন) তখন তারা কৈফিয়ত হিসাবে ন্যায্য যুক্তি খাড়া ক'রে বলে, "আমার স্বাস্থ্যটাই এই রকমের, ঐ সব খাদ্য খেলে আমি হজম করতেই পারিনা।" অর্থাৎ তাদের মাথার থেকে তৈরি হয়েছে সেইরূপ ধারণা। ওর মধ্যে বাস্তবিক কোনো সত্য নেই। বস্তুত ও ধারণার একটুও সত্য নয়, একটা মিথ্যার মনোভাবের উপরে ভিত্তি করেই তা গড়ে উঠেছে, সেইজন্যেই আমি বলবো যে নিতান্ত সাধারণ স্তরের মানুষদের চেয়ে তোমরা একটুও অগ্রসর হতে পারোনি।

খুবই অল্প জনকয়েক ব্যক্তির কথা বাদ দিয়ে, যাদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায় তাদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমি বলেছি, তারা ব্যতীত সকলেই প্রায় বলে—"আমার এই ছেলেবেলে কখনই তো এমনতরো খাদ্য খায় নি, এই রকম খেলে কেমন করে তারা বাঁচবে?" এমন করে খাদ্য রীতি বদলালে তারা মরেই যাবে"। তাদের কাছে এই মহা সমস্যার সমাধানের উপায় হিসাবে একটা কথা আমি বলতে পারি।

তাদের এই কথা বলব, তুমি জাহাজে কিংবা ট্রেনে যারা পৃথিবী পরিক্রমা করে একে একে পৃথিবীর সকল দেশে বারকয়েক ঘুরে দেখ, প্রত্যেক দেশের মানুষের সঙ্গে থেকে তাদেরই খাদ্য খেতে যখন বাধ্য হবে, তখন দেখবে যে ঐ রকম ধারণা পোষণ করা কতখানি বোকামি। ওটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়, একটা মারাত্মক তামসিক মনোভাব। ঐ ভুলের বিশ্বাসের মধ্যে মনকে এইভাবে জড়িয়ে পাকিয়ে রাখা (মা হাতের ইঙ্গিত করলেন) আর পৈটিকের একটা বাঁধা অভ্যাসকে আঁকড়ে থাকা।

আমার মনের কথাটা খুলেই বললাম। এবার তোমরা প্রশ্ন করতে পারো।

(নীরব থেকে) কোনো প্রশ্ন আর নেই?

প্রশ্ন : মা, আপনি আপনার Prayers and Meditations (ধ্যান ও প্রার্থনা) বইখানিতে এক জায়গায় লিখেছেন—"যা হবার তা হবেই"। তা যদি হয় তাহলে আমাদের এত সব ব্যক্তিগত চেষ্টার কি সার্থকতা আছে?

উত্তর : "যা হবার তা হবেই।" হাঁ, কিন্তু আমি এ কথা কোন্ অর্থে বলতে চেয়েছি তা কি জানো? জগৎ সৃষ্টির প্রথম থেকেই তার সম্বন্ধে আগের থেকেই একটা ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে এখানে নতুন রকমের পৃথিবী হবে, নতুন রকমের মানবজাতি

হবে, ভগবান স্বয়ং এখানে প্রকাশিত হবেন। এগুলি যা কিছু বলা হয়েছে, সেগুলি একসময় ফলবে, অতএব যা কিছু সফল হবার তা হবেই। এই কথাই আমি ওখানে বলেছি, পৃথিবীর যত কিছু খুঁটিনাটি ব্যক্তিগত তোমাদের তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ও কথা নয়। (নীরব থেকে) আর কারো কিছু প্রশ্ন নেই? আমি কি এই এক ঘায়েতেই তোমাদের সকল প্রশ্নকে ঘনিয়ে দিলাম? (হাস্য)

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, যাঁরা ঐরকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁরা কি, তাঁরা কি...

উত্তর হাঁ, যাঁরা তা বলতে পেরেছেন তাঁদের কাছে তা নিশ্চয় ফলবে গো ছেলে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁরা সেই চেষ্টাই করছেন। তাহলে কি?

প্রশ্ন : আমি জানতে চাইছিলাম যে তাঁরা কি শ্রীঅরবিন্দের মতো দিব্যদৃষ্টি পেয়েছেন? অর্থাৎ অতিমানস হবার সম্বন্ধে?

উত্তর : আমি যা বলেছি তা বুঝলে আর কখন প্রশ্ন তুমি করতেনা।

এই পর্যন্তই? এখন তো বৃষ্টি আর নেই, আমরা বেশ আরাম ক'রে আছি। আর কিছু কথা জানতে তোমাদের ইচ্ছা হচ্ছে না? না কি তোমরা আমার কাছে ধমক খাবার ভয় পাচ্ছ? (হাস্য)

প্রশ্ন : মা, চৈত্যসত্তার কী কাজ?

উত্তর : চৈত্যসত্তার কাজ? জানতে চাও তার কাজের খবর? নির্দিষ্ট ভাবে কোন্ কাজ সে করে? বেশ। তা এই ভাবে বলা যায় যে সেটি হলো যেন ইলেকট্রিকের তারের মতো, যা উৎপাদক কেন্দ্রটির সঙ্গে ল্যাম্পের (বাতির) সংযোগ ঘটায়, যার ফলে আলো জ্বলে। কেউ যদি আমার এই কথাটি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে এদের তা বুঝিয়ে দাও।

প্রশ্ন উৎপাদক কেন্দ্র কোনটা আর ল্যাম্প কোনটা? (হাস্য)

উত্তর : হ্যাঁ, সেটাই আসল কথা। কোনটি কে তাই বোঝা চাই, উৎপাদক কে, আর ল্যাম্পই বা কে? বলো।

প্রশ্ন উৎপাদক হলেন ভগবান, আর ল্যাম্প আমাদের দেহ।

উত্তর : হাঁ, দেহ হলো স্থূল জড় পদার্থ, সে ল্যাম্পের আলোর মতো জ্বলবে, কিন্তু কার জোরে? এই জড়বস্তুর মধ্যে যদি চৈত্যসত্তার মতো কিছু না থাকে তাহলে ভগবানের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটতে পারে না। জড়ের মধ্যে সৌভাগ্যবশত এই চৈত্য আছে বলেই তেমন প্রত্যক্ষ সংযোগ সম্ভব হয়, আর প্রত্যেক মানুষকে এই কথা বলা যায়—"তোমার মধ্যে ভগবান রয়েছেন, কেবল আপন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করলেই তাঁর সাক্ষাৎ পেতে পারো।" কিন্তু এই কথা কেবল এই পৃথিবীবাসী মানুষদের সম্পর্কেই বলা চলে। কারণ এই এখানকার মানুষদেরই মধ্যে চৈত্যসত্তা তার স্বাধীন অধিকারে রয়েছে এবং তা সচেতন ও সুগঠিত হয়ে উঠতে পারে। সেটা ব্যক্তিগত জিনিস বটে, কিন্তু তা কেবল এই পৃথিবীরই

পক্ষে বিশেষ রকমের বৈশিষ্ট্য। এখানেই সরাসরি ভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওটি এখানকার অন্ধ ও অজ্ঞান জড়দেহের মধ্যেও যাতে সেরূপ সুযোগ ও অবস্থা থেকে হঠাৎ জাগরিত হয়ে ক্রমশ ধাপে ধাপে তা দিব্য চেতনাতে স্ফুরিত হয়ে ভগবৎ উপস্থিতি ও সান্নিধ্য পেয়ে শেষে মূল ভগবানে পর্যন্ত গিয়েই পৌঁছতে পারে! এই চৈত্য আছে বলেই মানুষ হলো এক বিশিষ্ট সত্তা,—তবে এ কথা আমি সোচ্চারে বলতে চাইনা, কারণ এমনিতেই মানুষ নিজেকে এত বেশি বড়ো বলে গর্ব ক'রে থাকে যে তাতে আর ইন্ধন জোগাবার দরকার নেই। তবে কথাটা কিন্তু খুবই সত্য। বিশ্বের অন্যান্য রাজ্যে আরো কত রকমের সত্তারা রয়েছে যাদের হয়তো অর্ধদেবতা এবং পুরো দেবতাও বলা যায়, যাদের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অধিমানস লোকের সত্তা, তারাও আকিঞ্চন করে এই পৃথিবীতে নেমে এসে দেহ ধারণ করতে, যাতে তারা এই চৈত্যসত্তার অধিকারী হতে পারে, কারণ তাদের নিজেদের কারো মধ্যে এ জিনিস নেই। তারা যদিও মানুষের চেয়ে অনেক বেশি গুণ এবং ক্ষমতাসম্পন্ন, তথাপি এমন ভগবৎ উপস্থিতি ও সান্নিধ্য পাবার মতো সম্ভাবনা রয়েছে এই পৃথিবীরই মধ্যে, তা ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এর চেয়ে উচ্চতর স্তর যথা উচ্চমানস ও অধিমানস প্রভৃতির মধ্যেও তা নেই। তা ছাড়া আর প্রাণময় রাজ্যেও নেই, কিন্তু সেখানকার সত্তারা তার জন্য লালায়িত নয়, তারা চৈত্যসত্তার কামনা করে না। হয়তো তার মধ্যে দৈবাৎ কেউ কেউ পেতে ইচ্ছা করে, তখন তারা দেহধারণ করতে এখানে আসে। তবে সহজে ওরা কেউ চায়না, কারণ এখানে এলেই অনেক নিয়ম বন্ধনের মধ্যে ঢুকতে হয় তা তাদের কাম্য নয়।

তাই এই সবিশেষ সত্যটি আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কেবল মানুষদের মধ্যেই এই অমূল্য সম্পদটিকে দান করা হয়েছে, অথচ তা তাদের কাজে লাগেনা। কারণ এমন চমৎকার জিনিস নিজের মধ্যে পেয়েও এর দিকে কেউ মনই দেয় না। এর দিকে দৃষ্টিপাত না দিয়ে মানুষ কেবল মত্ত থাকে নিজের মনোগত ক্রিয়া ও ইচ্ছা ও ভাবনাকে নিয়ে, ব্যস্ত থাকে প্রাণগত কামনাগুলিকে ও দেহগত অভ্যাসগুলিকে নিয়ে।

বাইবেল গ্রন্থটি তোমাদের মধ্যে ক'জন পড়েছ তা জানিনা, হয়তো পড়তে আগ্রহ হয়না আর ওর লেখাগুলিও খুব দীর্ঘ, তবে ওর মধ্যে এমন একটি কাহিনী আছে যেটি আমার খুব ভালো লাগে। তাতে আছে যে ইসাই আর জেকব ছিল দুই ভাই। ওদের মধ্যে ইসাই ছিল বোধহয় শিকারী, তার একদিন অত্যন্ত বেশি খিদে পেয়েছিল। প্রবলভাবে ক্ষুধাকাতর হয়ে সে জেকবকে বললে—ঐ পাত্রের মধ্যে যে খাবারটি তুমি বানিয়েছ ওটি আমাকে যদি সবটা খেতে দাও তাহলে আমার নিজের জন্মসত্ব পর্যন্ত তোমাকে এখন দান ক'রে দিতে পারি। এমনি হাল্কাভাবে দেখলে ও কথার বিশেষ কিছু অর্থ বা গুরুত্ব নেই, কিন্তু ওর মধ্যে গভীরতর একটা অর্থ রয়েছে: জন্মসত্ব কথাটির মানে ভগবানের সন্তান হয়ে এখানে জন্মাবার যে অধিকার; কেউ যদি স্থূল পেটের খিদে মেটাতে সেই অমূল্য অধিকার ত্যাগ করতে রাজী হয় তাহলে দেখ সেটা কতখানি ভয়ানক কথা। এই প্রাচীন গল্পটির মধ্যে ঐ ভাবটুকুই চিরন্তনের জন্যে রয়ে গেছে।

আর কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তা এবার বলো।

প্রশ্ন : মা, এই আশ্রম তো অনেক দিনের হলো, অথচ আপনি বললেন যে এখানে যারা কিছু ভালো কাজ করেছে তাদের নাকি হাতের আঙুলে গোণা যায়।

উত্তর : না, না, সে কথা আমি বলিনি (হাস্য)। আমি ওটা বলেছি কেবল খাদ্যের ব্যাপারে। কেবল তাদেরই সম্বন্ধে বলেছি যারা এখানে এসে গোড়ার দিকে বেশ ভালো মনেই থাকে, খুশি হয়ে নির্বিবাদে চলতে থাকে, এমন কি খাবার দিক দিয়েও, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের চৈত্য চেতনা কাজ করে। কিন্তু এটা খুবই অদ্ভুত, যে কথা বোধহয় বুলেটিনেও আমি লিখে থাকবো, যে চৈত্য চেতনা যেমনি তাদের নিচে নেমে আসে, অমনি তাদের জীবনের আগেকার যত কিছু মন্দ অভ্যাস প্রকট হয়ে বেরিয়ে পড়ে চেতনাতে কাজ করতে শুরু করে। আর অমনি তারা তখন এই সব বলতে থাকে—"নাঃ, এখানকার এই খাওয়া এখন আর তো মোটে ভালো লাগছে না, সব বিগড়ে গেছে।" আর তারা তখন কিছুদিনের মধ্যেই নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনিয়ে বিনিয়ে নালিশ জানাতে থাকে (মা বিনতির মতো বিকৃত সুর ক'রে বললেন)—"আমি কি আবার নিজের খাবারটা তৈরি ক'রে নিতে পারি ? কারণ কেন জানিনা এখানকার খাদ্য আমার হজম হচ্ছেনা ?" (হাস্য) সঠিকভাবে বলতে পারব না, কিন্তু খুব কম লোকই আছে যারা এমন কথা বলতে চায়না, তার বদলে যারা বলে—"এখানে যা খেতে পাচ্ছি তা খেয়ে ভালোই আছি, আমার ওতে কোনো ক্ষতি হয়নি"। এমন লোকই হাতের আঙুলে গোণা যায়।

এ ব্যাপারটি সোজা অর্থে বুঝে দেখা চাই। কারণ এমন লোকও আছে যারা এমনিতে চুপচাপ থাকে, মুখ ফুটে বলতে সাহস করেনা, কিন্তু যখন কোনো কারণে তাদের শরীর অসুস্থ হয় কিংবা পেটের কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, তখন তারা এ কথা ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলে, আর ডাক্তার তখন বলে, "তাহলে এইরকম বা ঐ রকম ক'রে বদলে খেয়ে দেখ, অর্থাৎ আগের অভ্যাসের মতো ; জিজ্ঞাসা করে—"আগে কি রকম অভ্যাস ছিল ? এইরকম খাদ্য আগে কখনো খাওনি ?" (হাস্য) আর অমনি লোকটি তখন বলে ওঠে, "হাঁ, ঠিক বলছেন আপনি, সেই খাওয়া আগেকার মতো খেতে পারলেই আমি ঠিক হয়ে যাবো।" (হাস্য)

(প্রশ্নকর্তার প্রতি) এখন বুঝলে তো, কি বলেছি আমি ?

প্রশ্ন : আমি জানতে চাইছি, এখানে আমাদের উন্নতির চেষ্টা কি তবে সব ব্যর্থ ?

উত্তর : না গো ছেলে, তা কেন হবে। খাদ্যের ব্যাপার মাত্র একটা দিকেরই কথা, যদিও নিতান্ত গৌণ নয়, ও একটা লক্ষণ যার থেকে লোকের স্থূল দেহচেতনার একটা পরিচয় পাওয়া যায়, কার কেমন দেহপ্রকৃতি স্পষ্টভাবে জানা যায়। তবে বেচারা দেহসত্তার ওতে নিজস্ব দোষ নেই, একটু ধৈর্য ধরে থাকলে সে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ঐ যে কামনাপূর্ণ প্রাণসত্তা আর তার জুড়িদার ঐ মন—ওঃ ! এরাই দুটিতে জোট পাকিয়ে তোমার কাছে এমন এক বিপন্ন অবস্থার ছবি তুলে ধরে যে সেটাই তোমার কাছে মারাত্মক হয়ে ওঠে। এই কারণেই শ্রীঅরবিন্দ ছোটো একটি নোটিস লিখে দিয়েছিলেন এবং সর্বত্র সেটা টাঙানোও হয়েছিল, যদিও এখন নেই কিংবা পুরোনো হয়ে গিয়ে কেউ আর দেখেনা। তাতে লেখা হয়েছিল—"সব সময়ে জানবে যে স্বয়ং মা তোমার দিকে চেয়ে আছেন," এবং এর সঙ্গে

আরো একটু ঘুরে দিয়েছিলেন—"যেহেতু তুমি না দেখতে পেলেও তিনি সর্বদাই উপস্থিত রয়েছেন।" কিন্তু বাস্তবিক চর্মচক্ষের সামনে তো নয়,—"না, না, তা অতটা বাস্তবিক তো নয়, অতএব তাঁকে লুকিয়ে এটা ওটা করা যেতে পারে।" কেবল তেমন কাজই নয় যা চোখের সামনে করা যায়না, তা ছাড়া তারা শ্রীঅরবিন্দের ঐ শেষের কথাটাও বিশ্বাস করে না যে চোখে না দেখেও আমি সব কিছু জানতে পারি, যখনই তারা লুকিয়ে কিছু করে তখনই সেটা টের পাই, আর দেখতে পাই যে ভুল পথে চলে তারা চোরাবালির মধ্যে গিয়ে পড়ে। সেই চোরাবালির টানে তারা এতই নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে যে সেখান থেকে উপরে উঠে আসা খুবই কঠিন হয়। ওর মধ্যে এই কথাটাই সব চেয়ে মারাত্মক—"যা না জানতে পারলেই হলো।" ওটাই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ আনে।...আমি অবশ্য এটা আশা করি যে তোমরা অনেকেই কোনো মিথ্যা কথা বলোনা, কিন্তু ওর ফলে সেই রকমই হয়ে দাঁড়ায়। তোমরা বুঝে দেখ যে এমন মূঢ়তার কোনো তুলনা নেই, কিন্তু তুমি ইচ্ছা না করলেও তাই হয়ে পড়ে লুকোবার চেষ্টা থেকে।

তোমরা জানো যে প্রত্যেক দিন সকালে অনেকে আমার কাছে আসে আশীর্বাদ নিতে, আর রাত্রে আমিও ঘুরে বেড়িয়ে প্রত্যেকের কাছে যাই। তা ছাড়া সকালে যারা ফুল নিতে আসে তাদের দিকেও আমি চেয়ে দেখি। তখন দেখতে পাই যে কারো কারো মাথাকে ঘিরে এমন একটা ভাব সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন তারা বলছে—"এ কথা আমি ওঁকে কিছুতেই জানাবো না।" যেন তারা বলছে—"আমার এটা আর ওটা আর সেটা আমি তোমাকে কোনোমতেই বলবো না।" এমনি ক'রে "বলবোনা, বলবো না" বলতে বলতেই তারা নিজেরাই বলে ফেলে।

প্রশ্ন : না, আমরা যখন কোনো অকাজ ক'রে সেটা গোপন রেখে তোমার সামনে এসে দাঁড়াই, তখন তুমি এমন ভাবে চাও যেন কোনো কিছু হয়নি। সেটা কেন?

উত্তর (হেসে বললেন) শুধুই চেয়ে দেখি, শুধুই শুনি, তাই নয়? যেন কোনো কিছুই জানতে পারিনি! কেবল মুখে শুধু বলি "আ" কিংবা "ও"। তাতেই ভালো হয় গো ছেলে, এবং তা অন্য কারণে। অনেক বার সে কথা বলেছি।

কারো দিকে চেয়ে যখন আমি বিশেষ ভাবে ভিতর পর্যন্ত লক্ষ্য ক'রে দেখি—যদিও সকলের বেলাতে তা সম্ভব হয় না—তখন আমি দেখতে পাই তাদের চৈত্যসত্তাকে, তাদের অন্তর্নিহিত আদর্শকে, যেদিকে তাদের নিগূঢ় লক্ষ্য সেই দিকটা খুলে বাইরে বের ক'রে দিতে চাই। এই হয় আমার কাজ। ভিতরকার জিনিসকে টেনে এনে প্রকাশ হতে দেওয়া। আর যাদের চেতনা কিছু জেগেছে তারা ব্যতীত অন্যেদের বেলাতে তাদের বাহ্য চেতনার সীমা না জেনে যখন নানারূপ প্রশ্ন করি এটুকু জানতে যে আমি যেমন দেখছি তার থেকে সে কতখানি তফাৎ,—তখন তোমরা হয়তো ভাবো যে আমি বুঝি কিছুই তার জানি না, তাই নয় কি? আমি এই সব প্রশ্ন করি—"তুমি কতটা কি বোধ করো? মনের মধ্য কি ভাবো? কেমন অনুভূতি পাও? কি কি..." অর্থাৎ মোটের উপর জানতে চাই যে তার চেতনার প্রসার কতখানি।

তুমি যে নিজের সম্বন্ধে কতখানি জানো আর আমি যে তোমার সম্বন্ধে কতখানি জানছি,

এই দুইএর মধ্যে বিস্তর তফাৎ আছে। আমি এটা তখন জানতে পারি যে কতখানি পর্যন্ত তোমার গন্তব্য হতে পারা উচিত। লোকে বাহির থেকে তোমাকে যেমন দেখছে সেটা বাহ্যতঃ দর্শনীয় চেহারা মাত্র। ভিতর বাহিরের মাঝখানে রয়েছে প্রাণসত্তার ও মনের এলাকা, সেখানে যার যতখানি উন্নতি হওয়া সম্ভব তার প্রতিফলন হয়, অর্থাৎ তোমার চেতনার কতটা বিকাশ হতে পারে। তোমার সত্তার সত্য সেখানে চেতনার মধ্যে অজানা ভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি নিজের সম্বন্ধে যতটুকু জানো সেখান থেকে ঐ জিনিস অনেক-খানি দূরে। মাঝখানের ভূমিটা এতই ঘোরালো ও ধোঁয়াটে যাকে আমি বলব সত্যহীন বা অসত্য। ইংরেজিতে এর জন্যে দুটি পৃথক শব্দ রয়েছে, একটা falsehood (অসত্য), আর একটা হলো lie (মিথ্যা)। তোমরা যখন স্রেফ মিথ্যা কথা বলো সেটা হলো সেই মিথ্যা, কিন্তু সত্তার নিজস্ব সত্যের অভাব যেখানে তা হলো অসত্য, অথচ কেবল ওরই সম্বন্ধে তুমি বাহির থেকে জানতে পারো। খুব অল্প লোকই জানতে পারে যে তার আপন সত্তা কতটা পর্যন্ত উপরে উঠতে চাইছে, তাদের ভিতরকার নিগূঢ় সত্যটি কী? শুধু কারো কারো বেলাতে হয়তো সেটা ক্ষণেকের জন্যে দীপ্তি পেয়ে ঝল্‌কে ওঠে আবার তখনই মিলিয়ে যায় ধোঁয়ার আড়ালে। আমি তাই তাদের প্রশ্ন করি শুধু বাহ্য চেতনার দিক দিয়ে, যা আসল সত্য জিনিসটি নয়।

বিস্তর বৈপরীত্য রয়েছে তোমার রুক্ষ স্থূল দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে আর আমি যেমন দেখছি তোমার কতটা পর্যন্ত হওয়া উচিত তার সঙ্গে, কিন্তু সেই যে ছবিটা আমার মধ্যে ফুটে ওঠে সেটাই আসল তুমি, আর আমি চাই তোমাকে সেই প্রকৃত তুমির অস্তিত্বকে স্পষ্ট উপলব্ধি করাতে। আর চাই তোমাকে চেতন করিয়ে দিতে যে এই যে তোমার অন্ধ অজ্ঞান মূঢ় কপট ও কৃত্রিম বাহ্যব্যক্তি যাকে তুমি তোমার 'আমি' বলে সকলের কাছে পরিচিত করো, সে তোমার প্রকৃত তুমি নয়।

শোনো বলি, সাধারণ হিসাবে তোমরা আমাকে কমবয়সী বলবে না। আমার অনেক বয়স হয়েছে। কিন্তু আমি বাল্যকালে থেকেই শুরু করে এখনও পর্যন্ত কেবল একই ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছি, আজও পর্যন্ত তা থামেনি। খুবই ছোটো বেলাতে আমি কথা না বলে সর্বদা চুপ করে থাকতাম, সেজন্যে অনেক ধমক খেয়েছি। কারণ চুপ ক'রে কেবল তখন পর্যবেক্ষণই করতাম আর সব কিছু স্মরণ করে রাখতাম, এমনি করে শিক্ষা পাওয়া আমার আজ পর্যন্ত থামেনি। তাই এখনও পর্যন্ত অবাক হয়ে হঠাৎ দেখতে পেয়ে যাই এত রকমের জটিল বিকৃতি ও কপটতা ও ক্রূরতা জগতে রয়েছে যে তাকে অসম্ভব বলে আমার মনে মনে হয়। আশ্চর্য হয়ে ভাবি "এতটা কি হতে পারে?" দিনের পর দিন সেইরকম দেখতে পেয়ে বলি, "জগতের মধ্যে এখনও কি এমন সম্ভব হতে পারছে?" জগতে অনেক অনেক মানুষকে দেখলাম, ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, নানা দেশে ঘুরেছি, অনেক উপদেশ বাণীও দিয়েছি, সকল দেশের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের মতো হয়ে থেকে তাদের বুঝতে চেষ্টা করেছি,—শেখবার জন্যে যা কিছু করা দরকার সে বিষয়ে উৎসাহ আমার কখনো কমেনি।

কিন্তু দেখারও শেষ নেই, শেখারও শেষ নেই। এখন দেখি যে তবু কিছুই আমার জানা হয়নি। জগতের মধ্যে ও মানুষের চেতনার মধ্যে এমন সব জিনিসও থাকতে পারে

যা আমার কল্পনার বাইরে। এ সব জিনিস যে কেমন করে সম্ভব হয় তা আমি বুঝতেই পারি না। কোনো ব্যক্তিকে তাই যখন এমন বিকৃত ও কুটিল হতে দেখি যে তাকে মানুষ বলেই চেনা যায় না, তখন আমার এই বোধ হয় যে তার ভিতরকার সত্যচেতনা প্রকাশ না হতে পেয়ে জটিলতায় আবদ্ধ ও বিকারযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কেমন করে সে যে এমন অবস্থাতে উপনীত হয়েছে তা আমি ভেবেই পাইনা।

এই হলো আমার দেখা। তোমাদের নিরুৎসাহ ক'রে দেবার জন্যে আমি এ সব কথা বলছিনা, কেবল মাঝে মাঝে কেন প্রশ্ন করি তাই বলছি। কারণ তাতে সব সময়েই দেখি কিছু না কিছু নতুন শেখা হয়। এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকী আছে। এর ফলে কত কিছুই দেখতে পাই তাই তোমাদের কাছে বলছি—রাত্রে আমি দেখতে বেরোই যখন অন্য সকলে ঘুমোচ্ছে। এতে আমার বেশ সুযোগ মেলে, কারণ ঘুমের সময়ে আসল মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যায়। এমনি সকলের কাছে ঘুরতে ঘুরতে এত রকম আশ্চর্য ব্যাপার কতই দেখি যা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। আর পরে সম্ভব হলে নানা রকম প্রশ্ন করি এইটুকু জানতে যে আমি যেমন দেখতে পেয়েছি সেটা কতখানি ঠিক দেখা হয়েছে। বছরের পর বছর আমি নিত্যই তাই করছি। চেতনভাবে এটা আমি শুরু করেছি বোধকরি ১৯০৪ সাল থেকে, অর্থাৎ এখন পঞ্চাশ বছর পার হতে চলল, কিন্তু এখনও তা থামেনি।

তাই এখনও পর্যন্ত ঠিক দেখা দেখলাম কিনা তাই জানতে তাদের কাজের দিক দিয়ে প্রশ্নগুলি করি, শুধরে নেবার জন্য, কিন্তু এখনও জানিনা—

(এই সময়ে টেপ রেকর্ডার যন্ত্রের মধ্যে বিকট রকম শব্দ হতে থাকায় না থেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ফুরিয়ে গেছে? ওটা আর বুঝি চলতে চাইছে না?" শব্দ থেমে যেতে আবার কথা বললেন)

এখনও কিন্তু আমি তেমন নিঃসন্দেহ জোরের সঙ্গে বলতে নিশ্চয় পারব না—যেমন লোকে প্রায়ই আস্ফালন ক'রে বলে, আমি ঠিকই দেখে নিয়েছি, ঠিকই জেনেছি, যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছি।

জগৎটা নিত্যনিত্যই পরিবর্তিত ও রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়ে চলেছে, সব কিছুই অনবরত বদ্‌লে যাচ্ছে। এই পৃথিবীতে যদি আমি হাজার বছর কিংবা তারও বেশি বেঁচে থাকি, তবু তখনও আমার শেখার শেষ হবে না, সর্বদাই নতুন কিছু জানতে থাকবো—কারণ কালকে যেটা সত্য ছিল আজকে আর তা নেই, আবার আজকের যেটা সত্য তা আগামী কাল তেমন আর থাকবে না,—জগতের সব কিছু তো অনবরত পাল্টাচ্ছে সুতরাং নতুন শেখাও নিত্য হতে থাকবে। বলতে পারিনা এই রকম ক্রিয়া করেই জগৎ নিজেকে ক্রমশ আরো বিশদভাবে প্রকাশিত ক'রে চলেছে কিনা। এত বেশি রকমের অপ্রত্যাশিত ও স্ফুটতর জিনিস এখানে এতই জানবার আছে যার জন্যে বিস্তর সময়ের দরকার।

আজ এই পর্যন্ত। ওর টেপ কি ফুরিয়ে গেল? তাহলে এবার আমরাও থামছি। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। শুভরাত্রি।* —শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

"ছোট্ট হাসি"কে লেখা শ্রীমা'র পত্র

অনুবাদ : রীণা মিত্র

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

...বাগো, হাঁ৷ আমি বুঝতে পেরেছি—তোমার কাছে কিছুই গোপন করে রাখতে পারি না। আরও বুঝতে পেরেছি যে, তোমাকে ছেড়ে আমার বেঁচে থাকা অসম্ভব। আর এই জন্যেই তুমি দেখতে চাও বোধহয় যে, আমি যেন খুব বেশী কষ্ট পাই। নয় কি?

শ্রীমা—তোমার বক্তব্য আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। তুমি এটাই বিশেষ করে বলতে চেয়েছো যে তোমার কষ্ট দেখতে আমি পছন্দ করি। ধারণাটা এতই অযৌক্তিক যে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি তুমি এমন ভাবতে পারো।

যে আমি সমগ্র বিশ্বের দুঃখদুর্দশা দূরিভূত করবার জন্যেই আমার সমগ্র শক্তি সংকল্প নিয়ে কাজ করে চলেছি, সেই আমিই কিনা চাইবো তোমার কষ্ট—চাইবো আমার একটি প্রিয় সন্তান কষ্ট পাক?—এ তুমি ভাবতে পারলে? এ কি অসম্ভব কল্পনা?

৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৩

শ্রীমা—বাস্তব জগতের ন্যায় সূক্ষ্ম জগতেও রয়েছে চোরের উপদ্রব। আর এই চোরের উপদ্রবের হাত হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য যেমন ঘরের দরজায় মজবুত খিল দিয়ে থাকি ঠিক তেমনি সূক্ষ্ম জগতেও তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য চিন্তাধারার ও অনুভূতির দরজায় বেশ সতর্ক হয়ে খিল দিতে হয়।

এই সব চোরেরা আসে দুঃখ হতাশা ও আত্মহত্যার মধ্য হতে। (প্রাণ জগতের চোর এরা) কারণ, যখন তুমি হতাশায় অধীর হয়ে পড় তখনই এরা তোমার নিকট থেকে চুরি করতে সুযোগ পায়। এদেরকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—এই সব চোরদের দুরভি-সন্ধিকে আমল না দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখ। এইটুকু আজ আমার ছোট্ট হাসিটিকে বলবার রয়েছে।

১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৩

চিন্ময়ী মা,

তুমি এবারের চিঠিতে আমাকে "তোমার বাছা" বলে সম্বোধন করোনি। আমি কি এতই অধম অযোগ্য হয়ে গেছি?

আমি জানি যে, আমি যতটুকু পারি তা সম্পন্ন করি। এতেই যদি আমি ভাল না হই তবে আর কি করবো। হাঁ, আমি জানি, পূর্বে যা ছিলাম এখন আমি তেমনটি নেই।

শ্রীমা—আজ বিকেলে তোমাকে যে লেখাটুকু পাঠিয়েছি তাতে "আমার বাছা" এই কথাটি লেখা হয়নি, কিন্তু ওটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়। আমার এত কাজের চাপ ছিল যার জন্য আমি সংক্ষেপে কয়েকটি কথামাত্র তোমাকে লিখেছি। বাস্তবিকই, তোমার ঐ দিকটা নিয়ে চিন্তা করিনি, করবার দরকারই বা কি? তুমি যখন আমার শাশ্বত সন্তান এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তুমি যখন নিজের কাজে আনন্দ পাও; আনন্দ পাও আমার কাছে থাকতে—আমার উপর বিশ্বাস করতে—আমার সকল কাজকে সমর্থন করতে, তখন প্রতিবারে আমি নাই-বা লিখলাম ঐ কথাটি? জানি না, কে তোমার হৃদয়ে এমন করে সন্দেহ এবং অসন্তুষ্টির বিষ ঢেলে দিচ্ছে? তোমার জীবনের সুখ-শান্তি—সহজ সরল আনন্দ তোমার ওই সুন্দর হাসিটি যা দেখলে আনন্দ হয়, কে তাকে এমন করে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে? এসব কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি না। কারণ, আমি জানি তোমার মধ্যে কে এসব করছে। বলছি এই জন্যে যে—তুমি শুধু বুঝবে আমি তোমাকে এসবের জন্যে দায়ী করিনা। কারণ এসব আসছে বাইরে থেকে। তবু যত বাধাই থাক বর্তমানে শুধু একটি পথই মাত্র খোলা আছে তোমার পক্ষে—শুধু এগিয়ে চলা। কিছুতেই আর পেছন ফিরে থাকা নয়। চলতে চলতেই তুমি এ বিষয়ে সচেতন হবে।

আর কখনো আমার ভালবাসাকে অবিশ্বাস করোনা যা সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে, তোমাকে তোমার অপরিহার্য উন্নতিতে সাহায্য করে চলেছে।

২৫শে জানুয়ারী, ১৯৩৩

মা, আমি সর্বদাই তোমাকে একই বিষয়ে লিখি—ধ্যান, কাজ ও কথা—এই হল আমার একমাত্র লেখার বিষয়। রোজই একই লেখা পড়তে কি তোমার ভাল লাগে?

শ্রীমা—কেন নয়, আমার 'ছোট্ট হাস'? তুমি একই জিনিস বিভিন্ন ভাবে বলতে শিখবে। কোনো রকম পদ্ধতি লিখবার ও শিখবার এটা একটা সুন্দর অভ্যাস। আমি মনে করি এই সময়ের জন্য তুমি হাতের লেখা অভ্যাস করছো। কে তোমাকে এমন সুন্দর লিখতে শিখিয়েছে? ইতি— তোমার স্নেহশীলা মা

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

শ্রীচরণকমলেষু মা,

আজ তোমার কাছে দশ ঘন্টা ধরে শরীর দিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছি, (অর্থাৎ তোমার কাজ করেছি) পূর্বে একবার তোমাকে যে-কথা বলেছিলাম সেটি হলো—যারা এরকম শাড়ীতে সূচি-শিল্প করে তাদের সেই অনুযায়ী বড় ফ্রেমের দরকার হয়—যত বড় শাড়ী তত বড়ই হবে ফ্রেমটি।

শ্রীমা—তোমাকে যদি অতবড় একটা ফ্রেম দেওয়া হয়, সেই ফ্রেমটা রাখার জন্যেই তৎক্ষণাৎ আবার একটা ঘর করবারও প্রয়োজন হয়ে পড়বে না কি?

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

শ্রীমা—আমার ছোট্ট হাসি, তুমি হলে একটি সুন্দর সুদক্ষ কর্মী। তোমার কাজ এত সুন্দর যে আমি তোমার ও তোমার কাজের জন্য গর্ব অনুভব করি। আজ তোমার লেখার মধ্যে একটিও ভুল হয়নি।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩

শাশ্বত জননী,

আজ আমি শরীর দিয়ে নয় ঘন্টা তোমার কাছে প্রার্থনা করেছি। এখন আমি আবার পূর্বের মতই আমার কাজ নিয়মিত করছি।

আর অধিক কি?

শ্রীমা—খুব ভালো আমার ছোট্ট হাসি! সত্তার স্থির শান্ত অবস্থা নিয়মিত কর্মের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩রা মার্চ, ১৯৩৩

শ্রীমা—আজকের তারিখটি লক্ষ্য করেছো? ৩-৩-৩৩?

জান কি এরকম মিলের তারিখ এগার বছর অন্তর একবার করে আসে। এগার বছর আগে, ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লিখতে পারা গিয়েছিল—২-২-২২! আর অন্য একটি এগার বছর হবে এপ্রিল মাসে—তখন আবার লেখা যাবে—৪-৪-৪৪ এবং এরপরে হবে চতুর্থবার। জিনিষটা বেশ কৌতুহলোদ্দীপক, নয় কি?

৯ই মার্চ, ১৯৩৩

শ্রীমা—তোমার শাড়ী পরে আমি খুব আনন্দ পাই। যেমন করে অন্য সকলে তাদের কারুকার্যকরা কাজগুলিকে অতি যত্নে তুলে রাখে, তোমার এই কাপড়গুলিকেও আমার ঠিক সেই রকম করে তুলে রাখতে ইচ্ছা হয়—আর এই জন্যেই তোমার শাড়ী-গুলিকে আমি প্রায়ই পরি না।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৩

স্নেহময়ী মা,

আজ সকালে তুমি আমাকে একটি ফুল দিয়েছো যার মানে হলো "অতিমানস জ্যোতির দিকে চেতনার গতি।" এর অর্থ কি? আমি বুঝতে পারিনি।

আজ আট ঘন্টা আমি আমার দেহ দিয়ে তোমায় প্রার্থনা করেছি। ইতি—

তোমার সন্তান।

শ্রীমা—যদি তুমি অভিমানসের পরিবর্তে ভগবান কথাটি ব্যবহার করো তাহলে কি অর্থটা তোমার কাছে পরিষ্কার হয়?

এর মানে হলো, যে চেতনা জীবনের সাধারণ কার্যধারা ও প্রভাবের দ্বারা পূর্ণ না হয়ে উন্মুখ হয়ে রয়েছে দিব্য জ্যোতি, দিব্য শক্তি, দিব্য জ্ঞান ও দিব্য আনন্দের দিকে।

এখন কি বুঝতে পারলে?

২৮শে মে, ১৯৩৩

শাশ্বত জননী,

আমি বিশ্বাস করি না যে, আমি একা—আমি নিশ্চিত যে তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছো। আজ আমি চার ঘন্টা কাজ করেছি। আজ এই পর্যন্ত। ইতি—

তোমার সন্তান

শ্রীমা—খুব ভাল ধারণা গো মেয়ে। এটা খুবই সত্য যে আমি সর্বদাই তোমার নিকটে রয়েছি।

২৬শে জুন, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

গতকাল সন্ধ্যায় তোমার জন্য একটি কামিজ কেটেছি। এটা হলো আমার প্রথম কামিজ কাটা। 'ক' সেটি সেলাই করেছে। কামিজ তৈরী হলে তুমি আমাকে বলবে কেমন হয়েছে। কারণ, যদি ভাল কাটা হয় তাহলে আমি এরপর বিনা দ্বিধায় আরো কাটতে পারবো।

আজও আমি সারা দিন ধরে কাজ করেছি।

শ্রীমা—তুমি এই কাজটিও শিখে ফেলেছ জেনে আমি খুব খুসি হয়েছি। "সারা দিন" বলতে তুমি কি বুঝাতে চেয়েছো? আমি তো মনে করি নয় ঘন্টার বেশি হওয়া উচিত নয়। কারণ, একটানা নয় ঘন্টা কাজ করলেই খুব বেশি হয়ে গেল, তারপরে আর একটুও বাড়ান উচিত নয়।

২৭শে জুন, ১৯৩৩

মা, আজ সকাল থেকেই আমার বাঁ চোখের মণিটাতে একটা যন্ত্রণা অনুভব করছি। ইতি—

তোমার 'ছোট্ট হাসি'

শ্রীমা—তুমি দিনে তিনবার করে গরম জলে বোরিক দিয়ে চোখ ধোও এবং দু'তিন দিন সূচী-শিল্পের কাজ একটু কম করে করো। যা বলছি সেগুলি ঠিকমত করো, মনে রেখো তোমার কাজগুলো সম্পূর্ণরূপে তোমার চোখের উপর নির্ভর করছে। যে কোনো উপায়েই হোক তোমার চোখ যদি খারাপ হয়ে যায়—জানবে তোমার অমন সুন্দর সূচিশিল্পের কাজটার এখানেই ইতি হয়ে গেল। যখনই চোখে ক্লান্তি অনুভব করবে তখনই কয়েক মিনিটের জন্যে হাত দিয়ে চোখ এমনভাবে ঢেকে রাখবে, যাতে চোখের মণিতে চাপ না পড়ে। দেখবে এটা তোমাকে খুব আরাম দেবে।

২৮শে জুন, ১৯৩৩

করুণাময়ী মা,

গতরাত্রে আমি চোখ ধুয়েছি এবং আজ সকালে তোমাকে লিখছি যে, আমি ঘুম থেকে উঠে বুঝতে পারলাম আমার চোখ সম্পূর্ণ সেরে গিয়েছে। এখন আর আমার চোখে একটুও ব্যথা নেই। আমার মনে হয় এটা ধুলোর জন্যেই হয়েছিল। আজ ক'দিন বড্ড বেশী ধুলো হয়েছে—বাড়ীতে ঘরে এমন কি রাস্তায় পর্যন্ত। যখন খুব হাওয়া হচ্ছিল তখনই মনে হয় চোখে ধুলো ঢুকেছে।

আজও আমি সমস্ত দিন কাজ করেছি। আর বিশেষ কি?

শ্রীমা—হাঁ, তাই হবে হয়তো। ধুলোর জন্যই এমন হয়েছিল। যারা ঘরে বসে কাজ করে—রাতে শোবার আগে তাদের ঈষদুষ্ণ গরম জলে চোখ ধোয়া উচিত। 'T'-এর কি কেরোসিন ষ্টোভ নেই? ষ্টোভে জল গরম করতে খুবই সহজ হবে। আগে জল ফুটিয়ে গরম করবে, পরে সেই জল বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এলে চোখ ধোবে। তবে চোখ পুড়ে যাবে না। (প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)

২৬শে জুলাই, ১৯৩৩

শ্রীমা—মানুষ অপর একজনের জন্য যে কষ্ট স্বীকার করে তা কখনো বিফলে যায় না। তার ফল আজই হাতে হাতে না পাওয়া গেলেও একদিন না একদিন তার প্রকাশ পাবে।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

আমি সন্ধ্যাবেলাটা সাধারণতঃ কেমন করে কাটাই তোমাকে তা লিখে জানাচ্ছি:

তোমাকে দর্শন করার পর আমি উপরে গিয়ে রাত্রের খাবার খেয়ে ঘরে ফিরি। তারপর ঘরে গিয়ে তোমাকে চিঠি লিখতে বসি—কোনো দিন-বা আমার ও 'T'-এর লিনেন্ কাপড় ধুই (কখনো কখনো অবশ্য 'T'-ও ধোয়)। তারপর আমি এক ঘন্টার

জন্যে একটু বেড়াতে বের হই। বেড়িয়ে ফিরে এসে একটু লেখাপড়া করি। তারপর শুতে যাই।

কিন্তু গতকাল সন্ধ্যায় প্রায় সাড়ে ন'টার সময় আমি 'T'-কে মেসিনে সেলাই করতে সাহায্য করলাম সওয়া দশটা পর্যন্ত। 'T'-র পর আমি আবার নিজে মেসিনে সেলাই করলাম পৌনে বারোটা পর্যন্ত। তারপর একটু লেখাপড়া করে সাড়ে বারোটার সময় শুতে গেলাম।

আজ তিন ঘন্টা পোষাক তৈরীর কাজ করলাম। ইতি—

শ্রীমা—অতো রাত করে শোওয়া উচিত নয়।

এ রকম অভ্যাস একটুও ভাল নয়—এমন করলে সর্বপ্রথমে তোমার চোখটি নষ্ট করবে। তারপর হারাবে তোমার অমন সুন্দর সূচী-শিল্পের হাতখানা। ক্রমে স্নায়ুগুলিও হয়ে পড়বে দুর্বল, তোমার হাতও তখন যথাযথভাবে চলতে চাইবে না। ঘটবে ধৈর্যচ্যুতি—কাজেও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেবে। তখন কাজের সফলতা লাভের আশাও হারিয়ে ফেলবে।

আশা করি তুমি এমন ধরণের ফল চাও না।

১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৩

শাশ্বত জননী,

আজ ১৫ই আগষ্ট আমার কাজ নেই। আগামী কাল থেকে আবার কাজ আরম্ভ করবো।

শ্রীমা—আমার মনে হয় আজ তুমি গর্বিত হয়েছো তোমার হাতের তৈরী সুন্দর শাড়ী দেখে। প্রকৃতই এটা অতুলনীয়, এবং আমিও আমার 'ছোট্ট হাসি'র সুন্দর কাজের জন্য গর্ব অনুভব করি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobinnro	5·00
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurocindo	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২ ০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		যন্ত্রস্থ
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রবোধকুমার সেন	৫·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,, ,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

It is in a constant inner growth ,that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, Benaras Road,
H O W R A H.
Phone 66-2434

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড :	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

শ্রীঅরবিন্দায়ণ

নীরদবরণ

(শ্রীঅরবিন্দের সচিত্র জীবন, কর্ম ও সাধনা)

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

মূল্য চার টাকা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দের সম্পূর্ণ রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবেন। জয়ন্তীর একটি অংশ পালিত হবে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা মূল ফরাসী এবং ইংরাজী থেকে বাংলায় অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা বাণী ও প্রবন্ধ, পুরানো লেখা, প্রশ্ন ও উত্তর, পত্রাবলী ইত্যাদি। আশা করা যায় সমগ্রটি ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—৩০৲ টাকা (সডাক ৩৫৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫৲ টাকা (সডাক ৫০৲ টাকা)

[শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা সংগ্রহ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। লাইনো টাইপে ছাপা ও সুন্দর কাপড়ে রক্তবর্ণ বাঁধাই হয়ে সুদৃশ্য আকারে বেরুবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখের মধ্যে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে [illegible] করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জমা [illegible] সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।
৪। টাকা জমা দেবার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০১২

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮, [illegible], কলিকাতা-৭০০০১৬

[রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা চলছে এবং তা পাওয়া গেলে বইএর মূল্য হ্রাস করা হবে।]

9 SEP 1976

শ্রী অরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(১৫ই আগস্ট, ১৯৭৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীগুরু স্তব	শ্রীঅরবিন্দ	৫
সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ	৯
বেদনায়	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১৬
শেষ প্রান্তে	"	২৬
দাস্তের দিব্যদর্শন		২৯
সিদ্ধি	রমেন সেনগুপ্ত	৩০
নেপথ্যে	সুমিত্রা মিত্র	৩২
সাবিত্রী—শ্রীমার কথা	...	৩৩
ছোটদের গল্প	শ্রীমা	৪০
মায়ের সঙ্গে কথা		৪৮
ছোট ছাত্রীকে লেখা শ্রীমার পত্র		৬২
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু	৬৮
সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ	সমীরকান্ত গুপ্ত	৭৩
একখানি পত্র	সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ	৭৭

বার্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

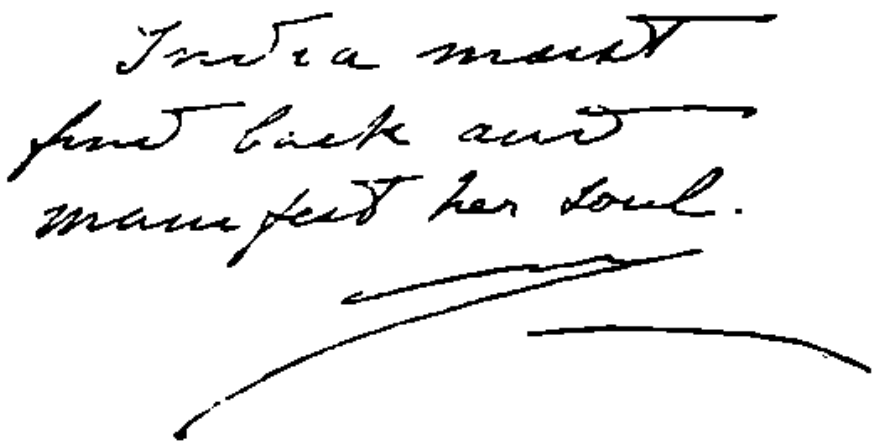
Just a moment
shut back and
manifest her soul.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

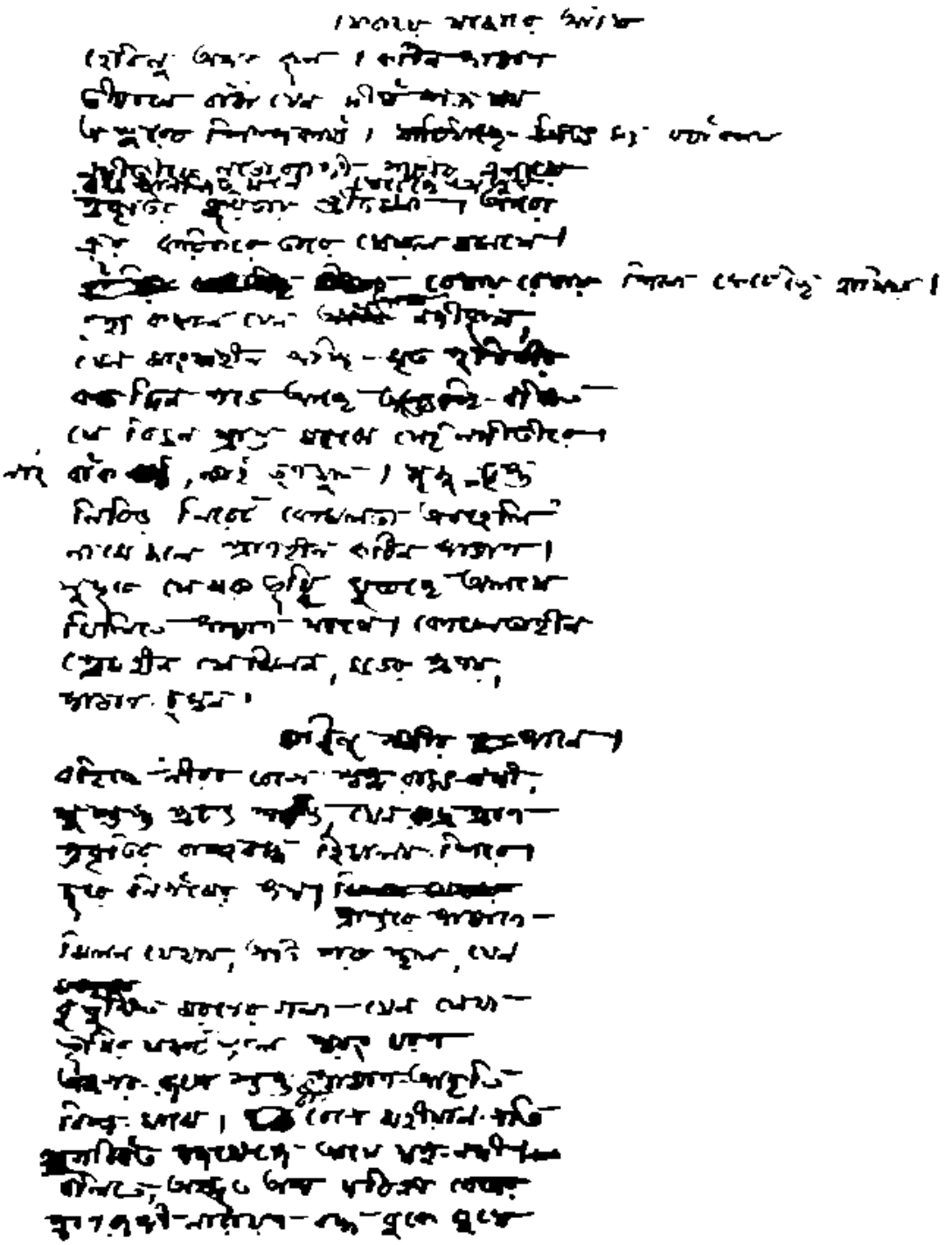

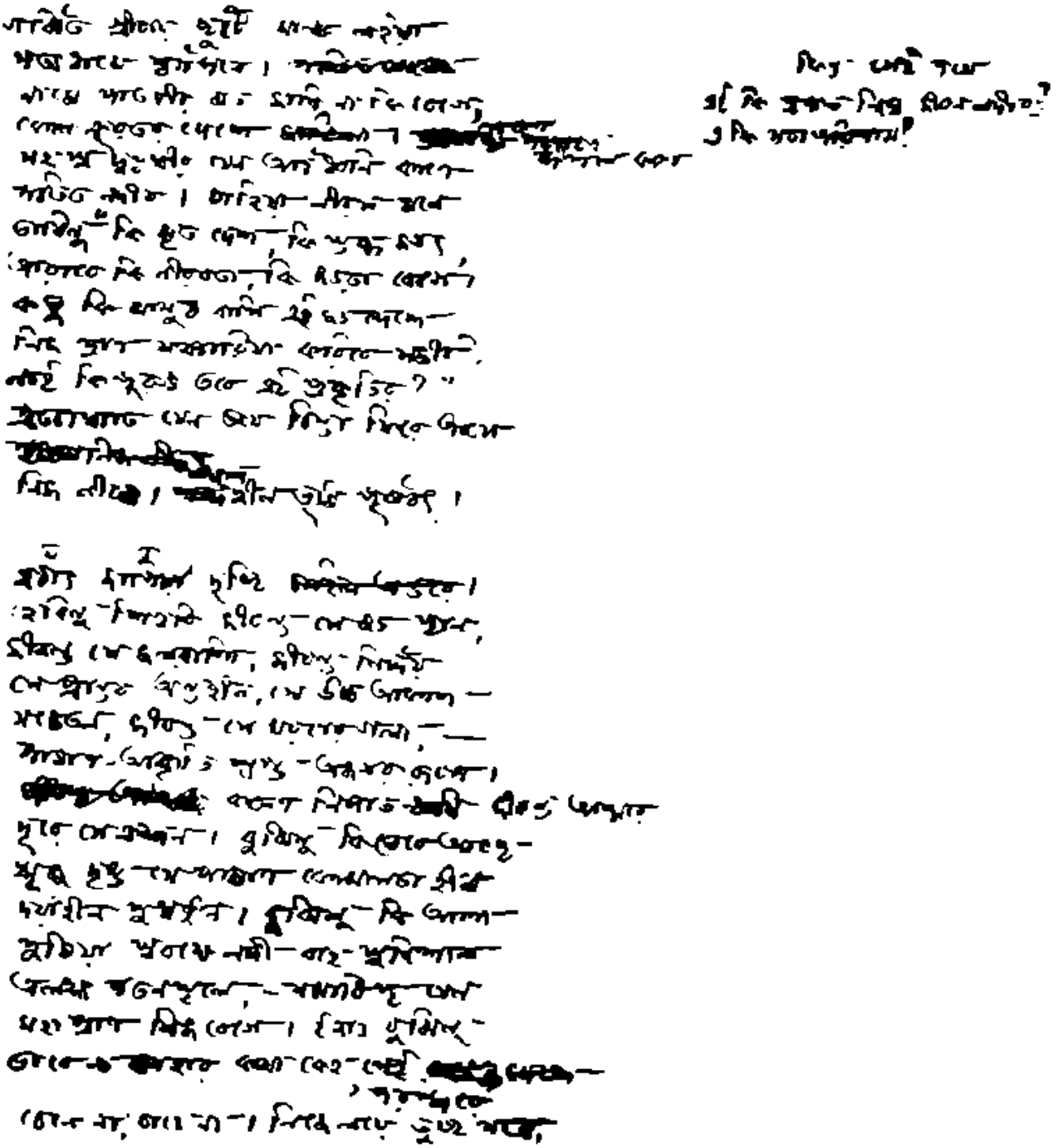

জীবন্ত জড়

শ্রী [illegible]

জানিনা কোথায়
এসেছিনু ঘুরে ঘুরে দূর স্বপ্নদেশে।
দেখিলাম দাঁড়ায়েছি ক্রত-নদী-কূলে।
উপরে বিস্তীর্ণ শূন্য পাণ্ডুর নীলিমা
দৃঢ়, অতি উচ্চ। আমাদের ধরাধামে
বন্ধুদ্বয় যেন সদা আকাশ মেদিনী
প্রণয়ের খেলা করে মিলিয়া দু'জনে।
হরিৎ পৃথিবী শুধু উপরে নিরখে
প্রণয়ীর মুখকান্তি, কাঁপে তীব্র সুখে
সহস্র তরুপল্লবে, শীত তৃণমাঝে।
সুনীল আকাশ তারে আলিঙ্গনে ধরি'
প্রিয়ার অখিল দেহ ঘিরিয়া সভয়ে
উচ্চ শির তুলি' উচ্চে হাসে প্রেমভরে।
এই খেলা হেথা। আমাদের ধরাধামে
নাই সেই ভীষণ বিচ্ছেদ। কিন্তু সেথা
মরেছে পৃথিবী যেন ক্রোড়ে দুঃখে ভয়ে
শূন্য বিশ্বে পড়ি' একা। গ্রস্ত সে অনন্তে
ভীত সেই উচ্চতায় বিভীষিকাঘেরা
মানবের ক্ষুদ্র প্রাণ। বাধাহীন ভূমি
নীরব বিস্তীর্ণ শূন্য বিবর্ণ পাণ্ডুর
শূন্যের বিশালতায় প্রাণহীনতায়
মহদায়তন অবিচ্ছিন্ন। নাই তরু,
তৃণ, শিলা, মানবের কোথাও নিবাস
হেরি নাই! চক্ষু চলে সদা, চলে শুধু,
খুঁজিয়া পায় না অন্ত, তবু শ্রান্ত আমি
ফিরিতে অক্ষম! ক্রূর দৃশ্য ক্রূর টানে
হয়ে লয় তাঁরে বন্দী যেন শত্রুদেশে
আরও আরও দূরে অসীম জগতে
নিস্পন্দ অনন্তে।

ফিরায়ে সজোরে আঁখি
হেরিনু অপর কূল। কঠিন পাষাণ
ভীমবলে বাঁধা যেন দীর্ঘ শক্ত সব
অসুরের শিল্পকার্য্য। মত্ত বর্ষাকালে
নদীতীরে নভোব্যাপী শরীর এলায়ে
রুক্ষ আনন্দিত মনে খেটেছে অসুর
প্রকৃতির ক্রূরতায় প্রীতমনা। আরো
ক্রূর করিবারে তারে খেয়াল মানসে।
রেখায় রেখায় শিলা কেটেছে হাসিয়া।
বৃহৎ কঙ্কাল যেন আর্দ্র নদীকূল,
যেন মাংসহীন অস্থি মৃত পৃথিবীর
কতদিন পড়ে আছে অন্ত্যেষ্টি-বঞ্চিত
সে বিজন প্রান্ত মাঝে সেই নদীতীরে।
নাই বাঁক, নাই তৃণফুল। ঋজু-দৃপ্ত
নিবিড় নিরেট কোমলতা অবহেলি'
নামে জলে প্রাণহীন কঠিন পাষাণ।
সুদূরে সে মরুভূমি ঘুরেছে অলসে
মিলিতে পাষাণ সাথে। কোমলতাহীন
প্রেমহীন সে মিলন, জড়ের প্রণয়,
পাষাণ চুম্বন।

চাহিনু নদীর পানে।
বহিছে নীরব বেগে স্বপ্নরাজ্য-নদী,
সুষুপ্ত প্রচণ্ড শান্ত, যেন রুদ্রপ্রাণ
প্রকৃতির বাহুবদ্ধ হিমালয়-শিরে।
দূরে নির্গমের পথ। প্রান্তরে পাষাণে
মিলন যেথায়, অতি সরু স্থল, যেন
বুভুক্ষিত মরণের গলা, যেন সেথা
তূণির সঙ্কটস্থলে স্বয়ং মরণ
অজগর-রূপে সুপ্ত পাষাণ-আকৃতি
বিশ্ব-মাঝে। ধীর বেগে মহীয়ান-গতি
সুগর্ব্বিত পদক্ষেপে আসে স্বপ্ন-নদী।
বলিতে, অদ্ভুত অশ্ব দধিক্রা বেদের
প্রাণরূপী নারায়ণ বদ্ধ বুকে মুখে
গর্ব্বিত গ্রীবায় ছুটে মানবে লইয়া
সত্যধামে স্বর্গ পথে। কিন্তু সেই পথে

এই কি প্রপাত নিম্নে জীবন-নদীর?
এ কি সত্য পরিণাম?
নামে পাতকীর মত জানিনা কি বেগে,
কোন ক্রূরতর দেশে। পশিল করুণ
সহস্র দু:খীর যেন আর্ত্তধ্বনি কানে
পতিত নদীর। চাহিয়া নীরস মনে
ভাবিনু "কি মৃত দেশ, কি স্তব্ধ জগৎ,
আত্মারে কি নীরবতা, কি জড়তা বেগে।
কভু কি মানুষ বাসি এই জড়দেশে
নিজ প্রাণ সঞ্চারিয়া করিবে সজীব?
নাই কি পুরুষ তবে এই প্রকৃতির?"
প্রত্যাখ্যাত যেন ভয়ে চিন্তা ফিরে আসে
নিজ নীড়ে। স্পন্দহীন ভূমি পূর্ব্ববৎ।

জাগিয়া হঠাৎ দৃষ্টি চাহিল অন্তরে।
হেরিনু শিহরি' জীবন্ত সে জড় স্থান,
জীবন্ত সে জলরাশি, জীবন্ত নির্দ্দয়
সে প্রান্তর অন্তহীন, সে উচ্চ আকাশ
সচেতন, জীবন্ত সে মরণের গলা,—
পাষাণ-আকৃতি সুপ্ত অজগর রূপে।
করুণ নিপাত-ধ্বনি জীবন্ত আত্মার
দূরে সে ক্রন্দন। বুঝিনু কি ভেবে আছে
ঋজু দৃপ্ত সে পাষাণ কোমলতাহীন
দয়াহীন সুখহীন। বুঝিনু কি আশা
পুষিয়া স্বরক্ষে নদী বহে সুবিশাল
অলক্ষ্য পতনস্থলে, সমাধিস্থ যেন
মহাপ্রাণ নিজ বেগে। ইহাও বুঝিনু
ভাবে না কাহার কথা কেহ, পরস্পরে
চেনে না, চাহে না। নিজে লয়ে তুচ্ছ সবে,
নিজেতে সকলে বদ্ধ একা এই রূপে
নিজ কর্ম্মে নিজ ভাবে রহি'। কিন্তু যবে
পরস্পর পড়ে গায়ে, শিহরি' অন্তরে,
স্তব্ধ বদ্ধ দেহ ভাবে, "এ কি অন্য আমি
পড়ে মোর গায়ে, অতি সুখ এই স্পর্শে।"
ইহাতেই শেষ। ফুটে না সে গুহ্য স্পৃহা
ভাষায়, স্পন্দনে, ধ্যানে।

নিরাশ মানসে
হেরি যেন কারাগৃহ সমস্ত জগৎ।
সহসা মধুর ধ্বনি জাগিল ভিতরে।
"চাও ফিরে, বুঝে নাও প্রকৃতির আশা।
বুঝে নাও জড়-কারাগৃহে মাতৃপ্রাণ,
গুপ্ত অর্থ বুঝে নাও, এ লীলার মাঝে।"
তুলিয়া সুতপ্ত আঁখি অদূরে হেরিনু
প্রান্তরে মানবমূর্ত্তি। বালক বালিকা
পরস্পর আলিঙ্গনে মত্ত এই জড়ে,
নিস্পন্দ এ স্বপুরাজ্যে মুক্ত দুই প্রাণী
অশৃংখল, ধ্যানরত পরস্পর সুখে।
আবার যবনিকা তারা। সে জীবন্ত জড়
আশাহীন পূর্ব্ববৎ বদ্ধ নিজভাবে।
কিন্তু মুক্তনয়ন আমি জড়স্পর্শ হতে
ছদ্মবেশী পুরুষের চিনিনু উদ্দেশ
প্রকৃতির গুপ্ত বাক্য ধরিনু মানসে।
ভরিয়া নয়ন দৃশ্যে আশ্বস্ত ফিরিনু
ধরাধামে।

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

১২শ পর্ব—উত্তর সর্গ

পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

(২)

পূর্ণ তৃপ্তির মহিমা নিয়ে উঠে দাঁড়াল তারা,
নিবিড় এবে হাতে হাত রেখে গাঢ় বন্ধনে,
নির্বাক, আঁখিপরে আঁখি রাখে নির্নিমেষ।
বুক ভরে সত্যবানের নূতন বিস্ময়ে এক,
নয়নে জ্বলে নূতন নৈবেদ্য-শিখা
"কি মহান্ রূপান্তর ঘটেছে তোমার, হে সাবিত্রী,
দীপ্তিময়ী ছিলে তুমি চিরকাল, চিরকাল শুচিশুভ্র দেবী,
মধুর মানুষী অঙ্গ নিয়ে তুমি এবে প্রিয়তর মোর,
পৃথিবীর দানে হয়েছে তা দিব্যতর।
আমার পূজার ইষ্ট তুমি, বাসনা আমার আনত—হবে সে
পূজার নৈবেদ্য, আলিঙ্গনে বেঁধে রেখেছ আমার যত দুরন্তিযান,
দেহ দিয়ে আত্মা দিয়ে অধিকার করেছ আমার জীবন-সাম্রাজ্য,
পুলকের লীলাক্ষেত্র, প্রেমের মধুর সম্পদ,
নৈঃশব্দ্যের বিগ্রহ আমার অন্তরাত্মার মন্দিরে,
উন্মুখী দেবশক্তি, হিরণ্ময়ী অর্ধাঙ্গিনী মোর।
কিন্তু মনে হয় এখন যেন অমেয় তুমি, মানুষী পূজার
ঊর্ধ্বে; কাল পড়ে আছে তোমার চরণের অধস্তলে,
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মনে হয় ক্ষুদ্রাংশ তোমার,
স্তব্ধ আকাশরূপে রয়েছ তুমি—আমি তার অধিবাসী,
চেয়ে দেখ তুমি মোরে নক্ষত্রের নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে,
কিন্তু তবু তুমি আমারে রেখেছ ধরে মর্ত্যপরে,
আমার জীবন হল তোমার স্বপ্নালু চিন্তার অস্ফুট গুঞ্জন,
আমার প্রভাত তোমার চেতনার ভানায় যেন আলোকের ছটা,
দিবস-যামিনী তোমার সুষমার অঙ্গ।
আমার হৃদয় কি তুমি ভুলে নাওনি
তাকে আদরে রেখে দিতে তোমার বুকের নিবিড় আবেষ্টনে?
নীরবতা থেকে সৃষ্টি থেকে আমি জেগে উঠেছি,

তোমার জন্যে আমি নারী হয়েছি জীবনধারণ করতে।
তোমার কল্যাণে আয়ুর পরিধিকে আমার বৃহত্তর করে ধরেছি,
এখন তুমি আমার কাছে নিয়ে এসেছ সুদূর স্বর্গের
অপরিচিত আনন্দ্যসব—তোমার যত দান সীমাহীন।
এসবও তুমি পূর্ণ করবে তোমার পুণ্য উর্ধ্বায়নে,
তবুও আমার মানুষী দেহ আকাঙ্ক্ষা করে তোমার আনন্দ
এখনও আমার জীবন যেন তোমার আশ্রয়ে হয়ে ওঠে একখানি আনন্দের গান,
আমার যৌনসত্তাকে বৃহৎ কর, গভীর কর আশ্রয়ে তোমার।"
স্বর্গের সম্রাজ্ঞী মেনে নিল ইচ্ছা তার,
চরণযুগল তার ধরে আলিঙ্গনে, ধরে রাখে বিগ্রহ যেন আপন কুন্তলরাজির মাঝে,
ঘিরে রাখে যেন প্রেমের মখমল আচ্ছাদনে,
কথা বলে অস্ফুটভাষে বীণার নিক্কণ যেন
"সবই ভিন্ন এখন, সবই তবু রয়েছে একই।
ভগবানকে আমরা মুখোমুখী দেখেছি,
আমাদের জীবন শুরু হল ভগবানকে দিয়ে।
পরমের সঙ্গে সাযুজ্য আমরা বহন করে চলেছি,
আমাদের মর্ত্যজীবনে তাঁর লীলা জেনেছি আমরা।
সেই মহান্ স্পর্শে আমাদের ভালবাসা বহত্তর হয়ে উঠেছে,
প্রণিধান করেছে তার স্বর্গীয় অর্থ,
তবুও তো মর্ত্যপ্রেমের আনন্দ কিছুই হারায়নি তার।
স্বর্গের স্পর্শ আমাদের পৃথিবীকে মুছে দেয় না, তাকে পূর্ণ করে ধরে
আমাদের শরীরের প্রয়োজন পরস্পরের কাছে একই শেষ পূর্ণ পরিণতির মাঝে ;
তবুও আমাদের বুকের মাঝে স্বর্গের প্রচ্ছন্ন ছন্দকে পুনঃপুনঃ করে সঞ্চালিত
আবেগোচ্ছল উভয়ের আমাদের অন্তরঙ্গ মানুষী হৃদয়স্পন্দ।
আমি তো এখনও সেই নারী তোমার কাছে একদিন এসেছিল যে
বনের ধারে, রৌদ্রদীপ্ত পত্রপল্লবের মর্মরমাঝে ;
আমিই তো মন্ত্রনন্দিনী, আমি সাবিত্রী।
আমি যা কিছু ছিলাম, তোমার রয়েছি এখনও তাই,
তোমার চিন্তার তোমার আশার তোমার প্রয়াসের অন্তরঙ্গ সহচর,
সুখদ বৈপরীত্য যত মিলিয়ে ধরব আমি তোমার জন্যে।
আমাদের জীবনে এসে সকল সম্বন্ধেরই হয় বহু-মিলন,
আমি তোমার সাম্রাজ্য যেমন তুমি আমার,
তোমার আকিঞ্চনের অধিশ্বরী ও ক্রীতদাসী,
তোমার চরণাশ্রয়ী অধিকারিণী, তোমার অন্তরাত্মার সহোদরা,
অভাবে জননী তোমার ; তুমি আমার সকল বিশ্ব,
আমার কাম্য পৃথিবী তুমি, চিন্তার বরেণ্য স্বর্গ,

বাস করি যে বিশ্বে, পূজা করি যে দেবতারে।
তোমার দেহ আমার দেহের প্রতিরূপ,
প্রতি অঙ্গ আমার প্রতি অঙ্গে তোমার চাহে প্রতিরূপে তার,
তার হৃদয় উৎস আমার সকল হৃদ্‌স্পন্দের,—
সত্যবান, এই হলাম আমি আর তুমি যা হলে আমার কাছে।
আমাদের উদ্বাহের জীবনধারা শুরু এই নূতন ক'রে,
কোন তৃপ্তি হারায়নি, হারায়নি গভীরতা কোন মর্ত্যভোগের ;
এস, চলে যাই এই নূতন জগৎ পার হয়ে—সে-জগৎ একই রয়েছে।
ফিরে আমরা পেয়েছি তাকে, কিন্তু সবই পরিচিত,
ভগবানের লীলাক্ষেত্র, তাঁর আপন গৃহ ;
তিনি এখানে আপনাকে লুকিয়ে রেখেছেন পাখীর মধ্যে
পশুর মধ্যে মানুষের মধ্যে
নিজের সঙ্গে আবার মধুরভাবে মিলিত হবার জন্যে প্রেমের আশ্রয়ে,
ঐক্যের আশ্রয়ে। জীবনের ছন্দ বয়ে চলে তাঁরই সত্তা অনুসরি,
খুঁজে চলে সে দুঃখ সত্ত্বেও পরস্পরের সুখ।
আমরা পেয়েছি উভয়ে উভয়কে আমাদের পুনরাবিষ্কৃত অন্তরাত্মার
মহান্ জ্যোতির মাঝে, হে সত্যবান।
চল আমরা ফিরে যাই, আকাশে সন্ধ্যা নেমে এল।
শোক মুছে গিয়েছে, প্রশান্ত আনন্দ স্নান করে নিয়েছে
আমাদের দিন-যামিনীর হৃদ্‌দেশে চিরকালের জন্য।
দেখ, দেখ, এই যত জীব অপরূপ জগতে এই !
চল, সবারে দেব আমাদের আনন্দ, আনন্দ আমাদেরই।
আমাদের অন্তরাত্মা আসেনি তো শুধু আমাদেরই জন্যে
অব্যক্তের অবগুণ্ঠন-অন্তরাল হতে,
অজ্ঞেয়ের গভীর অতল হতে
এই দ্বিধাসঙ্কুল পৃথিবীর অবোধ বুকের পরে
মানুষের অন্বেষু জিজ্ঞাসু জীবনধারার মধ্যে,
যুগল জ্বলন্ত অগ্নিশিখা আমরা, আমাদের পথযাত্রার লক্ষ্য নয়
শুধু অদ্বিতীয় সূর্য,
যুগল কিরণলেখা আমরা চলিনা ফিরে আদি জ্যোতির অভিমুখে।
জন্ম আমাদের মানুষের অন্তরাত্মাকে নিয়ে চলতে সত্যের
ও ভগবানের দিকে,
মর্ত্য-জীবনের এই যে বহুরূপী ব্যবস্থা
তাকে কতকটা দেবতার পরিকল্পনার অনুরূপে গড়ে তোলবার জন্যে,
ভগবানের সাক্রপ্যে আরো তুলে ধরবার জন্যে,
ভগবানের দিব্যভাবের নিকটতর ক'রে।"

বুক আর শির তার দুহাতে জড়িয়ে ধরল সাবিত্রী,
আপন উষ্ণ বক্ষপরে যেন তাকে ধরে রাখতে চায়
চিরকাল সম্বৎসরের ধারায়।
ক্ষণকাল তরে উভয়ে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ, তাদের চুম্বন
আর তাদের আবেগনিবিড় আশ্লেষ মিলনবিন্দু যেন
দুটি চেতনার সংমিশ্রণে, চিরকাল এক যারা,
যুগ্ম আত্মা, যুগ্ম দেহ কালধারায় সুখভোগ তরে।
হাতে হাত দিয়ে উভয়ে তখন সেই পুণ্যস্থান হতে সরে চলে যায়
মূক অসম্ভব স্মৃতির ভার বয়ে নিয়ে চলে,
দূরে সবুজের পারে তাদের আরণ্যভবনে
ধীরে চলে তারা বনভূমির অন্তর পার হয়ে
চারিদিকে তাদের অপরাহ্ণ পরিণত হয় সায়াহ্নে ;
আলো চকিতে নেমে আসে উজ্জ্বল ঘুরন্ত সীমান্ত পরে,
পাখীরা সব উড়ে আসে একে একে তাদের আপন কুলায়ে,
দিন আর রাত্রি নুয়ে পড়ে পরস্পরের কোলে।
ধূসর ছায়াময় তরুগুলি দাঁড়িয়ে রয় অন্তিকে ঘিরে চারিদিক
স্বপ্নালু প্রেত যেন সব, রাত্রি নেবে আসে ঘিরে ;
ধূসর-নেত্র ধ্যাননগ্ন গোধূলি শোনে আসে তাদের পদক্ষেপ
সর্বত্র হতে উঠে আসে কণ্ঠস্বর আর গতিধ্বনি
নিশাচরদের আগমনবার্তা নিয়ে।
তারপর ওঠে এক মানুষী কণ্ঠরোল
এতদিন অপরিচিত তাদের নিঃসঙ্গ দিবসরজনীর কাছে,
অধিকার করে মোহমুগ্ধ বিজন অরণ্যভূমি
একসময়ে ছিল যা পুণ্যস্থান একান্তবাসের,
রূঢ়বেগে ভেঙে পড়ে এসে তার অক্ষত সুপ্তির পরে।
গোধূলির যবনিকা ভেদ করে গতীরতর হয় সে আরাব
নিকটতর হয়ে ভেসে আসে বহুকণ্ঠ,
বহুল পদধ্বনি ক্রমে গোচর হয়ে দেখা দেয়,
বর্ণমালার তরঙ্গ যেন এসে পড়ে চোখের উপরে ;
মানুষী জীবনের সমুদ্ভাসিত শ্রমবহুল সমারোহ।
আকাশে তুলে ধরে অগণিত আলোকের ঝলক
বিপুল সমুজ্জ্বল জনসংঘ এক এসে উপস্থিত।
সুগম্ভীর আরাবে জীবনধারা এল দুলে দুলে
বহন করে অজ্ঞাত মুখমণ্ডলের স্রোত,
আপূর্ণ সোনালী কারুকার্যখচিত উষ্ণীষমালায়, সোনালীপাড়ে
ভূষিত পোশাকপরিচ্ছদে,

ঝলমল অলঙ্কারে, উড়ন্ত অঞ্চলের প্রতিধ্বনিতে,
শত শত হস্ত প্রসারিত বনের তরুশাখাবলী ভেদ করে,
শত শত চোখের দৃষ্টি জটিল বনপথে অন্বেষণ-ব্যস্ত।
প্রশান্ত শুভ্রবস্ত্র পুরোহিতশ্রেণী এনেছে তাদের গম্ভীর দৃষ্টির মধুরিমা,
বীরমূর্তি যোদ্ধা সব সনলঙ্কৃত তাদের মহিমান্বিত অস্ত্রশস্ত্রে,
এলো গর্বিত অশ্ববাহিনী ক্ষুরাঘাতে বিদ্রিত করে বনভূমি।
সর্বাগ্রে চলেছে রাজা দ্যুমৎসেন, অন্ধ নয় আর,
নয় স্খলিত-পদ, চোখে তার ফিরে দূরদৃষ্টি—
লভেছে তারা এখন আলোকের পরে আত্মনির্ভর,
গোচর এবে তাদের কাছে বাহ্যজগতের এই ছবি;
দৃঢ়পদে রাজমহিমায় চলে সে মাটির পরে।
পাশে চলে রাণী তার মায়ের চিন্তান্বিত মুখমণ্ডল—
এসেছে সেখানে রূপান্তর, নিতাকার সেই ভারগ্রস্ত দৃষ্টি নাই আর
একদিন যেখানে শ্রান্ত ক্লান্ত পতনোন্মুখ আত্মবল
বহন করেছে প্রিয়জনের দুর্বহ জীবনভার।
ধৈর্যের বিবর্ণতা দিয়েছে তারে এক অন্তর্মুখী দীপ্তি,
সন্ধ্যার সংহত আলোকের নিমীলিত দৃষ্টি
বিদায় গ্রহণ করে, প্রতিবিম্বিত যেখানে আগামী ওই যে নবারুণ সন্তান তার।
বিলীয়মান দীপ্তিসম্ভারের উচ্ছলতা
ধ্যানশান্ত ভবিষ্যবাণী যেন বয়ে আনে উষার আগমনী,
রাণীমাতার জীবন তেমনি রয়েছে সেই আশা পোষণ করে
ধীরে তেমনি ডুবে চলেছে তার জীবন-আকাশের শান্ত ঐশ্বর্যের কোলে।
এখন তবে সর্বাগ্রে দৃষ্টি তার খোঁজে তার সন্তানদের প্রিয়রূপ।
তবে যেমনই দেখা দিল সেই যুগল-সৌন্দর্য
আকাশ-বাতাস দুলে ওঠে উল্লেল ক্রমবর্ধমান কণ্ঠধ্বনির প্রবাহে,
জনকজননী ছুটে চলে বেগে তাদের সন্তানের সমীপে,—
সে সন্তান জীবন এনেছে তাদের যারা দিয়েছিল জীবন তার,—
তাদের বাহুপাশে আবদ্ধ এখন সে।
স্নিগ্ধকণ্ঠে কহে দ্যুমৎসেন, সত্যবানে করি তিরস্কার যেন:
"ভাগ্যবান দেবতারা চেয়ে দেখে আমায় আজ,
এসেছিল তারা সাম্রাজ্যের সন্ধানে আর স্বর্গের আলো ভরে।
কিন্তু তুমি ছিলে কোথা? আনন্দকে তুমি নিপীড়িত করেছ
আশঙ্কার মলিন ছায়া দিয়ে, হে সন্তান আমার, আমার জীবন।
কোন্ ভয়ে তুমি আশ্রয় নিয়েছিলে অরণ্যের ঘনায়মান অন্ধকারে?
অথবা আনন্দই-বা পথে যেতে যেতে কেন ভুলে যাবে
যে তোমাকে ছাড়া আমার চোখদুটি নিরর্থক মণ্ডলমাত্র,

আলো দেখে তারা পুলকিত তোমাকে দেখবে বলে?
তোমার এ কাজ তোমার উপযুক্ত তো নয়, সাবিত্রী!
তোমার স্বামীকে তুমি তো সঙ্গে করে আমার বাহুপাশে এনে দাওনি?
তুমি তো জান আমার পাশে যখন সে তখনই আমার খাদ্যে রুচি,
তারই স্পর্শের জন্য সকাল-সন্ধ্যা
সুখে কাটাই আমি আমার অবশিষ্ট দিনগুলি?"
সত্যবান মৃদুহাস্যে দেয় প্রত্যুত্তর:
"ঠিক! ওরই সব দায়, ওই একমাত্র কারণ।
ওরই মায়াজালে আমাকে ঘিরে ধরেছে চারিদিকে।
এই দেখ না, বেলা দ্বিপ্রহরে মাটির এই যন্ত্রখানি ছেড়ে দিয়ে
আমি চলে গিয়েছিলাম সুদূর আনন্দরাজ্যের কোলে,
তবুও রয়ে গিয়েছি বন্দী তার সোনার মুষ্টিতলে,
ফিরে আবার আমি পায়ে চলেছি ক্ষুদ্র পাহাড়টির উপর
যাকে তোমরা বল সবুজ পৃথিবী,
তোমাদের ক্ষণজীবী সূর্যের কণিকার মধ্যে
এসে আবার সুখী জীবন যাপন করি ব্যস্তসমস্ত মানুষের কর্মাবলীর মধ্যে।"
সকলের দৃষ্টি তখন বিস্ময়ে পড়ে গিয়ে সেই যেখানে
সোনার ছটা আরও রঙ্গিন হয়ে উঠেছে সাবিত্রীর গণ্ডপরে,
নিমীলিত নয়নে ওই যে মহিমাময়ী মধুময়ী শিখাটি,
সকলেরই বুকে একই চিন্তার ঢেউ বয়ে যায়
"পৃথিবীর না স্বর্গের কোন্ এই অপরূপ জ্যোতি
মানুষী সত্যবানের বাহুপাশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে,
সন্ধ্যার আলো-আঁধারে কোন্ এ উজ্জ্বল রেখা?
এ যদি সেই নারী যার কথা শুনে এসেছে জগৎ,
তবে যে কোন অভিনব আবির্ভাবে আর বিস্ময় কি।
আনন্দের স্পর্শে সহজে ঘটে যায় বিস্ময়ের পর বিস্ময়—
তারই হৃদয়ের যাদুকরী শক্তির শক্তি এই।"
তারপরে কথা বলে, মনে হয় প্রবীণ পুরোহিত সে জ্ঞানী সে,
"নারী-হৃদয় তুমি, কোন্ আলো কোন্ শক্তি নিয়ে এসেছ,
কত ঘটিয়ে চলেছ রূপান্তর সব এই দিনে,
আমাদের সম্মুখে খুলে ধরেছ সুখীতর দিগন্ত এক?"
নারীর চোখে পক্ষ্মাবলী ডানা মেলে ঊর্ধ্বে উঠে যায়
সংহত হয় একখানি দৃষ্টির মধ্যে যেখানে ধরা দিয়েছিল অমর বস্তুসব,
এখন পুলকিত তারা, মানুষী রূপ আনন্দের বিষয় তাদের।
তারা চায় এখন তাদের গভীর শিরার মাতৃ-হৃদয়ে
এই যত জীব সব হবে তারই আপনার জীবন—

মুদিল চোখের পাতা, ঢেকে দিল দিনের আলো। মৃদুলকণ্ঠে কহিল সে
"হৃদয় আমার জেগেছে তার অর্থ নিয়ে,
ভালবাসা আর একাত্ম-অনুভব এই হল সার্থক জীবন,
আমাদের হিরণ্ময় রূপান্তরের এই যাদু এই যে পূর্ণ সত্য
তাকেই শুধু জানি, তাকেই কামনা করি, হে ঋষিবর।"
তার দিকে চেয়ে তার অতি জ্যোতির্ময় কথাগুলি শুনে বিস্মিত হয়ে
ফিরে চলে যায় সকলে অস্তাচল অভিমুখে দ্রুত ঘনায়মান রাত্রির অন্ধকারে।
বনান্তের জটিল লতাগুল্ম ভেদ করে এল তারা মুক্ত বাহিরে
ঘুমন্ত পৃথিবীর আঁধারের কোলে,
পার হয়ে গেল তারা অস্ফুট নিদ্রালু প্রান্তর সব।
কলরব, গতিধারা, মানুষের পদধ্বনি
ভেঙে দেয় রাত্রির নিঃসঙ্গতা। অশ্বের হ্রেষারব
উঠে চলে অস্পষ্ট ধ্বনিসম্ভূল জীবনসাগর হতে,
তার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল উদ্বেল হয়ে ওঠে
অশ্রুক্ষুব্ধচঞ্চল আর রথের গৃহমুখী কণ্ঠরব।
শ্বেতাশ্ববাহিত সমুন্নত রথে এক
চঞ্চল মশালের আলোকের তলে
আসীন সত্যবান-সাবিত্রী হাতে হাত দিয়ে,
শোনে তারা শোভাযাত্রা-সঙ্গীত আর উদ্বাহের মন্ত্রধ্বনি,
চলেছে তারা যেখানে তাদের অপেক্ষায় রয়েছে বহুলকণ্ঠমন্ত্রিত মানুষী জগৎ।
ঊর্ধ্বে অগণিত তারকারাজি তাদের ছায়াময় প্রসারে
এঁকে চলেছে অন্ধকারে আলোকের পথরেখা।
ঘুরে নেবে চলে যখন তারা দক্ষিণের দিক্‌চক্রবালে,
তার আপন ধ্যানমগ্ন ললাটের জ্যোতির্মণ্ডলে হারিয়ে গেল রাত্রি,
চন্দ্রিমা উঠে এল তার জ্যোৎস্নাখচিত স্বর্গের স্বপ্ন নিয়ে
রজতশুভ্র শান্তির মাঝে, ছড়িয়ে দিল তার আলোর রাজত্ব।
নৈঃশব্দ্যের মাঝে ধ্যানমগ্ন সে চিন্তায় এক
গভীরে রক্ষা করে চলেছে তাকে আলোকের রহস্যঘনাভালে,
বক্ষতলে পোষণ করে এক মহত্তর ঊষা।

সমাপ্ত

বেদমন্ত্র

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুহ

৩য় মণ্ডল—১ম সূক্ত

১। সোমস্য মা তবসং বক্ষ্যগ্নে বহ্নিং চকর্থ বিদথে যজধ্যৈ।
দেবাঁ অচ্ছা দীদ্যদ্ যুজে অদ্রিং শমায়ে অগ্নে তনূং জুষস্ব ॥১॥

সোমস্য—সোমরসের	দেবান্—দেবতাদের
মা—আমাকে	অচ্ছা—অভিমুখে
তবসম্—বলবান	দীদ্যৎ—দীপ্যমান (আমি)
বক্ষি—বহন কর	যুজে—নিযুক্ত করি
অগ্নে—হে অগ্নি	অদ্রিম্—প্রস্তরকে
বহ্নিম্—বাহক	শমায়ে—সমাপ্তির জন্য, শান্তির জন্য
চকর্থ—তুমি করেছ	অগ্নে—হে অগ্নি
বিদথে—জ্ঞান অর্জনে	তনূম্—শরীরকে
যজধ্যৈ—যজ্ঞসাধনের জন্য	জুষস্ব—সপ্রেমে আলিঙ্গন কর

সোমরসের বলবান প্রখরতা বাহক করে জ্ঞানসাধনে যজ্ঞ করবার জন্য, হে অগ্নি, তুমি আমাকে ধারণ করে চল।

দেবতাদের উদ্দেশ্যে উদ্ভাসিত আমি, শান্তিসিদ্ধির জন্য পাষাণকে আমি সক্রিয় করে ধরেছি, হে অগ্নি, আমার দেহকে তুমি সানন্দে জুড়ে ধর ॥১॥

Notes: অদ্রি=পাষাণ=জড়স্তর, জড়দেহ

২। প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতাং গীঃ সমিদ্ভিরগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসুর্বিদথা কবীনাং গৃৎসায় চিৎ তবসে গাতুমীষুঃ ॥২॥

প্রাঞ্চম্—অগ্রগামী, সম্মুখগামী, প্রগতিশীল	দিবঃ—দ্যুলোকসব
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে	শশাসুঃ—ঘোষণা করেছে, প্রকাশ করেছে
চকৃম—আমরা করেছি	বিদথা—জ্ঞানসব
বর্ধতাম্—বৃদ্ধি পায় যেন	কবীনাম্—দ্রষ্টাদের
গীঃ—গীর্বাণী	গৃৎসায়—স্তোতাদের জন্য, মন্ত্রবিৎদের জন্য, স্তোতৃদের জন্য, বাণীবহদের জন্য
সমিদ্ভিঃ—সমিধ দিয়ে	চিৎ—আর

অগ্নিম্—অগ্নিকে
নমসা—নমঃ দিয়ে, প্রণতি দিয়ে
তবসে—বলবানদের জন্য
পাতবৈ—পথ চলবার জন্য
ঈষুঃ—সংকল্প করেছে।

যজ্ঞকে আমরা গড়ে তুলেছি সম্যক্ গতি দিয়ে, যাক যেন বৃদ্ধি পায় আমাদের মধ্যে সমিধ অর্পণ করে, প্রণতি দিয়ে তারা অগ্নিকে কর্মপর করে তুলেছে;

দ্যুলোক সব প্রকাশ করে ধরেছে দিব্যদ্রষ্টাদের জ্ঞানরাজি, তারা সংকল্প নিয়েছে বলবানদের আর মন্ত্রবিৎদের জন্য চলবার পথ করে দেবে ॥২॥

৩। ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো দিবঃ সুবন্ধুর্জনুষা পৃথিব্যাঃ।
অবিন্দন্নু দর্শতমপ্সুরন্তর্দেবাসো অগ্নিমপসি স্বস্তৃণাম্ ॥৩॥

ময়ঃ—আনন্দ, পরমসুখ
(সুখম্—সায়ণ)
দধে—প্রতিষ্ঠিত করে
মেধিরঃ—মেধাবান, প্রাজ্ঞ (সায়ণ)
পূতদক্ষঃ—শুদ্ধ বিচার, শুদ্ধ নিরীক্ষা
দিবঃ—স্বর্গের
সুবন্ধুঃ—সুবন্ধু
জনুষা—জন্ম হতে
পৃথিব্যাঃ—পৃথিবীর
অবিন্দন্—আবিষ্কার করেছে
উ ইতি—ও
দর্শতম্—দৃষ্টিমান, চক্ষুষ্মান
অপ্সুঃ—জলরাশির
অন্তঃ—অন্তরে
দেবাসঃ—দেবতারা
অগ্নিম্—অগ্নিকে
অপসি—কর্মের মধ্যে (কর্মণি—সায়ণ)
স্বস্তৃণাম্—ভগ্নিদের, স্বস্তৃদের

পরমসুখ সে প্রতিষ্ঠিত করেছে, মেধাবান সে, বিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি তার, জন্ম হতেই পৃথিবীর ও দ্যুলোকের একান্ত বন্ধু, দৃষ্টিমান অগ্নিদেবকে দেবতারা আবিষ্কার করেছে জলরাশির অন্তরে, ভগ্নিদের কর্মধারার মধ্যে ॥৩॥

৪। অবর্ধয়ন্থৎসুভগং সপ্ত যহ্বীঃ শ্বেতং জজ্ঞানমরুষং মহিত্বা।
শিশুং ন জাতমভ্যারুরশ্বা দেবাসো অগ্নিং জনিমন্বপুষ্যন্ ॥৪॥

অবর্ধয়ন্—তারা বর্ধিত করেছে
সুভগম্—পরম আনন্দময়কে
সপ্ত—সপ্ত
যহ্বীঃ—তেজস্বিনী, মহাস্রোতস্বিনী
(মহতী নদী—সায়ণ)
শ্বেতম্—শ্বেতবর্ণ
জজ্ঞানম্—সঞ্জাত
অরুষম্—রক্তবর্ণ
মহিত্বা—মহত্ত্ব দিয়ে
শিশুম্—শিশুর
ন—মত
জাতম্—সদ্যোজাত
অভি+আরুঃ—অভ্যাগমন করে, অভিমুখে চলে (তারা)
অশ্বাঃ—অশ্বসকল
দেবাসঃ—দেবতারা
অগ্নিম্—অগ্নিকে
জনিমন্—জন্মিলে
বপুষ্যন্—শরীরী করেছে, দেহদান করেছে

সপ্ত মহানদীরা পরম আনন্দময়কে পুষ্ট করে চলেছে, জন্মকালে শ্বেতবর্ণ সে, মহত্বে রক্তবর্ণ সে, অশ্বেরা তার দিকে ছুটে চলেছে সদ্যোজাত শিশুর দিকে যেন, দেবতারা অগ্নিকে জন্মকালে দিল তার শরীর ॥৪॥

৫। শুক্রেভিরঙ্গৈ রজ আততন্বান্ ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ।
শোচির্বসানঃ পর্যায়ুরপাং শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীরনূনাঃ ॥৫॥

শুক্রেভিঃ—শুভ্র	শোচিঃ—দীপ্তিকে
অঙ্গৈঃ—অঙ্গ দিয়ে, অঙ্গসব দিয়ে	বসানঃ—আচ্ছাদন ক'রে, বসন পরিয়ে
রজঃ—অন্তরিক্ষলোক	পরি—চারিদিকে
আততন্বান্—প্রসারিত করে ধরেছে	আয়ুঃ—প্রাণধারাকে
ক্রতুম্—ইচ্ছাশক্তিকে, সঙ্কল্পকে	অপাম্—জলরাশির
পুনানঃ—শুদ্ধ করে	শ্রিয়ঃ—শোভা
কবিভিঃ—দৃষ্টিশক্তিদের দিয়ে	মিমীতে—গড়ে তোলে
পবিত্রৈঃ—বিশুদ্ধ যারা	বৃহতীঃ—বৃহৎ
	অনূনাঃ—পরিপূর্ণ (সম্পূর্ণাঃ—সায়ণ)

তার শুভ্র অঙ্গরাজি দিয়ে অন্তরিক্ষলোক সে প্রসারিত করে ধরেছে ; তার ইচ্ছাশক্তিকে শোধন করেছে বিশুদ্ধ দিব্যদৃষ্টিসকল দিয়ে, দীপ্তিকে জলধারার জীবনীশক্তির চারিদিকে বস্ত্রের মত পরিয়ে দিয়েছে : তার বিপুল পূর্ণ শোভা গড়ে তুলেছে সে ॥৫॥

৬। বব্রাজা সীমনদতীরদব্ধা দিবো যহ্বীরবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ ॥৬॥

বব্রাজ—বিচরণ করে	সনা—সনাতন
সীম্—চারিদিক ঘিরে	অত্র—এখানে
অনদতীঃ—ভক্ষণ করে না, গ্রাস করে না যারা	যুবতয়ঃ—যুবতীরা
অদব্ধাঃ—অদমিত, অক্ষত	সযোনীঃ—একই জঠরগত, অভিন্ন উৎস যাদের
দিবঃ—দ্যুলোকের	একম্—সেই এক
যহ্বীঃ—তেজস্বিনী	গর্ভম্—গর্ভস্থ শিশু, ভ্রূণকে
অবসানাঃ—বস্ত্রহীনা নয়, বিবস্ত্রা নয়	দধিরে—ধারণ করে
অনগ্নাঃ—নগ্নাও নয়	সপ্ত—সপ্ত
	বাণীঃ—বাণী

স্বর্গে তেজস্বিনীদের চারিদিকে সে পরিভ্রমণ করে, অনাহারী তারা, অক্ষতা তারা, বিবস্ত্রাও নয়, নগ্নাও নয়, এখানেই চিরন্তনী যুবতীরা, অভিন্ন উৎস থেকে তারা, সেই সপ্ত বাণী, তারা গর্ভে ধারণ করেছে একই শিশু ॥৬॥

৭। স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা ঘৃতস্য যোনৌ সরথে মধূনাম্।
অস্মুরত্র ধেনবঃ পিন্বমানা মহীদস্যস্য মাতরা সমীচী ॥৭॥

স্তীর্ণাঃ—সর্বত্র বিক্ষিপ্ত
অস্য—তার
সংহতঃ—সংহত, দৃঢ়বদ্ধ
বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপী
ঘৃতস্য—তপ্ততেজের
যোনৌ—জঠরে, উৎসে
সরথে—স্রোতধারায়
মধূনাম্—মধুরতাসকলের
অস্মুঃ—রয়েছে, স্থান পেয়েছে
অত্র—এখানে
ধেনবঃ—ধেনুরা, গাভীরা
পিন্বমানাঃ—পরিপুষ্ট হয়ে
মহী—মহতী
দস্যস্য—কর্মকর্তার
মাতরা—দুটি মাতা
সমীচী—সহযোগিনী

তার তেজবাহিনী বিস্তৃত হয়েছে, বিশ্বরূপী তারা, তারা রয়েছে তপ্ততেজের উৎসস্থানে মধুময় প্রস্রবণে, সেখানেই রয়েছে পরিপুষ্ট ধেনুকুল, এই দিব্যকর্মীর মহতী সহযোগিনী যুগলমাতা ॥৭॥

৮। বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদৌদ্ দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন ॥৮॥

বভ্রাণঃ—ঊর্ধ্বায়িত
সূনো—পুত্র
সহসঃ—বলের, শক্তির
বি-অদৌৎ—তুমি সর্বত্র
উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছ
দধানঃ—ধারণ করে
শুক্রা—শুভ্র
রভসা—পুলকপূর্ণ
বপূংসি—দেহসব
শ্চোতন্তি—বয়ে চলে
ধারা—ধারা,
মধুনঃ—মধুর
ঘৃতস্য—তপ্ত তেজের
বৃষা—বৃষরাজ
যত্র—যেখানে
ববৃধে—বৃদ্ধিলাভ করে
কাব্যেন—জ্ঞানদৃষ্টির সহায়ে

হে শক্তিপুত্র, ঊর্ধ্বায়িত হয়ে তুমি সর্বত্র উদ্ভাসিত, তুমি ধারণ করেছ তোমার শুভ্র আনন্দময় দেহগুলি। মধুময় তেজোময় ধারা প্রবাহিত হয়েছে যেখানে বৃষরাজ বর্ধিত হয়েছেন জ্ঞানদৃষ্টির সহায়ে ॥৮॥

৯। পিতুশ্চিদূধর্জনুষা বিবেদ ব্যস্য ধারা অসৃজদ্ বি ধেনাঃ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্দিবো যহ্বীভির্ণ গুহা বভূব ॥৯॥

পিতুঃ—পিতার
চিৎ—নিশ্চয়
ঊধঃ—পয়োধর
জনুষা—জন্ম হতে, জন্মকালে
বিবেদ—আবিষ্কার করেছে, জেনেছে
গুহা—গূঢ়স্থানে
চরন্তম্—বিচরণশীলকে
সখিভিঃ—সখাদের সঙ্গে
শিবেভিঃ—মঙ্গলময় যারা
দিবঃ—দ্যুলোকের

বি—ব্যাপকভাবে
অস্য—এর
ধারা:—ধারা
অস্রজৎ—ছড়িয়ে দিয়েছে
বি—ব্যাপকভাবে
যেনা:—স্রোতরাজি, ধেনু বা গাভীকুল
যন্নীতি:—তেজধারাদের সঙ্গে
ন—না, নয়
গুহা—গুহ্য
বভূব—হয়

জন্মকাল হতেই সে জেনেছে পিতার পয়োধর, তার ধারা চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিকে তার ধেনুমুখ ; সে জেনেছে তাকে যে গুহ্যস্থানে বিচরণ করে তার মরুদ্বয় সখাদের সঙ্গে, স্বর্গের তেজস্বিনী স্রোতদের সঙ্গে, আপনি কিন্তু সে নিগূঢ় হয়ে পড়ে না ॥৯॥

১০। পিতুশ্চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে পূর্বীরেকো অধয়ৎ পীপ্যানা।
বৃক্ষে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধু উভে অস্মৈ মনুষ্যেঽনি পাহি ॥১০॥

পিতু:—পিতার
চ—আর
গর্ভম্—শিশুসন্তানকে
জনিতু:—জনয়িত্রার
চ—আর
বভ্রে—ধারণ করেছে, বহন করে চলেছে
পূর্বী:—বহুকে, অনেককে
এক:—এক সে
অধয়ৎ—পান করেছে
পীপ্যানা:—যারা তাকে স্তন্যে পুষ্ট করেছে
বৃক্ষে—বৃষরাজির জন্য
সপত্নী—পত্নীযুগল
শুচয়ে—শুচিস্নানের জন্য
সবন্ধু—সমান বন্ধু, একই বন্ধু বা মিত্র যাদের
উভে—উভয়ে
অস্মৈ—এর জন্য
মনুষ্যে—মানুষী সত্তার মধ্যে
নি-পাহি—রক্ষা করে চলে

তার পিতা যে, জনয়িত্রী যে, তার সন্তানকে বহন করে চলে সে—সেই এক যে অনেকের স্তন্যপানে পরিপুষ্ট হয়েছে, এই শুচিস্নান বৃষরাজের জন্য একবন্ধু পত্নীযুগল তোমরা মানুষের মধ্যে উভয়কে রক্ষা করে চল ॥১০॥

১১। উরৌ মহাঁ অনিবাধে ববর্ধাপ্রথো অগ্নিং যশস: সং হি পূর্বী:।
ঋতস্য যোনাবশয়দ্ দমূনা আসীনাসগ্নিরপসি স্বস্রৃণাম্ ॥১১॥

উরৌ—বিস্তৃতির, বৃহতের মধ্যে
মহান্—মহান
অনিবাধে—বাধাহীনের মধ্যে
ববর্ধ—বৃদ্ধি পায় সে
আপ:—জলরাশি
অগ্নিম্—অগ্নিকে
যশস:—কীর্তিমানী, প্রখ্যাত
ঋতস্য—সত্যের
যোনৌ—জঠরে
অশয়ৎ—শায়িত রয়েছে
দমূনা:—স্বগৃহবাসী হয়ে, স্বগৃহে যেন
আসীনান্—সন্নিভূত, সহযোগিনীদের
অগ্নি:—অগ্নি
অপসি—কর্মে

সম্—সম্বন্ধ করে স্বস্তৃণাম্—ভগিনীদের
হি—নিশ্চয় কারণ পূর্বীঃ—বহুল

বৃহৎ হয়ে সে উঠেছে বাধাহীন মহাকাশে বহুল মহিমাময় জলধারা অগ্নিকে পুষ্ট করেছে, সত্যের জঠরে অগ্নি শায়িত নিজগৃহে যেন, সহযোগী ভগিনীদের কর্মের মধ্যে ॥১১॥

১২। অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাং দিদৃক্ষেয় সূনবে ভাঋজীকঃ।
উদুস্রিয়া জনিতা যো জজানাপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ ॥১২॥

অক্রঃ—অনতিক্রমণীয়, সমূর্ধ্ব উস্রিয়াঃ—আলোকযুথ
ন—যেন জনিতা—জন্মদাতা
বভ্রিঃ—ধারক, ভর্তা যঃ—যে
সমিথে—সংযোগস্থলে উৎজজান—জন্ম দিয়েছে
মহীনাম্—মহতীদের (মহতী নদীদের) অপাম্—জলধারার
দিদৃক্ষেয়ঃ—দর্শনের জন্য, দর্শনকামী গর্ভঃ—সন্তান
সূনবে—পুত্রের জন্য নৃতমঃ—পরম শক্তিমান
ভাঃ ঋজীকঃ—ঋজুপ্রভা যহ্বঃ—ঊর্জস্বান
অগ্নিঃ—অগ্নি

সমুচ্চ শিখর যেন সে, ভর্তা সে, মহতী স্রোতস্বিনীদের সঙ্গমস্থলে ঋজুপ্রভা তার, দৃষ্টি রয়েছে সন্তানের অভিমুখে ; জন্মদাতা সে জন্ম দিয়েছে জ্যোতির্ময় যূথরাজিকে, জলধারার সন্তান সে, পরম ওজস্বী, পরম তেজস্বী অগ্নি সে ॥১২॥

১৩। অপাং গর্ভং দর্শতমোষধীনাং বনা জজান সুভগা বিরূপম্।
দেবাসশ্চিন্মনসা সংহি জগ্মুঃ পনিষ্টং জাতং তবসং দুবস্যান্ ॥১৩॥

অপাম্—জলরাশির দেবাসঃ—দেবতারা
গর্ভম্—সন্তান চিৎ—অবধি
দর্শতম্—প্রিয়দর্শী, দৃষ্টিময়, চক্ষুষ্মান মনসা—মনের আশ্রয়ে
ওষধীনাম্—ওষধীসকলের সম্-জগ্মুঃ—সম্মিলিত হয়েছে
বনা—বরণীয়, কাম্য হি—নিশ্চয়ই
জজান—জন্ম দিয়েছে পনিষ্টম্—আরাধ্য, (স্তুত্য—সায়ণ), কর্মঠ
সুভগা—আনন্দময় জাতম্—জন্মমাত্র
বিরূপম্—বিবিধ রূপময় তবসম্—বলবান
দুবস্যান্—কর্মে নিযুক্ত করে, ক্রিয়াশীল করে বহে

জলরাশির সন্তান, ওষধীদের সন্তান, সেই দৃষ্টিময়কে বহুরূপে জন্ম দিয়েছেন প্রীতিময় আনন্দময় যিনি, দেবতারা অবধি মনের আশ্রয়ে সেই অগ্নির মধ্যে সম্মিলিত হয়েছেন, জন্ম হতেই বলশালী যে, কর্মকৃৎ যে, কর্মেই তাকে নিযুক্ত করেছে ॥১৩॥

১৪। বৃহন্ত ইৎ ভানবো তঞ্জীকনগ্নিং সচন্ত বিদ্যুতো ন শুক্রাঃ।
গুহেব বৃক্ষং সদসি স্বে অন্তরপার উর্বে অমৃতং দুহানাঃ ॥১৪॥

বৃহন্তঃ—বৃহৎ	গুহা ইব—গুহার যেন
ইৎ—নিশ্চয়	বৃক্ষম্—সমৃদ্ধ হয়েছে, বৃদ্ধিলাভ করেছে
ভানবঃ—সূর্যদীপ্তিরাজি	সদসি—গৃহে
তাঃ তঞ্জীকন্—তাঁরা তাঁর প্রভা	স্বে—নিজের
অগ্নিম্—অগ্নিকে	অন্তঃ—অন্তরে
সচন্ত—সংযুক্ত হয়ে আছে	অপারে—অপারে
বিদ্যুতঃ—বিদ্যুৎ	উর্বে—উর্ধ্বে
ন—যেন	অমৃতম্—অমৃতকে
শুক্রাঃ—শুভ্র	দুহানাঃ—দোহন করে

বৃহৎ সূর্যদীপ্তিসব শুভ্র বিদ্যুৎ-লেখার মত এই শুক্রপ্রভ অগ্নিকে ঘিরে আছে। সে বেড়ে উঠেছে অন্তরে গুহার মধ্যে যেন অপার বৃহতে তার নিজের ভবনে, অমৃত দোহন করে তারা ॥১৪॥

১৫। ইড়ে চ ত্বা যজমানো হবির্ভিরীড়ে সখিত্বং সুমতিং নিকামঃ।
দেবৈরবো বিমীহি সং জরিত্রে রক্ষা চ নো দম্যেভিরণীকৈঃ ॥১৫॥

ইড়ে—পূজা করি, কামনা করি	দেবৈঃ—দেবতাদের সহায়ে
চ—আরও	অব—সংরক্ষণ
ত্বা—তোমাকে	সম্-বিমীহি—গড়ে তোল, রূপদান কর
যজমানঃ—যজ্ঞসাধক (আমি)	জরিত্রে—পূজকদের জন্য
হবির্ভিঃ—সকল আহুতি দিয়ে	রক্ষা—রক্ষা কর
ইড়ে—কামনা করি	চ—আর
সখিত্বম্—(তোমার) সখ্য	নঃ—আমাদের
সুমতিম্—(আর) সুমতি, সত্য মানস	দম্যেভিঃ—গৃহবাসীদের
নি কামঃ—একান্তভাবে, পরম কামনা নিয়ে	অণীকৈঃ—বাহিনীদের সহায়ে

তোমায় আমি কামনা করি আহুতি দিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি, তোমার সখিত্ব তোমার বরিষ্ঠমতি আমি কামনা করি একান্তভাবে, দেবতাদের সহায়ে তোমার পূজারীদের জন্য গড়ে তোল তাদের রক্ষাকবচ, রক্ষা কর আমাদের তোমার আপন গৃহের সৈন্যবাহিনী দিয়ে ॥১৫॥

১৬। উপক্ষেতারস্তব সুপ্রণীতেঽগ্নে বিশ্বানি ধন্যা দধানাঃ।
সুরেতসা শ্রবসা তুজমানা অভি ষ্যাম পৃতনার্যুরদেবান্ ॥১৬॥

উপক্ষেতারঃ—সমীপবাসীরা	সুরেতসা—পূর্ণ স্রোতা
তব—তোমার	শ্রবসা—অনুপ্রেরণা দিয়ে

সুপ্রণীতে—হে নেতাশ্রেষ্ঠ
অগ্নে—হে অগ্নি
বিশ্বানি—যাবতীয়
ধন্যা—ধনরাশি
দধানাঃ—ধারণ করে
তুজানাঃ—পরিপ্লাবন করে
অতি সাম—পরাভূত করি যেন, অভিভূত করি যেন
পৃতনায়ূন্—উপদ্রবকারী (সায়ণ) শত্রুবাহিনীকে
অদেবান্—অদিব্য, দেবশত্রু

আমরা তোমার স্বগৃহবাসী, হে নেতাশ্রেষ্ঠ ; হে অগ্নি, বিশ্বসম্পদ তুমি নিয়ে এসেছ তোমার অনুপ্রেরণার পূর্ণ ধারায় পরিপ্লাবিত করে, আমরা যেন অদিব্য শত্রুসেনাদের অভিভূত করি ॥১৬॥

১৭। আ দেবানামভবঃ কেতুরগ্নে মন্দ্রো বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্।
প্রতির্মতী অবাসয়ো দমূনা অনু দৈব্যান্ রথিরো যাসি সাধন্ ॥১৭॥

দেবানাম্—দেবতাদের
আ-অভবঃ—পূর্ণভাবে হয়েছ
কেতুঃ—জ্ঞানরেখা, প্রত্যক্ষ চেতনা-
অগ্নে—হে অগ্নি
মন্দ্রঃ—আনন্দময়
বিশ্বানি—যাবতীয়
কাব্যানি—জ্ঞানদৃষ্টি
বিদ্বান্—জ্ঞানময়
মর্তান্—মর্ত্যজীবদের
প্রতি-অবাসয়—তুমি স্থাপন করেছ, প্রতিষ্ঠিত করেছ
দমূনা—সেই আবাসে, গৃহে
দৈব্যান্—দেবতাদের
রথিরঃ—রথী হয়ে
অনু-যাসি—অনুসরণ করে যাও
সাধন্—লক্ষ্যসাধন করে, কর্ম করে

তুমি দেবতাদের সুখময় প্রত্যক্ষ চেতনা হয়ে উঠেছ, হে অগ্নি, যাবতীয় জ্ঞানদৃষ্টি তোমার জ্ঞাত, মর্ত্য জীবসকলকে সেই গৃহে আবাস দিয়েছ, রথী হয়ে দেবতাদের তুমি অনুসরণ করে চলেছ লক্ষ্য সাধন করে ॥১৭॥

১৮। নি দুরোণে অমৃতো মর্ত্যানাং রাজা সসাদ বিদথানি সাধন্।
ঘৃতপ্রতীক উর্বিয়া ব্যদ্যৌদগ্নির্বিশ্বানি কাব্যানি বিদ্বান্ ॥১৮॥

দুরোণে—তোরণযুক্ত গৃহে
অমৃতঃ—অমর
মর্ত্যানাম্—মর্ত্যজীবদের
রাজা—রাজা হয়ে
নি-সসাদ—আসন গ্রহণ করেছে
বিদথানি—জ্ঞানের বিষয়সব
সাধন্—সংসিদ্ধ করে, পরিপূর্ণ করে
ঘৃতপ্রতীকঃ—উজ্জ্বল বা তেজোময় মুখ
উর্বিয়া—বিশাল, বিস্তীর্ণ, বৃহৎ
বি-অদ্যৌৎ—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চারিদিক
অগ্নিঃ—অগ্নিদেব
বিশ্বানি—যাবতীয়
কাব্যানি—জ্ঞানদৃষ্টি
বিদ্বান্—জ্ঞাত হয়ে, জ্ঞানলাভ করে

মর্ত্যদের সত্যোরণ গৃহে অমর সে রাজা হয়ে আসন নিয়েছে, জ্ঞানের বিষয় যত সংসিদ্ধ করে দীপ্তদর্শী সে বিস্তৃত হয়ে চারিদিক উদ্ভাসিত করে ধরেছে, যাবতীয় জ্ঞানদৃষ্টির জ্ঞাতা সে ॥১৮॥

১৯। আ নো গহি সখ্যেভিঃ শিবেভির্মহান্ মহীভিরূতিভিঃ সরণ্যান্।
অস্মে রয়িং বহুলং সন্তরুত্রং সুবাচং ভাগং যশসং কৃধী নঃ ॥১৯॥

আ-গহি—এস কাছে	অস্মে—আমাদের মধ্যে
নঃ—আমাদের	রয়িম্—সম্পদ
সখ্যেভিঃ—সখাভাবসমূহ নিয়ে	বহুলম্—বহুল, বহু
শিবেভিঃ—মঙ্গলময়	সন্-তরুত্রম্—সম্যক ত্রাতা, সর্বতারণ কর্তা
মহান্—মহান (তুমি)	সু-বাচম্—সুবাক্যগঠিত, নির্দোষ বাঙ্ময়
মহীভিঃ—মহান সব	ভাগম্—ভোগ্য অংশ
ঊতিভিঃ—সংরক্ষণ নিয়ে	যশসম্—মহিমাময়, মহনীয়
সরণ্যান্—দ্রুতগতিশীল	কৃধী—সৃষ্টি কর
	নঃ—আমাদের

আমাদের সমীপে সত্বরে চলে এস তুমি তোমার মঙ্গলময় সখাভাবসব নিয়ে, মহান তুমি, তোমার মহনীয় রক্ষণশক্তিসব নিয়ে আমাদের মধ্যে সৃষ্টি কর আমাদের জন্য আমাদের পূত বাঙ্ময় পরিত্রাতা মহিমাময় ভোগ্য অংশ ॥১৯॥

২০। এতা তে অগ্নে জনিমা সনানি প্র পূর্ব্যায় নূতনানি বোচম্।
মহান্তি বৃষ্ণে সবনা কৃতেমা জন্মন্ জন্মন্ নিহিতো জাতবেদাঃ ॥২০॥

এতা—এইসব	মহান্তি—মহান
তে—তোমার	বৃষ্ণে—হে শক্তিময়
অগ্নে—হে অগ্নি	সবনা—সোমধারা সব
জনিমা—জন্ম সব	কৃতা—প্রস্তুত হয়েছে
সনানি—চিরন্তন শাশ্বত	ইমা—এই সব
পূর্ব্যায়—প্রাচীন, পুরাতন	জন্মন্ জন্মন্—জন্মজন্মের মধ্যে
নূতনানি—(তোমার জন্য) নূতন জন্ম সব	নিহিতঃ—নিহিত
প্র-বোচম্—ঘোষণা করেছি	জাতবেদাঃ—জন্মের জ্ঞাতা তিনি

হে অগ্নি, প্রাচীন তুমি, তোমার এই সব চিরন্তন জন্ম যত ঘোষণা করেছি, শক্তিময়ের জন্য আমরা এইসব বিপুল সোমধারা প্রস্তুত করেছি; জন্মে-জন্মে হে জন্মজ্ঞানী, অন্তরে তুমি নিহিত ॥২০॥

২১। জন্মন্‌জন্মন্ নিহিতো জাতবেদা বিশ্বামিত্রেভিরিধ্যতে অজস্রঃ।
তস্য বয়ং সুমতৌ যজ্ঞিয়স্যাপি ভদ্রে সৌমনসে স্যাম ॥২১॥

জন্মন্ জন্মন্—জন্মে জন্মে	তস্য—তার
নিহিতঃ—নিহিত, অন্তরে স্থাপিত	বয়ম্—আমরা
জাতবেদাঃ—হে জন্মজ্ঞ	সুমতৌ—সুষ্ঠু বা সত্য মতির বা চিন্তার
বিশ্বামিত্রেভিঃ—বিশ্বামিত্রদের দ্বারা	যজ্ঞিয়স্য—যজ্ঞাধিপতির
ইধ্যতে—সমিদ্ধ হও	অপি—ও, আরো

অনয়ঃ—নিরন্তর, অন্তহীন
ভদ্রে—কল্যাণময়
সৌমনসে—সুমনের মধ্যে, সত্য মনের মধ্যে
স্যাম—অবস্থান করি যেন

জন্মে জন্মে অন্তরে স্থাপিত তুমি হে জন্মজাতা, বিশ্বামিত্রেরা নিরন্তর তোমাকে সমিদ্ধ করেছে, এই যে যজ্ঞের যজ্ঞ-অধিষ্ঠাতা তার সত্যচিন্তার মধ্যে তার কল্যাণকর সু-মানসের মধ্যে আমরা যেন বাস করি ॥২১॥

২২। ইমম্ যজ্ঞং সহসাবন্ ত্বং নো দেবত্রা ধেহি সুক্রতো রণাঃ।
প্র যংসি হোতর্বৃহতীরিষো নোঽগ্নে মহি দ্রবিণমা যজস্ব ॥২২॥

ইমম্—এই
যজ্ঞম্—যজ্ঞ
সহসাবন্—(সহস্বন্) বলবান, বলবন্ত
ত্বম্—তুমি
নঃ—আমাদের
দেবত্রা—দেবতা
ধেহি—স্থাপন কর
সুক্রতো—হে সত্য-সঙ্কল্পবান
রণাঃ—আনন্দভোগী, আনন্দভোগশীল
প্র-যংসি—প্রদান কর
হোতঃ—হে হোতা
বৃহতীঃ—বৃহৎ
ইষঃ—প্রেরণাসব
নঃ—আমাদের
অগ্নে—হে অগ্নি
মহি—মহান
দ্রবিণম্—সম্পদ
আ-যজস্ব—যজ্ঞের সহায়ে নিয়ে এস

হে শক্তিমান, হে সিদ্ধসঙ্কল্পময়, এই আমাদের যজ্ঞকে দেবতাদের মধ্যে স্থাপন কর, তার মধ্যে তুমি তোমার আনন্দ গ্রহণ কর ; হে আহ্বানকারী হোতা, বৃহৎ প্রেরণাসব আমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ কর আর যজ্ঞের সহায়ে তুমি নিয়ে এস মহান সম্পদ আমাদের ॥২২॥

২৩। ইলামগ্নে পুরুদংসং সনিং গোঃ শশ্বত্তমং হবমানায় সাধ।
স্যান্নঃ সূনুস্তনয়ো বিজাবাঽগ্নে সা তে সুমতির্ভূত্বস্মে ॥২৩॥

ইলাম্—দৃষ্টিময় বাক্
অগ্নে—হে অগ্নি
পুরুদংসম্—বিপুল কর্ম, বিচিত্রকর্মী, বহুল কর্মসাধক
সনিম্—বিজয়
গোঃ—আলোকযূথের
শশ্বৎ তমম্—শাশ্বততম, চিরস্থায়ী
হবমানায়—আহুতিদাতার জন্য, আহুতিকারের জন্য
সাধ—সম্পন্ন কর
স্যাৎ—হয় যেন
নঃ—আমাদের
সূনুঃ—পুত্র
তনয়ঃ—(আমাদের) তনুজাত, তনুজ
বিজাবা—বিস্তৃত করে, প্রসারিত করে
অগ্নে—হে অগ্নি
সা—সেই
তে—তোমার
সুমতিঃ—সত্যচিন্তা
ভূতু—হয় যেন, সৃষ্ট হয় যেন
অস্মে—আমাদের মধ্যে

আমি তোমায় আহ্বান করি, হে অগ্নি, আমার জন্য সংসিদ্ধ কর দৃষ্টিময় বাক্ আর বহুল কর্মময় আলোকবিজয়, আমাদের আত্মজ সন্তানের ধারা প্রসারিত হয়ে চলে, হে অগ্নি, আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে যেন তোমার সেই শ্রেষ্ঠ মতি ॥২৩॥

শেষ প্রান্তে

(দুই)

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

দেবতারা প্রত্যেকেই এক একক অভিব্যক্ত সত্তা, তেমনি অসুরেরাও প্রত্যেকে এক একটি একক অভিব্যক্ত সত্তা। কিন্তু মানুষ হল বিভক্ত দ্বয়ী সত্তা; এক দিকে সে এক অন্তরাত্মা, অন্যদিকে প্রধানতঃ সে এক দেহাধার। অন্তরাত্মায় সে দেবতাদের আত্মীয়, বাহ্য-সত্তায় সে অসুরদের প্রতিবেশী পড়শী।

এমনি করে সে হয়ে রয়েছে স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে সেতুবন্ধ যেন। সে হল নিজ পৃথিবীর পঙ্কে তার পদ প্রতিষ্ঠিত—লোকোক্তিখ্যাত "কর্দমপাদ" সে—তার শীর্ষ উঠে গেছে উর্ধ্বে—সূর্যালোকে স্নান করছে সে। পৃথিবী হতে উদ্গত, বিবর্তনের জীব আবার সে স্বর্গ হতে পৃথিবীতে অবতরণ, আবির্ভাব: তার এক অঙ্গ দিব্য, অপরাঙ্গ আসুরিক। ভগবৎরূপে সে ব্রহ্ম, অসুররূপে অহম্।

কাজেই বিশ্বভুবন-পরিকল্পনায় মানুষ অধিকার করে রয়েছে এক কেন্দ্রস্থল—বা নাভিস্থান। তার উর্ধ্বে আসীন দেবতারা—বৃহত্তর মন ও হৃদয়ের ক্ষেত্র তাদের, তার অধিকাংশে শাসন করে, রাজত্ব করে অসুরেরা, নিম্নতর মন ও প্রাণের শক্তি তারা। দুয়ের মধ্যে মানুষ, মধ্যবর্তী জীব।

ত্রিভুবনের অধিকার নিয়ে দেবতাকুল ও অসুরকুলের সংগ্রাম চিরন্তন আর লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে তারা উভয়েই মানুষের সাহায্য ও সহায়তা খোঁজে। আমাদের উপকথা-কিংবদন্তী কাহিনীতে আমরা শুনেছি দেবতার মানুষী জীবেদের, রাজা ও যোদ্ধাদের আমন্ত্রণ করেছেন সংগ্রামে তাঁদের পক্ষ গ্রহণ করতে। আমরা রঘুবংশীয়দের কথা জানি—তাদের যুদ্ধ-রথ পৃথিবী থেকে সোজা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছেছে দেবতাদের সাহায্য করতে—আনাকরথ বর্ত্মণাম্—বলছেন কালিদাস। তবে মানুষের উপর স্বাভাবিকভাবেই অসুরের প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বেশি, তার কারণ মানুষের পার্থিব প্রকৃতি। সাধারণ মানুষ প্রধানতঃ চালিত ও শাসিত তার বাহ্য মন ও প্রাণ দিয়ে; তাকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বেগ প্রায় পুরোপুরিই দখল করে রেখেছে। তাদের বাহ্য জীবন ও কর্মধারায় জগৎ তথা মানুষ অসুরের অনুগত ভৃত্য ও স্বক্ষেত্র। তাদের ধর্মান্তরিত ও পুনর্গঠিত করতে হবে। শুভ-সম্ভাবনা এই যে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে নবজন্ম ও উর্ধ্বায়নের শক্তিরাও; তবে তারা কাজ করে বিলম্বিত লয়ে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যথেষ্ট আশু কার্যকরী নয়।

কিন্তু মানুষের ভবিতব্য এই তিন ভুবনের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তার ভবিতব্য এই নিম্নতন ত্রিভুবনকে অতিক্রম করে এবং একান্ত গভীরে কোথাও তা ক্রমে গড়ে তোলা হচ্ছে। তার ভবিতব্য দেবতাদেরও ঈর্ষার বস্তু; কারণ আপন অন্তরে সে ধারণ

করে স্বয়ং ভগবানের স্বধাম। স্বয়ং ভগবান উপ্ত রয়েছেন তার মধ্যে, তার অন্তরাত্মার গুহা-তলে—এ হল তারই অন্তরাত্মা। ভাগবত সত্তাই হয়ে উঠবার সম্ভাবনা সে ধারণ করে।

* * *

আমরা এসে গেলাম পরমোত্তম রহস্যেরই দ্বারে : এই সেই গুহা যেখানে পরম সত্তা অধিষ্ঠিত—গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্—এই হল সকল সমস্যার সমাধান ও তার সঙ্কল্পের সিদ্ধি, দিব্য পরিপূর্ণতা অর্জন। সেখানে প্রবেশের দায় তোমাদের নিজের, সেখানে অপেক্ষার রয়েছে, তোমার জন্য শেষ তৃপ্তি পুতি। আমার মনে পড়ে যায় এই প্রসঙ্গে মহাকবি ও নবী দান্তের কথা—ভার্জিল তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই বিরাট বিকট দ্বারের সম্মুখে যার উপর খোদিত রয়েছে অগ্নিবর্ণে এই হৃদয়বিদারী ভয়াল বাণী :

"সকল আশা ত্যাগ কর, কে তুমি এখানে প্রবেশ কর"

এ হল অনন্ত নরকের দরজা।

কিন্তু আমরা এখন গিয়েছি জ্যোতির্ময় দ্বারের সামনে—তার ওপর সোনার সমুজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত রয়েছে পরম সুখময় বাণী :

"সকল আশা ধরে রাখ, কে তুমি এখানে প্রবেশ কর।"

(২)

দুটি জগৎ বা স্তর রয়েছে জড় কর্মের জগৎ আর সূক্ষ্ম অনুভবের বা "ভাবের" জগৎ; জড়জগৎটিই শুধু যে সত্য এবং সূক্ষ্মটি অলীক কিংবা অপেক্ষাকৃত কম বাস্তব তা নয়। সূক্ষ্ম জগৎটিও সমানে সত্য, এমনকি অধিকতর বাস্তব সত্য ও প্রকট হতে পারে, বলা যায় অধিকতর জড়ও হতে পারে। একটা জড় বা শারীর আঘাত বেদনাকর, কিন্তু রাজা লীয়র পাগল হয়েছিলেন একটা সূক্ষ্ম আঘাতের ফলে, অকৃতজ্ঞতার আঘাতে—তা তাঁকে অনেক বেশি আহত করেছিল বাইরের উন্মত্ত গর্জনমুখর ঝড়ের তীব্র কশাঘাতের চেয়ে। শারীর আলিঙ্গনের আনন্দ বিস্মৃত হয় মানুষ, কিন্তু নিছক প্রেমেরই একটা আনন্দ আছে—বিশুদ্ধ একান্ত আত্মমগ্ন প্রেম যার অংশীদার নেই কোন—তা এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা যা স্মৃতিতে চিরবধূর ও শক্তিময় হয়ে থেকে যায় বারবার। বেয়াত্রিসের জন্য দান্তের ভালবাসা, তা গড়া পবিত্র সংহত চেতনা দিয়ে, তার মধ্যে দেহগত কিছু নেই, তবু তা তাঁকে সর্বভুবন অতিক্রম করে তার অভিযানপথে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্গে স্বয়ং ভগবানের দিব্য সান্নিধ্যে, তাঁর দিব্যভূতা প্রিয়ার সমীপে (এবং বলা হয় তিনি গিয়েছিলেন জড় দেহে, জড়দেহ নিয়ে)।

ভাবের এই সূক্ষ্ম জগৎ তোমাকেই সৃষ্টি করতে হবে : তা তোমার অন্তরে থাকতে পারে কিংবা পারে তোমায় ঘিরে রাখতে চারিদিক থেকে আবেষ্টনী হয়ে, এ হতে পারে স্বয়ম্ভূ ও পরিভূ—চেতনার বা অস্তিত্বের সেই স্তরে দুই-ই এক। বাইরের জগৎ অল্পবিস্তর স্বাধীন, তোমার অধীন নয়, তার উপর তোমার প্রভাব বা ক্ষমতা খুব বেশি নয় কিন্তু সূক্ষ্ম ক্ষেত্রটি অধিকতর নমনীয় ও অনুগত ও বাধ্য তোমার ইচ্ছার ও উদ্দেশ্যের কাছে। সকল বিক্ষোভ-বিপত্তির মধ্যে, কঠিনতম দুর্গতির মধ্যেও তুমি এই অন্যজগৎটি গড়ে তুলতে পার

তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষার অনেকখানি অনুরূপ করে, তাকে করে তুলতে পার তোমার আলো ও আনন্দের উৎস। তা হয়ে উঠতে পারে তোমার সুখস্বস্তির স্বধাম, তোমার দিব্য আশ্রয়। এই জগতের ভিত্তি মায়ের জন্য ভালোবাসা, আর তার শীর্ষ—তাঁর চেতনার জন্য আশ্লেষ, আর আপাদশীর্ষ তা গঠিত সম্পূর্ণভাবে মায়ের প্রশান্তি ও সাম্য স্থিরতা দিয়ে।

এ কাজ তুমি নিজেই করতে পার—সে সামর্থ্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে—কারণ এ সামর্থ্য আর কিছু নয়, এ হল মায়ের সান্নিধ্য।

দান্তের দিব্যদর্শন

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

(১)

আমরা চলছিলাম, স্বর্গের পথে, বেয়াত্রিস সঙ্গে, লোক হতে লোকান্তরে ; আমাকে পথ দেখিয়ে সকলের অধিবাসীদের স্থানের পরিচয় দিয়ে, দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়ে চলছিল সে। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে কণ্ঠ আর শুনি না। তাকিয়ে দেখি কোথাও নেই, পরিবর্তে একজন বর্ষীয়ান দিব্যকান্তি সাধুপুরুষ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কে আপনি? আমার সঙ্গিনী ছিলেন, কোথায় তিনি?" উত্তর এল, "তাঁর সঙ্গ আর দরকার নেই। এখন থেকে আমিই তাঁর স্থান গ্রহণ করেছি তাঁরই অনুজ্ঞায়। একটু পরেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। আমি সেন্ট বার্নার্ড।" আমি বিহ্বল হৃদয়ে প্রণাম করলাম তাঁকে। কিছুদূর এসে তিনি বললেন, "স্বর্গের শেষ প্রান্তে আমরা উপস্থিত, চেয়ে দেখ ঐ উত্তর স্বর্গ—Empyrean।"

কি দেখলাম। কি উজ্জ্বল আলো, চোখ ঝলসে যায়, চারিদিক জ্যোতির্ময়। ওই যে ত্রিমূর্তি, পরমসত্তার ত্রিধারা, তাঁদের একপাশে দাঁড়িয়ে ওই যে জ্যোতির্ময়ী বেয়াত্রিস।

আমি দেখলাম আলোর চক্র যেন ঘুরছে আবর্তে, পৃথক আকার গ্রহণ করছে, আবার মিশে গিয়েছে—গোলাকার ত্রিকোণাকার, নানাবিধ রেখাপাত! আমি তাদের মিলিয়ে ধরে একটা সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না। আমার গণিতজ্ঞের পাণ্ডিত্য পর্যন্ত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে যায়—আমি হতাশ হয়ে পড়েছি প্রায়।

হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল, মন বুদ্ধি কোথায় হারিয়ে গেল, নীরব নিষ্কম্প সব। অসাড় হয়ে গেলাম যেন, অপরূপ অদ্ভুত দৃশ্য। অলৌকিক অনুভব, সংশয়-বিধাহীন এ কি দিব্য প্রকাশ।

(২)

প্রার্থনা

"ভগবান! তুমি আসন নিয়েছ তোমার নিজের মধ্যে তুমিই তোমাকে বোঝ, তুমিই জান তোমাকে আর যা জানা হয় তাও তুমিই—
তুমিই ভালবাস তোমাকে, তোমার হাসি তোমারই জন্য।*

স্বয়ম্ভু সে জ্যোতির্মণ্ডল, তোমারই মধ্যে তোমারই প্রতিফলিত আলো সে। আমি ধ্যান-নিবিষ্ট হয়ে গেলাম, তার মধ্যে—তারই মধ্যে দেখলাম তুমিই যেন আমার মূর্তি ধারণ করে রয়েছ, তোমার নিজের আভা নিয়ে—আমি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছি তোমার অন্তরে।"

প্রিয়দর্শিনি! হে কৃপাময়ি। আমার সকল আশা ভরসা ন্যস্ত তোমার পরে, আমার উদ্ধারের জন্য তুমি তোমার পদচিহ্ন রেখে চলেছিলে নরকের মধ্যে।

যা কিছু আমি দেখেছি সর্বত্রই আমি তোমার শক্তির তোমার করুণার পরিচয় পেয়েছি ; সর্বদাই পেয়েছি তোমার অনুকম্পা তোমার অভয়।

বন্ধন থেকে তুমি আমাকে তুলে নিয়ে এসেছ মুক্তির মধ্যে।

Riconosco la grazia e la virtute,
Tu m'hai di servo tratto a libertate.

* Te ami ed arridi. (Dante—Paradiso, Canto XXXIII)

সিদ্ধি

রমেন সেনগুপ্ত

ভাবিয়াছিলাম মাগো,
প্রণমিব তোমা,
সিদ্ধ হবে মনোরথ।
আসে সিদ্ধি স্বর্ণচূড় রথে
রক্তিম কৌষের বস্ত্রে পতাকা উড়ায়ে।
পথের দুধারে তার
বাসনার পুষ্পগুলি উন্মুখিয়া ওঠে
স্পন্দিত আগ্রহভরে।
কেহ চাহে বিত্তরাশি, কেহ বা সুযশ,
কেহ বিদ্যা, কেহ জ্ঞান,
কেহ বা করিছে আশা,
ম্লান দীপালোকে
হেরিবে প্রিয়ার মুখে পরিতৃপ্ত হাসি।
সহস্র অঙ্গুলি দিয়া
সিদ্ধি চলে স্পর্শ করি প্রতিটি কুসুম,
ছড়ায় সৌরভ তার দ্বার হতে দ্বারে।
মোর দ্বার খুলি যবে বাহিরিনু পথে
সোনালী সন্ধ্যায়,
দেখি সেথা পড়ে আছে
থরে থরে সেজে
আমার বাসনাফল।
কিছু তার রাঙিয়েছে পূর্ণতার রঙে,
কিছু বা মলিন—
বঞ্চিত করিয়া মোরে লুকায় আড়ালে।
যাহা পাইয়াছি আর যাহা পাই নাই,
তারি অংক কষে
কাটে দিন মন্থর গতিতে।
জীবনের উত্থান-পতন
দৈবের বিধান বলে মেনে লই।
তবু যবে সিদ্ধ হয় বাসনা আমার,
হাসি ফোটে মুখে।
সে হাসিতে সুখ আছে, তৃপ্তি নাই,
শান্তি নাহি পাই,

অশান্ত হৃদয় মোর আরো পেতে চায়.
ধরণীর সর্বসুখ উজাড় করিয়া নিতে দুহাত বাড়ায়।
বঞ্চনা বাড়িয়া যায়,
চোখে আসে জল,
নিন্দি ভাগ্য মোর।
সহসা একটি রাতে দেখি,
তারায় তারায় ছেয়ে গেছে নীলাকাশ;
তারই এক প্রান্ত থেকে
আলোকের ক্ষীণ তরী বেয়ে
সম্মুখে দাঁড়ান এসে জননী আমার।
চাহিনু মুখের পানে,
ভুলে গেনু সর্ব চাওয়া-পাওয়া,
অন্তহীন পুলকধারায় অভিষিক্ত করে দিল হৃদয় আমার।
সিক্ত আজি মোর মনস্কাম,
হে জননী, লহগো প্রণাম।

নেপথ্যে

সুনিত্রা রায়

তুমি কি আমার চেয়ে বড়ো ?
যে আমি স্বচ্ছন্দচারিণী,
ক্ষণে ক্ষণে তোমাকে একলা ফেলে,
চলে যাই অতীতের সুখস্বপ্নে,
অথবা ভবিষ্যতের মধুর কল্পনায়।
যে আমার মুঠোয় ধরা দেয়
সমস্ত বিশ্ব—একটি গোলকের মত।
যে আমি ভালোবাসে, ভাবে, রূপ দেয়,
সার্থক ক'রে তুলতে চায় এই সৃষ্টিকে।
সেই আমির চেয়ে তুমি কিসে বড়ো
এই স্বল্পধৈর্য্য সীমিতগতি, স্বার্থপর প্রকৃতি,
সহজে পরাজিত, নির্বোধ, আমার বাস্তবছবি ?
কখনও তোমাকে মানতাম না, দিতাম না এতটুকু দাম ;
খোলস থেকে বেরিয়ে আসা শাবকের চেয়ে।
কিন্তু কোথায় তুমি লুকিয়ে রেখেছ চাবি—
তোমার এই নির্বোধ রক্ত মাংস মেদ মজ্জার আড়ালে।
জানিনা কোথায় কি ভাবে যে জীয়নকাঠি মরণকাঠি হয়ে যায় !
তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখেছি, যুক্তি বিচার বুদ্ধি দিয়ে
কার্যকারণ উপায় দিয়ে, হায় বুঝিনি, কিছুই বুঝিনি।
দীপ্ত কণ্ঠে বলি পথ ছাড়, স'রে যাও !
কে তুমি পথ রোধ কর, অনন্তের যাত্রীকে ?
তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বড় জোর একশ বছর ;
তোমাকে ছেড়ে একাত্ম হই সর্বলোকে, সর্ববস্তুতে।
যেমন আছ তেমনি থাক এই প্রাসাদের রক্ষী হয়ে
ভাঙাচোরা মেরামত, আগাছা সাফ নিয়ে,
তবু কখন যে কোথায় বাঁশি বেজে ওঠে তীব্র
আমার সমস্ত অনুপরমাণুকে নাড়িয়ে, কাঁপিয়ে
বলে ওঠে, "এই তো আমি আছি, আমিই আছি।"
আর আমার বড় আমিটা গ'লে গ'লে মিলিয়ে যায়।
কে তুমি শক্তিধর। এই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষয়িষ্ণুদেহের আড়ালে ;
আমার আনন্দ আর আনন্ত্য কে চূর্ণ ক'রে দাও।
কি আছে তোমার ঐ একমুঠো শরীরের গহনে ?
কোথায় ধ'রে রেখেছ আর একটা সীমাহীন আকাশ ?

———

সাবিত্রী—শ্রীমার কথা

প্রস্তাবনা

১৯৬০ সালের ১৮ই জানুয়ারী এক তরুণ সাধক ব্যক্তিগত ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সে সময় মা তাকে বলেন, "আমি তোমায় কিছু দেব ; তৈরী থেক।" পরদিন আবার যখন তার মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, মা প্রথমে ফরাসী ভাষায় বললেন চৈত্যাগ্নি কেমন করে জ্বালাতে হয় এবং সেই প্রসঙ্গ ধরে বলতে আরম্ভ করলেন শ্রীঅরবিন্দের মহাকাব্য সাবিত্রী সম্বন্ধে এবং বলে চললেন বেশ অনেকক্ষণ ধরে।

মায়ের কাছ থেকে ফিরে আসার পর সাধকটির ইচ্ছা হয়েছিল মা যা কিছু বলেছেন তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করে রাখে কিন্তু তা সে করে নি, কারণ মায়ের নিজের কথা যথাযথ লিপি-বদ্ধ করার অক্ষমতা বোধের দরুণ সে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করেছিল। প্রায় সাত বৎসর পরে কিন্তু, তার, মা যা কিছু বলেছিলেন তা লিখে রাখবার একটা প্রবল আগ্রহ জাগে; সুতরাং ১৯৬৭ সালে স্মৃতি হতে সে তার একটি বিবরণ ফরাসীতে লেখে। মা লেখাটি দেখেন এবং কয়েকটি জায়গায় পরিশোধনও করেন। আর একজন সাধক লেখাটি পড়বার জন্য মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে মা তাকে লেখেন, "অনেক বৎসর আগে মনা সরকারের কাছে এ(সাবিত্রী)-সম্বন্ধে আমি বিশদভাবে আলোচনা করেছিলাম এবং আমি যা বলি সে তা ফরাসীতে লিপিবদ্ধ করেছে। কিছুদিন আগে সে যা লিখেছে তা আমি দেখেছি, নোটামুটি তা ঠিকই হয়েছে।" (৪-১২-৬৭)

আরও কয়েকটি উপলক্ষ্যে ঐ সাধকটির কাছে মা সাবিত্রী পাঠের সার্থকতা সম্বন্ধে বলেন এবং সে পরে তা লিপিবদ্ধ করে রাখে। মূল বিবৃতির শেষে সে-মন্তব্যগুলিও ছাপা হল।

প্রথমে কয়েকজন আশ্রমিক ফরাসী ভাষায় এই বিবরণীটি নিভৃতে পড়েন। কিন্তু পরে এর ইংরেজী সংস্করণের অনেক অনুরোধ আসতে থাকে। সেজন্য ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে এর একটি ইংরেজী অনুবাদ করা হয়। ১৯৭২ সালে এটি মুদ্রিত করার প্রস্তাব করে অনুমোদনের জন্যে মায়ের কাছে নিবেদন করা হয়। মুদ্রণের অনুমতি দেবার পূর্বে মা অনুবাদটি দেখে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কার্যতঃ এর সামান্য অংশই দেখা সম্ভব হয়েছিল।

সাবিত্রী সম্বন্ধে মায়ের উক্তির মহৎ সার্থকতা বিবেচনা করে এবং ইংরেজী সংস্করণের জন্য ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্যও এটি এখন মুদ্রিত হল।

সাবিত্রী
শ্রীমা

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি 'সাবিত্রী' পড় কি ?"

আমি : হাঁ মা, পড়ি।

মা : সবটা পড়েছ ?

আমি : হাঁ, মা, পড়েছি দু'বার।

মা যা পড়েছ, সবটা বুঝতে পেরেছ?

আমি না, বেশি কিছু বুঝতে পারিনি, তবে আমি কবিতা ভালবাসি, তাই পড়ে যাই।

মা বলে চললেন তা বেশ। বুঝতে না পারলেও কিছু আসে যায় না। পড়ে যেও। ক্রমে দেখবে যতবার তুমি পড়েছ প্রত্যেকবারেই নূতন কিছু খুলেছে তোমার কাছে। প্রত্যেক বারে আবিষ্কার করবে নূতন বস্তু, নূতন অভিজ্ঞতা। যে জিনিস ছিল না তোমার জ্ঞানে, যে জিনিস তুমি বুঝতে পারনি তা হঠাৎ দেখা দিয়েছে, পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। কথার পর কথার ভিতর দিয়ে, ছত্রের পর ছত্রের ভিতর দিয়ে নিরন্তর অপ্রত্যাশিত কিছু এসে ধরা দিয়েছে। যতবার তুমি পড়তে চেষ্টা কর, বুঝতে চেষ্টা কর ততবার দেখবে একটা কিছু কোথা থেকে এসে মিলেছে তার সঙ্গে, একটা কিছু পিছনে লুকিয়ে ছিল, স্পষ্ট হয়ে জীবন্ত হয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আবার বলি তোমাকে, যেসব বাক্য তোমার পড়া আছে, ঠিক সেসবই নূতন এক আলো নিয়ে দেখা দেবে, যতবার পড়বে ততবার নূতন হয়ে। এ রকম দানে সদাসর্বদা। সদাসর্বদাই কিছু একটা এসে তোমার উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করে, প্রতিপদে নূতন সত্যের আবির্ভাব।

তবে মনে রাখবে 'সাবিত্রী' পড়বে না আর সব বই বা খবরের কাগজ যেভাবে পড়। যখন পড়বে মাথা খালি করে নেবে, মনকে রাখবে সাদা, শূন্য। কোন, অন্য কোন চিন্তা রাখবে না। একাগ্র হবে, প্রশান্ত, স্থির থাকবে, নিজেকে খুলে রাখবে। তবেই তো কথা, ছন্দ, স্পন্দন সোজা প্রবেশ করবে এই সাদা পাতাখানির উপর, তার উপর ছাপ দিয়ে যাবে, ছাপ রেখে যাবে। তোমার মাথার মধ্যে কোন চেষ্টা বাতিরেকেই তার অর্থ তারা নিজেরাই ব্যক্ত করে ধরবে। সাধন-সোপানের সর্বশেষ চূড়ায় তোমাকে তুলে ধরবার পক্ষে এক 'সাবিত্রী'ই যথেষ্ট। এর কথার উপর যদি তুমি ধ্যান দাও তবে সব কিছু সাহায্য তার মধ্যেই পাবে। সাধনার পথ ধরে যে কেউ চলতে চায়, এ হল যেন তার সাক্ষাৎ দিশারী, স্বয়ং ভগবান যেন তোমাকে হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন স্থির লক্ষ্যের দিকে। আর তোমার যা কিছু প্রশ্ন বা সমস্যা ওঠে, যতই তা ব্যক্তিগত হোক না, তারও উত্তর মিলবে সেখানে। প্রত্যেক বাধা-বিঘ্ন এলে, কি করে তা অতিক্রম করা যায় তারও নিশানা আঁকা রয়েছে এখানে। ফলতঃ যোগ-সাধনার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন সবই রয়েছে এখানে। একখানি পুস্তক-পৃষ্ঠার মধ্যে সমস্ত বিশ্বকে তিনি ঠেসে ভরে দিয়েছেন। অপূর্ব গ্রন্থখানি, অত্যাশ্চর্য, অতুলনীয়, সর্বাঙ্গসুন্দর।

জান কি? 'সাবিত্রী' শুরু করবার আগে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে বলেছিলেন, "নূতন একটা অভিযানে আমি নেমে যেতে চাই। গোড়ায় আমার একটু ইতস্ততঃ হয়েছিল কিন্তু এখন সিদ্ধান্ত স্থির। তবে জানিনা কতদূর সফল হব আমি। ভগবৎ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করি।" বলছি এ হল বইখানি শুরু করবার আগের কথা, তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আবার—এ হল তাঁর নিজস্ব বলবার ভঙ্গি, ভগবৎ-কল্প বিনয় ও নম্রতায় পরিপূর্ণ। তিনি তো কখনও...নিজের প্রতিষ্ঠা চাননি। তারপর যেদিন তিনি আরম্ভ করলেন, আমায় বললেন, "আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম অনন্তের অসীম প্রসারে হালছাড়া পালছাড়া নৌকোয়।" তারপর একবার যখন আরম্ভ হ'ল তখন লেখা হয়ে চলল পাতার পর পাতা অবিরল—এ যেন একটা জিনিস ছিল একেবারে তৈরী ঐ ওপারে, তাকে শুধু নামিয়ে আনা

হয়েছে আর এই সব পাত্রের উপরে ধরে দেওয়া হয়েছে। ফলতঃ 'সাবিত্রী' গ্রন্থখানি তার পূর্ণরূপ নিয়ে সমগ্রভাবে নেমে এসেছে একটা উর্ধ্বতন রাজ্য থেকে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু তাঁর প্রতিভা দিয়ে তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরেছেন, একটা অপূর্ব ভাষায় ও ভঙ্গিতে। অনেক সময় গোটা বাক্যগুচ্ছই অতিব্যক্ত হয়েছে, শ্রীঅরবিন্দ যেমনটি এসেছে তেমনি রেখে দিয়েছেন, তাতে হাত দেননি। তিনি অনেকখানি যত্ন ও পরিশ্রম করেছেন, কখনও শ্রান্ত হন নি, সর্বদা তাঁর লক্ষ্য ছিল অনুপ্রেরণা যাতে আসে সর্বোচ্চ ভূমি থেকে। কি অপরূপ কাব্য তিনি সৃষ্টি করেছেন, বাস্তবিক এ একখানি পরিপূর্ণ সৃষ্টি, এ সৃষ্টির তুলনা নাই। সব জিনিস রয়েছে ওরই মধ্যে, আর ধরে দেওয়া হয়েছে এমন রূপের মধ্যে, কি সরল, কি স্বচ্ছ, নিখুঁত ছন্দ, পরিচ্ছন্ন চিরন্তন সত্য। শোন বলি তোমায়, আমি অনেক জিনিস পড়েছি, কিন্তু কোথাও এমন জিনিসের সাক্ষাৎ পাইনি 'সাবিত্রী'র সঙ্গে যার তুলনা হয়। প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন সাহিত্যের, ইংরেজী সাহিত্যের, ফরাসী সাহিত্যের তো বটেই, জার্মান সাহিত্যে, প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠতম রচনা আমি পাঠ করেছি, তাদের সকলের মহাকাব্য যত, কিন্তু তোমায় আবার বলি, 'সাবিত্রী'র মত কোথাও কোন বস্তু আমি দেখিনি। এই যত সাহিত্যসৃষ্টি মনে হয় তারা যেন সব ফাঁকা ফাঁপা তুচ্ছ, কোন গভীর সম্বন্ধ সেখানে নেই, হয়তো দু'একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া। তাও তুলনায় হবে 'সাবিত্রী'র একটা সামান্য অংশমাত্র। কি মহিমা এখানে, কি বিশালতা কি গভীর সত্য, শ্রীঅরবিন্দ সৃষ্টি করেছেন একটি অমর শাশ্বত বস্তু। আবার তোমাকে বলছি, সমস্ত পৃথিবীতে 'সাবিত্রী'র সমতুল কিছু নাই। এখানে যে সত্যদৃষ্টি রয়েছে যে মূল সম্বন্ধ রয়েছে তার অনুপ্রেরণার পিছনে সে কথা ছেড়ে দিলেও কেবল গণনার মধ্যে এক যদি কাব্য অর্থাৎ সুছন্দ বাক্যের মাহাত্ম্য ধরি সেক্ষেত্রেও আমরা দেখব মহাকবিদের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের মহিমা আমরা ছাড়িয়ে গিয়েছি। শ্রীঅরবিন্দ যা সৃষ্টি করেছেন এমন জিনিস মানুষ তার কল্পনার মধ্যে ধরতে পারে না, কারণ তার মধ্যে রয়েছে সব জিনিসই, সব, সব।

বলা যেতে পারে 'সাবিত্রী' হল একটা সত্যদৃষ্টি, সত্যের অভিব্যক্তি। এ হল ধ্যান অনন্তের, শাশ্বতের অনুসন্ধান। বইখানা তুমি যদি পড় অমরত্বের আস্পৃহা নিয়ে, এই পাঠই তোমাকে অমরত্বের পথ দেখিয়ে চলবে। ফলতঃ 'সাবিত্রী' পাঠই হল যোগসাধনা, আধ্যাত্মিক একাগ্রতা ; এখানে সব মিলবে তোমার, যা কিছু প্রয়োজন ভগবৎ সাক্ষাৎকারের জন্য, যোগসাধনার প্রতিটি সোপান এখানে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনকি অন্যান্য যোগসাধনার রহস্যও পাবে তুমি এখানে। কোন সন্দেহই নাই, কেউ যদি আন্তরিকভাবে অনুসরণ করে এখানে প্রতিটি বাক্যে যে নির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে, সে অবশেষে উত্তীর্ণ হবেই অতিমানস যোগের রূপান্তর সিদ্ধিতে। সত্যসত্যই এখানে তুমি পাবে এমন অভ্রান্ত দিশারী যে তোমায় কখনও ছেড়ে যাবে না, তার সাহায্য সর্বদাই রয়েছে এ পথে যে কেউ চলতে চায় তার জন্য। 'সাবিত্রী'র প্রতিটি পদ এক একটি সিদ্ধ মন্ত্র যেন। মানুষ এযাবৎ যত জ্ঞান অধিগত করেছে তা সব ছাড়িয়ে গিয়েছে এ মন্ত্র। আমি আবার বলি তোমায় 'সাবিত্রী'র বাক্যাবলী এমনভাবে উক্ত হয়েছে, সঙ্গীত হয়েছে যে তার ছন্দের ধ্বনি নিয়ে যায় সকল ধ্বনির উৎস যে ধ্বনি ওম্ তার মধ্যে।

হাঁ, আবার বলছি, বারবার বলছি, সব এখানে রয়েছে, সবই—অধ্যাত্মরহস্য, অলৌ-

সাহিত্য মহাবাক্য মহাদৃষ্টি. এ হল মহা এক কৃতি যদি কেবল গণনা কর তাঁর রচিত বাক্যের পরিমাণ। না, মানুষী বাক্ 'সাবিত্রী'র বর্ণনা দিতে পারে না। বর্ণনার প্রয়োজন হয় উক্তি অতিশয়-উক্তি. কারণ এ হল এক অতি-মহাকাব্য। মানুষী কথার এমন সামর্থ্য নেই যে প্রকাশ করে 'সাবিত্রী' কি, এমন বিশেষণ নেই, উপাধি নেই যা বলতে পারে 'সাবিত্রী' হল এই, অন্তত: আমার জানা তেমন কিছুই নেই। মূল্যের দিক দিয়ে বিশাল সে, আধ্যাত্মিক মূল্য। তার বিষয়বস্তু হল শাশ্বত, তার আহ্বান অনন্ত, তার ভঙ্গি তার গঠনশক্তি অলৌকিক—এ বস্তু অদ্বিতীয়। তুমি যত তার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবে ততই তুমি উর্ধ্বে উঠে যাবে। এ জিনিসের দোসর নেই সত্যসত্যই, কি নিটোল সর্বাঙ্গসুন্দর বস্তু তিনি মানুষের জন্য রেখে গিয়েছেন, সর্বোচ্চ শিখরের জিনিস। কি জিনিস? মানুষ জানবে কখন তা? কবে মানুষ চাইবে সত্যের জীবন যাপন করতে? এখানকার জীবনের মধ্যে কবে সে তাকে গ্রহণ করবে? এ হল প্রশ্ন।

তাহলে তুমি রোজ পড়বে 'সাবিত্রী', পড়বে যথাযথভাবে, সত্যকার অনুভব নিয়ে। বইখানি খোলবার আগে একটু একাগ্র হয়ে থাকবে, মস্তিষ্ককে যথাসম্ভব খালি রাখতে চেষ্টা করবে, একেবারে চিন্তাশূন্য ক'রে, যদি পার। সোজা পথ হল ঐ দিক দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। যদি এ রকমে সত্যসত্যই একাগ্রচিত্ত হতে পার, এই ধরনের আস্পৃহা নিয়ে, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জানতে পারবে অগ্নিশিখাকে, অন্তরাত্মার অগ্নিশিখা, শুদ্ধিদাত্রী সেই শিখা অল্পসময়ের মধ্যে, কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো তার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবে, সাধারণভাবে চলে যা করতে তুমি পার না, সাবিত্রীকে ধরে তা তুমি করতে পারবে। চেষ্টা করে দেখ, দেখবে এ আর-এক বস্তু, কি নূতন ধরনের, যদি তুমি এই ভাব নিয়ে পাঠ কর, তোমার চেতনার পিছনে তাকে ধরে রেখে; এ যেন হবে শ্রীঅরবিন্দের কাছে তোমার অঞ্জলি। মনে রাখবে চেতনার ভরপুর নিঃশেষ ভরপুর এ জিনিস, 'সাবিত্রী' যেন জীবন্ত সত্তা এক, সত্যকার দিশারী। আবার বলি যে কেউ সাধনা করতে চায়, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে, অনুভব করে সাধনার প্রয়োজন, তাহলে সে 'সাবিত্রী'কে আশ্রয় ক'রে সিদ্ধির সর্বোচ্চ সোপানে উঠে যেতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে কি গুপ্তসত্য 'সাবিত্রী'র মধ্যে রূপ পেয়েছে। এর জন্যে কোন গুরুর প্রয়োজন নেই। আর এ সাধনা করা যেতে পারে যেখানে সেখানে থেকে। এই 'সাবিত্রী'ই হতে পারে তার অদ্বিতীয় দিশারী, কারণ যা কিছু তার প্রয়োজন হবে, সবই তার মিলবে সাবিত্রীর মধ্যে। বাধা-বিঘ্ন দেখা দিলে কিংবা যদি সে না জানে কোথায় পা দিতে হবে এগিয়ে চলবার জন্যে, বিপত্তি কি রকমে অতিক্রম করা যায়, এ সব সংশয়ের সন্দেহের ভিতর দিয়ে, পদে পদে সাধককে যা অভিভূত করে ফেলে, এ সকলের মধ্যে যদি সে স্থির প্রশান্ত থাকতে পারে, তাহলে প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত সে পাবে, প্রয়োজনীয় সাহায্য তার গোচর হবে; তাকে সম্পূর্ণ স্থির থাকতে হবে, নিজেকে খুলে রাখতে হবে, আন্তরিকভাবেই চাইতে হবে, তবে সে সত্যসত্যই দেখবে কোন এক অদৃশ্য হাত এসে তাকে ধরে নিয়ে চলেছে। তার যদি আস্থা থাকে, যদি সংকল্প থাকে, নিজেকে দিয়ে দেবার জন্য থাকে যদি মূল এক আন্তরিকতা, তাহলে সে শেষ লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছবেই।

হতাশা যদি কখন তোমার এসে যায়, দুঃখ যদি ঘিরে ধরে, ধারণা যদি হয় সফল তুমি হবে না, কিংবা যা তুমি চাও ঘটে সদাসর্বদা তার বিপরীত, তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন,

অবস্থা এমন হয় প্রতিপদে তোমার রিক্ততা রাগ এসে যায়, জীবন মনে হয় দুঃসহ, তুমি হলে হতভাগাদের সেরা তবে তখন 'সাবিত্রী' বইখানা হাতে করে নাও, খুলে ধর যে কোন পাতা, পড়ে দেখ যে কোন জায়গা। দেখবে তোমার কাল বেষ সব কোথায় উড়ে গিয়েছে, দেখবে কোথা থেকে শক্তি এসেছে অতি তীব্র দুঃখ পার হয়ে যাবার, সে জিনিস কোথাও নেই যা ছিল তোমার দুঃখকষ্টের হেতু। পরিবর্তে অনুভব করবে একটা অদ্ভুত স্বস্তি, চেতনার একটা পরাবর্তন আর সব কিছু জয় করবার সামর্থ্য ও শক্তি, অসম্ভব বলে কিছুই আর তোমার নজরে পড়বে না। তুমি অনুভব করবে এক অফুরন্ত আনন্দ যাতে সব কিছু শুদ্ধ হয়ে যায়। এই রকমে দুই চারটি বাক্য পাঠ করলেই যথেষ্ট, তাতেই এনে দেবে তোমার অন্তরতম সত্তার সঙ্গে সংযোগ। 'সাবিত্রী'র মধ্যে রয়েছে এ রকম একটা অপার্থিব শক্তি। পরীক্ষা করে দেখবে নিজে, কি ফল হয় আমাকে জানাবে। গভীরভাবে একাগ্র হবে, একাগ্র হয়ে খুলবে তবে এই রকমে বিনা চিন্তায় কোন স্থানে 'সাবিত্রী'র পাতা, তুমি পাবে প্রত্যুত্তর, যে সমস্যায় তুমি বিব্রত হয়েছিলে তার উত্তর। আমি জানি, আমি বলছি একশ'র মধ্যে নিরানব্বই বারই তুমি পাবে যথাযথ উত্তর। চেষ্টা করে দেখ।

পরিশেষে বলি 'সাবিত্রী' হল জাগ্রত জীবন্ত বস্তু এক, চিন্ময় চেতনায় আপূর্ণ ভরাট সেই পরমজ্ঞানে যা সকল তত্ত্বজ্ঞান, মানবীয় মানুষী ধর্মবোধকে অতিক্রম করে রয়েছে, এ হল সত্যকার আধ্যাত্মিক পথ, এ হল যোগসাধনা, এ হল তপস্যা, সব একখানি তনুর মধ্যে। 'সাবিত্রী' অদ্ভুত শক্তি এক, তার স্পন্দন সে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যে সক্ষম সে গ্রহণ করতে পারে, সত্যকার স্পন্দন, চেতনার প্রতি স্তরের, কোন তুলনা নাই এ বস্তুর, এ হল পূর্ণ সত্তোর পূর্ণতা, এমন জিনিস শ্রীঅরবিন্দ নামিয়ে এনেছেন পৃথিবীর উপরে। তাই বলি সাবিত্রী কি বস্তু তার রহস্য যদি জানতে চাও, তার মধ্যে আমাদের জন্য শ্রীঅরবিন্দ কি ভবিষ্যবাণী রেখে গিয়েছেন আবিষ্কার করতে চাও, তবে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাই তবে রয়েছে করণীয় হিসাবে তোমার সম্মুখে, কঠিন এ চেষ্টা, কিন্তু এ চেষ্টা নিষ্ফল হবে না।

ছোটদের গল্প

শ্রীমা

নম্রতা

শুধু যারা আত্মাদের দেখায় তাদেরই নয়, যারা হানবড়াই করে তাদের প্রতিও আমরা সময়ে সময়ে অবজ্ঞা দেখাই। নিজের ঢাক পেটায় যারা তাদের কেউ ভালোবাসে না ; কিন্তু একজন এমন আত্মপ্রচারককে আর একজন আত্মপ্রচারক পর্যন্ত তাচ্ছিল্য করে।

জেনে অবাক হই না, রাবণের দারুণ শত্রু যে হরণ করেছিল তাঁর স্ত্রী সীতাকে সেও ছিল অহংকারী ; এমন রাক্ষসের পক্ষে তা হওয়া তো স্বাভাবিকই।

রাম এবং লঙ্কার রাক্ষসদের মধ্যে শেষ মহাযুদ্ধে বহিনাগ্নিত প্রভু তাঁর রথে রাক্ষসরাজের মুখোমুখি এলেন—সেও নিজের রথে আসীন। সে যুদ্ধের তুলনা নেই। রাক্ষসচমূ এবং কপিভল্লুকের সেনাবাহিনী সেই সংগ্রাম চাক্ষুষ করল।

তখন লঙ্কাধিপতির নির্দয় কণ্ঠে ঘোষিত হল

—"হে রাম, আজ এই যুদ্ধের শেষ ; যদি না রণক্ষেত্র থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালাও। দুর্ভাগা, আজ তোমাকে যমালয়ে পাঠাব। এ রাবণ যার সঙ্গে যুদ্ধে নেমেছে।"

রাম শান্তভাবে হাসলেন। তিনি জানতেন রাবণের চরমদণ্ড আসন্ন, বললেন :

—"হে রাবণ তোমার বীরত্বের ব্যাখ্যান সব শুনেছি কিন্তু এবার যেমন শুনেছি তেমনটি দেখতে চাই। দয়া করে মনে রেখ এই জগতে তিন রকমের মানুষ আছে, যেমন আছে তিন রকমের গাছ—যথা ঢাক, গাব, কাঁটাল। ঢাকফুলগাছ শুধু ফুল দেয়। তারা বাক-সর্বস্ব মানুষের মতো। গাবের ফুল হয় ফলও হয়। তারা তেমন মানুষের মতো যারা কথা বলে এবং কাজ করে। কাঁটাল শুধু ফল বহন করে। তারা কথা বলে না কিন্তু কাজ করে যায়।"

এই জ্ঞানগর্ভবাণী শুনে রাক্ষস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু অচিরে সেই আসুরী কণ্ঠ চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

★

তোমরা গল্প শুনেছ মহান সলোমনের যিনি ইজরায়েলের রাজা ছিলেন, বহু বছর আগে। বাইবেল এবং অন্যান্য গ্রন্থে অনেক গল্প আছে যাতে তাঁর কীর্তি তাঁর মহিমা বর্ণিত। তাঁর সম্বন্ধে আমি একটি গল্প বলছি।

তিনি ছিলেন প্রচণ্ড ধনী। তাঁর এক অপরূপ সিংহাসন ছিল ; ছিল একটা সোনার থালা ; আর রূপা ছিল তাঁর প্রাসাদে ছড়ানো-ছেলানো জেরুসালেম শহরে পাথরকুচির মতো। সওদাগররা নিত্য তাঁর কাছে নিয়ে আসত সোনা, রূপা, গজদন্ত, নমুর, বাঁদর, সুন্দর বেশবাস, রকমারি বর্ম, মশলাপাতি, ঘোড়া, খচ্চর এবং আরো নানা ধনদৌলত। পিতৃপুরুষের ও জাতির দেবতার সম্মানার্থে রাজা সলোমনই এক অপরূপ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু মন্দির নির্মাণের আগে, পাহাড়ের উপরে কাঠকাঠারো যখন সিডারগাছ-সমারোহের রূপে ক্রমে মাথা তুলছিল তখন সলোমন এক স্বপ্নে দেখলেন ভগবান এসে তাঁকে বলছেন :

—"তোমাকে দিতে পারি তেমন বর চাও।"

সলোমন উত্তর দিলেন :

—"আমার ভাই দাউদ ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ন্যায়পরায়ণ মানুষ ; এখন তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে সিংহাসনে বসেছি আমি। সম্মুখে কাজ রয়েছে বিরাট। নিজেকে মনে হচ্ছে অপোগণ্ড। আমি প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পন্থা জানি না। যাদের রাজা তাদের কী করে শাসন করতে হয় তাও বুঝি না। অতএব আমার বাসনা জ্ঞানলাভের, যাতে শুভ আর অশুভ তফাৎ করতে পারি।"

ভগবান বললেন :

—"যেহেতু তুমি দীর্ঘায়ু অথবা ধনসম্পদ চাওনি, কিন্তু চেয়েছ জ্ঞান, এবং এমন হৃদয় যা ন্যায় অন্যায় আলাদা করতে জানে, আমি তোমাকে দিলাম এই বিজ্ঞ মন, এমনই মন যে প্রাজ্ঞতায় কেউ তাকে ছাড়িয়ে যাবে না।"

লক্ষ্য করবে রাজার উচ্চারিত নম্র বাণী : "আমি একান্ত বালক মাত্র।"

সলোমন নিজের সম্বন্ধে বিনয়-ভাষণ করেছিলেন বলে কি তাঁকে কম শ্রদ্ধা করি? বরং ঠিক উলটো, মহৎ নম্রবিনত হয়েছে দেখে একটা সত্যিকারের আনন্দ পাই।

*

পয়গম্বর মহম্মদের বিনয়সূচক তিনটি গল্প বলব তোমাদের।

জনশ্রুতি আছে যে ইসলামের এই নবী সর্বদা গাধার পিঠে চড়ে যেতেন, ধনী অহংকারী লোকেদের যেমন সর্বদাই পছন্দ ঘোড়া। কখনো কখনো নিজের পিছনে দু'পাশে পা দুলিয়ে কাউকে বসিয়ে নিতেন। এবং বলতেন

—"চাকররা যেমন করে তেমনিভাবে বসে থাই আমি, কারণ সত্যিই তো আমি চাকর।"

এবার দ্বিতীয় গল্প। একদিন পয়গম্বর উপস্থিত হলেন এক সভায় যেখানে বহু লোক জমায়েত হয়েছিল ; বসবার যথেষ্ট জায়গা ছিল না। তাই-হাঁটু ভাঁজ করেই বসে পড়লেন তিনি।

মরুদেশের এক আরব ছিল সেখানে। মহম্মদ এক মহান জননেতা জানা ছিল তার, তাই অবাক হল সে যে পয়গম্বর রাজার মতো সিংহাসনে বসে নেই।

—"এটা কি বসবার ভদ্র রীতি?" ঠাট্টা করল সে।

—"প্রকৃতপক্ষে", মহম্মদ বললেন, "আল্লা আমাকে দীনহীন সেবক বানিয়েছেন এবং উদ্ধত রাজা তো নয়।"

এবার তৃতীয় কাহিনী : কোরেশ উপদলের সর্দারের সঙ্গে আলাপে দারুণ ব্যস্ত ছিলেন মহম্মদ এমন সময় আবদুল্লা নামে একজন অন্ধ পয়গম্বরের সঙ্গে কেউ আছে না-জেনে আলাপে হঠাৎ ছেদ বাধা দিল কোরাণের কয়েক ছত্র শোনাবার আর্জি নিয়ে।

মহম্মদ তাকে কঠিনভাবে উত্তর দিয়ে চুপ থাকতে বললেন। কিন্তু পরে তাঁর কষ্ট হল এত কঠোর হবার জন্য এবং অতি বিনীতভাবে ক্ষমা চাইলেন। তারপর থেকে আবদুল্লাকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন, এবং নানা উচ্চপদে বসিয়েছিলেন।

*

রাজা ও পয়গম্বরের গল্পকাহিনীর পরে আইজ্যাক নিউটন নামে একজন বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিকের সম্বন্ধে একটি গল্প বলব।

নিউটনের জন্ম ১৬৮২ এবং মৃত্যু ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে। দীর্ঘ জীবন ভরে প্রকৃতির পাঠ নিয়েছিলেন: মাধ্যাকর্ষণ বলে পরিচিত বিশ্বব্যাপী আকর্ষণ-শক্তি, জোয়ার-ভাঁটার উপর চন্দ্রসূর্যের প্রভাব, সূর্যালোক এবং তার শুভ্ররশ্মি রামধনুর সপ্তবর্ণে চূর্ণিত হয়ে পড়া; এবং আরো অনেক বিষয়। এই যে লোকটি প্রকৃতির নানা ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিস্ময়ের এত সুন্দর অনুধাবন করেছিলেন তাতে তাঁর জ্ঞানের সম্মুখে সকলেই অবাক। একদা এক মহিলা নিউটনকে বলছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের কথা; তিনি উত্তর দিলেন:

—"হায়! বিরাট সত্য-সমুদ্রের তীরে বসে শিশুর মতো আমি নুড়ি কুড়িয়েছি।"

বুঝতে পারবে সত্যের সমুদ্র হল প্রকৃতির সেই সব নিয়ম যা মহা মহা পণ্ডিতরাও প্রায় জানেনই না। একটি শিশু সাগরবেলায় নুড়ি কুড়ায়। আর আমাদের এককৌটা চিন্তার পাশে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কত কত বিশাল!

নিউটন শিশুর সঙ্গে উপনিত হয়েছিলেন বলে তাঁকে কি কম শ্রদ্ধা করি? নিশ্চয় না। তাঁর বিনয়ের জন্য তাঁকে শ্রদ্ধাই করি।

*

বহু বছর আগে জনৈকা প্রচণ্ড গায়িকা, যিনি নিখুঁত প্রতিভা ও কণ্ঠস্বরের জন্য বিশ্ববিখ্যাত, এক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সুরেলা গলা একটি বাচ্চা মেয়েকে সেখানে গাইতে বলা হল। যে গানটুকু তাকে গাইবার জন্য শেখানো হয়েছিল সেটি দ্বৈত কণ্ঠের, দু'জনের মিলিত গলার গান। বাচ্চাটির গলাই প্রধান, কিন্তু আর কেউ তার সঙ্গে গলা দিতে চাইল না। সকলেই মনে করল একটি অপোগণ্ডের সঙ্গে ধুয়া ধরা একান্ত বানহানিকর ব্যাপার। সব নিস্তব্ধ, কেউ এগিয়ে এল না বাচ্চাটির সঙ্গে গলা মেলাতে।

তখন প্রসিদ্ধ গায়িকাটি বললেন

—"তোমার আপত্তি না থাকলে আমি সঙ্গে গাইব।"

তিনি তাই করলেন। প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিত হল সেই দ্বৈতগান; কচি মেয়েটির গলা ফুটে উঠল চড়ায় সুস্পষ্ট, আর সে-যুগের সবচেয়ে বেশি পরিচিতার কণ্ঠ তার ধুয়া ধরে চলল খাদে।

মহিলার নম্র হৃদয় মহৎ দেখাল একটি বালিকার সেবায় তাঁর অবদানের সম্মতিতে।

*

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সংস্কৃত কলেজে একজন ব্যাকরণ-শিক্ষকের প্রয়োজন হল এবং এই পদের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নির্বাচিত করা হল। এযাবৎ তিনি মাসে পঞ্চাশ টাকা পাচ্ছিলেন, এবার নতুন পদে তাঁর প্রাপ্য নব্বই টাকা। কিন্তু তিনি স্থির করলেন তাঁর চেয়ে তর্কবাচস্পতি বেশি যোগ্য ব্যাকরণ-শিক্ষক এবং তা জানিয়ে দিলেন। এভাবে স্থির হল তাঁর বন্ধুই তার স্থানে নিযুক্ত হবেন। বিদ্যাসাগর পরম তৃপ্ত হলেন। কলকাতা থেকে বেশ কিছু দূরে গিয়ে বন্ধুকে খুঁজে বের করলেন এবং তাকে খবরটি দিলেন।

তর্কবাচস্পতি পণ্ডিতের মহান নম্রতায় অভিভূত হয়ে বলে উঠলেন "বিদ্যাসাগর, তুমি মানুষ নও, তুমি নরক্রপী দেবতা।"

*

এবার একটি অহংকারী জোনাকীর গল্প।

একটি লোক উজ্জ্বল সূর্যের দিকে মাথা ফেরাল এবং বলল :

—"কী জ্যোতির্ময়।"

—"যতো আলোকময় আমাদের মতো", উত্তর দিল একটি কণ্ঠ।

লোকটি চারিদিকে তাকাল, এবং একটি ঝোপের তলায় অন্ধকারে দেখতে পেল একটি জোনাকী।

—"তুমিই কথা বলছিলে না কি?"

—"হ্যাঁ", উত্তর দিল জোনাকী। "বললাম যে সূর্য ও আমি আমরা উজ্জ্বল।"

—"সূর্য ও তুমি, বটেই তো।" রসিকতা করল লোকটি।

—"হ্যাঁ, সূর্য, চন্দ্র, তারার দল এবং আমি," বেশ নাছোড়বান্দাভাবে বলে দিল জোনাকী।

*

চারটি লোক ইতালীর এক পাহাড়ে উঠছিলেন। ওই চারজন সন্ন্যাসী। তাঁদের পুরোভাগে সেন্ট ফ্রান্সিস, তিনি সম্প্রদায়ের অপর তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে চলছিলেন। পাহাড়ের সর্বাঙ্গ গাছে ঢাকা। চূড়ায় একটা উন্মুক্ত গমভূমি—সেন্ট ফ্রান্সিস সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করতে চেয়েছিলেন এই অভিলাষে যে ওখানে ভাগবত বিষয়ে এক নবদৃষ্টি পাবেন। সন্তটি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, যেমন ধনী মালিকরা তেমনি গ্রামের গরীবরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত।

দিনটি তাপদগ্ধ এবং রাস্তা খাড়াই। ফ্রান্সিস ক্লান্তিতে চলচ্ছক্তিহীন। ফলে তাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী একটি গ্রামবাসীকে খুঁজে বের করে তার গাধাটি চাইল, যাতে সেটিতে চড়ে ফ্রান্সিস যেতে পারেন।

গ্রামবাসীটি স্বেচ্ছায় সম্মত হল; সন্ত গাধায় চাপলেন আর সন্ন্যাসীরা দু'পাশে হেঁটে চলল, সকলের পেছনে থাকল চাষাটি।

—"বলুন তো," চাষা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি ভাই ফ্রান্সিস?"

—"যথার্থ", তিনি উত্তর দিলেন।

—"তাহলে," জুড়ে দিল চাষী, "লোকে যেমন আপনাকে ভালো ভাবে তেমনটি হতেই চেষ্টা করবেন, যাতে আপনার উপর তাদের বিশ্বাস অটুট থাকে।"

সেকথা শুনে সেন্ট ফ্রান্সিস কোনো বিরক্তি দেখালেন না, কারণ তিনি যে-কোনো লোকের উপদেশ নিতেন, হোক সে রাজপুত্র কিংবা দরিদ্র চাষা। তিনি গাধার পিঠ থেকে নামলেন, অভিবাদন জানালেন চাষাকে এবং তাকে সুপরামর্শের জন্য ধন্যবাদ দিলেন।

সহানুভূতি

বিষাদের সঙ্গে বিষাদ কখন আসে?

যখন কোনো হৃদয় তা অনুভব করে এবং আমাদের হৃদয়ও তা একই সময়ে অনুভব করে।

প্রসিদ্ধ যোদ্ধা দুর্যোধন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে ধরাশায়ী হলেন এবং তাঁর বন্ধুরা এত কাতর হলেন যে যখন তিনি শায়িত ও মৃত তখন সারা প্রকৃতি মনে হল বিপর্যস্ত। বহু হাত পা বিশিষ্ট নানা কবন্ধ পৃথিবীর ওপর ভয়ংকর নৃত্য শুরু করল। হ্রদ ও কুয়োর জল শোণিতাক্ত বয়ে উঠল। নদীর জল না নেমে তার উৎসে বেয়ে উঠল। পুরুষের আকৃতি রূপ নিল নারীর এবং নারীর আকৃতি পুরুষের।

কবি আমাদের এখানে বলতে চাইছেন যে একটি মানুষের অনুভূত যন্ত্রণা ছড়িয়ে যায় বিপুলা পৃথিবীর ওপর। নিহত রাজা ও লক্ষ লক্ষ জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে সহানুভূতির যোগ ছিল।

এই সহানুভূতি কি শুধু যন্ত্রণার মধ্যেই ফুটে ওঠে? না, তা যেমন দুঃখের মধ্যে তেমনি আনন্দের মধ্যেও দেখা দেয়।

শোনো হরিণশিশু নাশীয়র গল্প, সে তার পিতামাতার সঙ্গে শান্তির দিনেও কাজের ছিল, অন্ধকারে দুর্দিনেও কাজের হয়েছিল।

যে বনে কোশলরাজ প্রায়ই মৃগয়ায় যেতেন সেখানেই নাশীয় তার বাপ-মায়ের সঙ্গে পারস্পরিক প্রেম ও শান্তিতে বসবাস করছিল। যখন তিনি মৃগয়ায় বেরুতেন তখন রাজ্যের বহুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতেন, বহু কোশলবাসীকে তাঁর সেবক ও ভৃত্যরূপে তাঁর অনুসরণ করতে হত; এতে বহু লোকের কাজের ব্যাঘাত হত এবং ফলে যে লোকসান তাদের সহ্য করতে হত তা নিয়ে গুরুন উঠত।

ফলত লোহার শিক ও কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা পার্ক তৈরি হল—তার মাঝখানে একটা পুকুর, তখন সকলে জঙ্গলে গেল যত হরিণ তাড়িয়ে সেই পার্কে নিয়ে আসতে, যাতে রাজা মৃগয়ার জীব হাতের মুঠোর মধ্যে পান এবং তাঁকে আর বিরাট দলবল নিয়ে শিকারে ছুটতে হয় না।

লাঠি হাতে জনতাকে আসতে দেখল নাশীয়। একটা ছোট ঝোপে বাপ-মার সঙ্গে ঘাস খাচ্ছিল সে।

—"দাঁড়াও এখানে," বাবা মাকে বলল সে, "ওদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।"

একলা বেরিয়ে এল সে, লোকেরাও ঝোপের মধ্যে আর জানোয়ার নেই ভেবে তাকে নিয়ে এল বাইরে।

ঝোপের মধ্যে যে-দুটি হরিণ ছিল তাদের ছাড়া অন্য সবাইকে রাখা হল পার্কে। রাজা সন্তুষ্ট, প্রয়োজনমতো দলের কাউকে তিনি তীর ধনুক দিয়ে শিকার করতেন। নাশীয়র পালা আসতে অনেক সময় কেটে গেল।

শেষমেষ যখন সে-সময় এল, নাশীয় তখন রাজার সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল, আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টা না করে।

এরকম অনভ্যস্ত ব্যবহার দেখে রাজা এত বিস্মিত যে তীর আর ছুঁড়লেন না। ধনুক নামিয়ে তিনি অপেক্ষা করলেন।

—"ছুঁড়ুন, মহারাজ," নাশীয় বলল।

—"পারছি না। হরিণশাবক, তোমার মধ্যে সত্যকার পদার্থ আছে। তোমার জীবন ফিরিয়ে দিলাম।"

—"রাজা, এই পার্কে বাকী যত হরিণ আছে তাদের ছেড়ে দেবেন না?"

—"রাজী হলাম।"

—"রাজন্, আপনার অনুগ্রহ কি আকাশে পাখিদের উপর এবং জলে মাছের উপর বর্ষণ করবেন না?"

—"রাজী হলাম।"

পুরাকাহিনী বলছে এই হরিণটি হলেন বুদ্ধদেব; তিনিই বললেন রাজাকে, তাঁকে শেখালেন জীবে দয়ার রীতি। রাজা তারপর এক দূত পাঠালেন রাজ্যের সর্বত্র ঢাক পিটিয়ে জানাতে যে তাঁর রক্ষণাদেশ থাকল হরিণ পাখি মাছের উপর।

তোমরা অক্লেশে বুঝেছ পিতামাতাকে বাঁচিয়ে নাশীষ ঠিকই করেছে। ভাইবোন-দের সাহায্য করাও ভাল হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী গল্পে দেখতে পাবে এক আরব রাজপুরুষ কেমন একজনকে সত্যকার ভাই না হলেও ভাই ডেকে কথা বলছেন।

এক যাত্রীদল মরু পার হচ্ছিল, তখন জলের ঘাটতি দেখা দিল। আরব যাত্রীরা বাধ্য হল জল মেপে নিতে যাতে প্রত্যেকে অল্প এবং সমান ভাগ পায়।

একটা পেয়ালায় পাথরকুচি রেখে তারা মাপছিল। অন্য পেয়ালা থেকে জল ঢালা হত যতক্ষণ না পাথরটি ডুবে যায়। প্রত্যেকের জন্য এইটিই মাত্রা।

শুধু দলের প্রধান ব্যক্তিরাই জলের অংশভাগী ছিলেন।

এমনিভাবে প্রথমবার জলের ভাগ মাপা হল। কাব-ইবু-নানা যখন পেয়ালা মুখে তুলবেন এমন সময় দেখলেন নমির উপজাতির একজন সতৃষ্ণ নয়নে তা দেখছে। কাব পরিবেশককে বললেন, নমিরের লোকটিকে দেখিয়ে

—"আমার ভাগ এই ভাইকে দাও।"

লোকটি ঢকঢক করে গিলল। কাব জল পেলেন না।

পরের দিন আবার জল বণ্টনের সময় এল।

এবারও নমিরের লোকটি সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রইল। যাকে তিনি 'ভাই' বলেছিলেন তাকে আবার নিজের পেয়ালাটি দিলেন।

কিন্তু দলের যখন যাত্রার সময় এল তখন কাবের উটের পিঠে উঠবারও শক্তি নেই।

বালির উপর চিৎপাত পড়ে থাকলেন তিনি।

অন্যরা আর দাঁড়াতে সাহস পেল না, ভয় যে পেয়ে সবাই তৃষ্ণায় মারা যাবে। তাকে শিকারী পশুর হাত থেকে রক্ষার জন্য চাদর-চাকা দিয়ে সেখানে নবতে ফেলে রেখে গেল তারা।

সাদা হাতি

একটা দুর্ধর্ষ সাদা হাতির নেতৃত্বে—দলের সকলে যাকে রাজা বলে মানতে গর্ব বোধ করত—৮০ হাজার হাতির এক পাল হিমালয়ের জঙ্গলে চরে বেড়াচ্ছিল।

রাজার মা ছিল অন্ধ।

অরণ্যের দূর দূর অঞ্চলে দল নিয়ে ঘুরলেও তার মা'র জন্য কিন্তু মমত্বপূর্ণ চিন্তা থাকতই এবং তাকে দূত মারফৎ নানারকম ফল পাঠাত।

হায়! দূতরা নিজেরাই সে সমস্ত ফল খেয়ে ফেলত, আদরের এ সব উপহার অন্ধ মায়ের কাছে পৌঁছুত না। বকুনি খেতে পেরে রাজা স্থির করল সে দল ছেড়ে দেবে ও নিজে মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। তখন মা'কে সে নিয়ে এল একটা হ্রদের পারে, কাশ্যপ পাহাড়ের এক গুহায়, এবং দু'জনে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

একদিন বারানসী শহরের একটি লোক সে-জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলল এবং দলবিচ্ছিন্ন হয়ে সাতদিন ধরে ঘুরপাক খেল।

গজরাজ নতজানু হয়ে বিভ্রান্ত মানুষটিকে তার পিঠে উঠতে আমন্ত্রণ জানাল, পরে বারানসী যাবার পথে নিয়ে তাকে রাস্তা দেখিয়ে দিল।

হায়! মানুষটির হৃদয় কুটিল। সে বারানসীর রাজাকে বলল কি অপূর্ব শ্বেত হস্তি পাওয়া যায় কাশ্যপের গুহায়, আর রাজাও তাকে বহু অনুচর দিয়ে পাঠাল সেই রাজকীয় হাতিটি ধরতে। অনুসরণকারীরা দেখতে পেল সাদা হাতি হ্রদের জলে দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে বেঁধে ফেলল কিন্তু সে-ও বাধা দিল না; তারা তাকে বারানসীতে নিয়ে এল।

ছেলে ফিরে এল না দেখে অন্ধ মা বিষাদমগ্ন হল।

—"আঃ," দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তার, "চন্দনগাছ বেড়েই চলেছে, তেমনি বুড়চি, ঘাস, ঝোপঝাড়, পদ্ম আর নীল কলকেফুল, কিন্তু আমার বাছা, কোথায় সে?"

সাদা হাতির ফুলভারে শোভিত এক ধোঁয়াড়ে স্নান হল, রাজা নিজে এলেন তাকে খাওয়াতে। কিন্তু হাতির তাতে কিছুমাত্র স্পৃহা নেই।

—"আমার মা তো এখানে নেই," সে বলল।

—"নাও, নাও," আবেদনের সুরে বারানসীরাজ বললেন, "বন্ধুর মতো খেয়ে নাও।"

—"আহা, বেচারী অন্ধ কাশ্যপের গুহায় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে।"

—"কার কথা বলছ?" রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

—"আমার মা আমার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।"

রাজা তখন হুকুম দিলেন হাতিকে ছেড়ে দিতে, বিরাট পশুটিও শহর ছেড়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল; পুষ্করিণী থেকে কিছু জল নিয়ে ছুটল সে গুহায়, অন্ধ মাকে সেই স্নিগ্ধ ধারায় অভিসিঞ্চিত করে দিল।

মা বলে উঠল:

—"বৃষ্টি পড়ছে। হায়, ছেলে এখানে নেই যে আমার যত্ন নেবে।"

—"মা," বলে উঠল সে, "এই তো আমি তোমার ছেলে, রাজা আমাকে ফেরৎ পাঠিয়েছেন।"

তখন দুজনে সুখী।

মা মারা গেলে তার দাহকার্য হল, এবং যথাকালে সাদা হাতিটিও মারা গেল। রাজা তার আকৃতি অনুসারে এক পাথরের প্রতিমূর্তি গড়ালেন এবং ভারতবর্ষের সকল প্রান্ত থেকে লোকের ভিড় প্রতি বছর এসে এই গজোৎসবে যোগ দেয়।

রঙ্গনাথ ও তার পিতা

১৮৩১ সালে বারো বছরের জনৈক ভারতীয় চিঙ্গুয় জেলার এক জজসাহেবের দরজায় গিয়ে করাঘাত করল। সে যে কৃষকের পুত্র তার খাজনা দিতে না পারায় জেল হয়েছে। কৃষক কিছু সরকারী জমি নিয়েছিল, কিন্তু ফসল হয়নি এবং প্রচলিত আইন অনুসারে তাকে জেলে যেতে হল।

জেলবাসকালে পিতাটির জন্যদিন এল, সে কাঁদতে লাগল কর্তা বাড়িতে উপস্থিত থাকতে পারবে না বলে। এই জন্যই রঙ্গনাথ ছুটে গিয়েছিল চিঙ্গুয়ে এবং বিচারকের দুয়ারে গিয়ে করাঘাত করেছিল।

জজসাহেব বালকের কাহিনী শুনে বললেন

—"তোমার বাবাকে আমি তো ছেড়ে দিতে পারি না যতক্ষণ না প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি যে ফিরে এসে সে জেলের মেয়াদ কাটাবে।"

—"আমাদের টাকাপয়সা নেই," বালক উত্তর দিল, "কিন্তু নিজে আমিই হব জামিন, বাবার বদলে আমিই থাকব জেলে।"

জজসাহেবের হৃদয় স্পর্শ করল। তিনি পিতার মুক্তির হুকুম সই করলেন। হরিণের মতো রঙ্গনাথ দ্রুত ছুটে গেল জেলে। পিতাপুত্র সানন্দে গৃহাভিমুখে রওনা হল এবং রাত্তিরে সেখানে গিয়ে পৌঁছুল।

রঙ্গনাথ পরে রঙ্গনাথ শাস্ত্রী বলে সুপরিচিত হয়েছিলেন। তিনি পনেরটি ভাষায় লিখতে ও বলতে পারতেন।

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১৬ জুন, ১৯৫৪

মা Elements of Yoga, Chap. XIX থেকে "Difficulties and Progress" (বাধাবিঘ্ন ও অগ্রগতি) অধ্যায়টি পড়ে শোনালেন।

প্রশ্ন অন্যের সম্বন্ধে ভালোমন্দ চিন্তা করতে থাকলে কি এর কোনো প্রভাব তার উপরে ঘটতে পারে?

উত্তর: হাঁ, সে প্রভাব তার উপরে গিয়ে পড়বে।

প্রশ্ন: একজনের ভিতরকার কামনাবাসনা বা সংশয় প্রভৃতি জিনিসও কি অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে?

উত্তর সব কিছুই একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে যেতে পারে। সারা দুনিয়ায় নিত্যই তা হচ্ছে।

তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন মধুময়ী মা, অন্য অন্য জিনিস যেমন সহজেই আমরা পেতে পারি, তেমনি ক'রে ভগবানকেও কেন পাইনা?

উত্তর: "অন্য জিনিস" বলতে তুমি কি বুঝেছ?

তোমার প্রশ্নটি ঠিক ভাবে বলা হয়নি। এখানে আমাদের কথা হচ্ছিল একের প্রভাব অন্যের মধ্যে যাওয়া নিয়ে, সেই অর্থেই কি বলছ? অর্থাৎ প্রতিবেশীর অশুভ ইচ্ছা যেমন সহজে তোমার মধ্যে আসতে পারে, তেমনি ভাবে ভগবানও কেন আসেন না? এই বলতে চাইছ?

এর কারণ ঐ দুটি জিনিস একই স্তরের নয়। প্রতিবেশীর শুভ বা অশুভ ইচ্ছা হল এক স্তরের জিনিস, আর ভগবান সম্পূর্ণ অন্য স্তরের। এই হল কারণ। যথা, তোমার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আছে এমন স্তরের জিনিস অনায়াসেই তুমি পাবে, কিন্তু তোমার চেয়ে খাড়া অনেক উপরের দিকে যা থাকে তাকে পাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হবে। তার জন্যে তোমাকে সেই উপরের দিকেই চাইতে হবে, আপন অন্তরের মধ্যে সেইদিকে নিজেকে খুলে রাখতে হবে, তখন সে জিনিস তোমার আয়ত্তের মধ্যে নেমে আসবে, কিন্তু অন্যদিকে নজর দিলে...যেমন কাজ চাওয়া সর্বদাই তুমি ক'রে থাকো...এবার বুঝলে কি?

দুঃখের কথা এই যে উপরের দিকে উজিয়ে ওঠার চেয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে যাওয়া অনেক সহজ। অনেক সহজ নিচের দিকে যা টানছে তাতে সায় দিয়ে নেমে যাওয়া, উপরের দিকে যা টানে তাতে সায় দিতে উঠতে পারার চেয়ে। বস্তুত ওঠার চেয়ে নামাই সহজ, তাই নয় কি? কোথাও গিয়ে তোমাকে যদি পাহাড়ে চড়তে হয় তাহলে তা কঠিন ব্যাপার হয়, কিন্তু সেখানে যদি তার গা বেয়ে গড়িয়ে নিচে নামতে হয় তবে তা খুবই সহজ কাজ হয়। তাই নয় কি?

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, যে ব্যক্তি ভগবানকে উপলব্ধি করে, তার আর কেউ শত্রু থাকেনা এ কথাটা ঠিক বটে তো ?

উত্তর : মা, তাই কি ? কেন শত্রু থাকবে না ? বরং আমার ধারণা ঠিক তার উল্টো।

প্রশ্ন : বিরোধী শক্তিদের ক্রিয়াতেই বুঝি তেমন হয় ?

উত্তর : হাঁ, নিশ্চয়। সারা পৃথিবী ছেয়ে আছে তাদের শক্তিক্রিয়াতে, আবার মানুষও আছে অনেক যারা তার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে, সেইজন্যে যতই তুমি ভগবান উপলব্ধির দিকে যাবে ততই ওরা তোমাকে ঘিরে আগলে ধরবে।

প্রশ্ন : তারা কি ভগবানের বিরুদ্ধেই কাজ করে ?

উত্তর : নিশ্চয়। অন্ততপক্ষে তারই চেষ্টা করে, তাতে তারা সফল হয় কিনা বলতে পারি না, তবে চেষ্টা বরাবরই করতে থাকে।

প্রশ্ন : কেন করে ? ভগবান তো কারো কোনো অনিষ্ট করেন নি ?

উত্তর : (হেসে) তুমি কি ভাবো যে কেউ কারো অনিষ্ট করলে তবেই সে তার বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে ? তা তো নয়, বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো জিনিস হয়। বলতে পারো কি, যারা বলবান তারা দুর্বলের উপর খামকা অত্যাচার করে কেন ? দুর্বল তাদের কোনোই অনিষ্ট করে না, তবু শুধু জোর আছে বলে সেই জোরের দ্বারা তারা দুর্বলকে পদানত ও বাধ্য ক'রে তার দ্বারা আপন কার্যসিদ্ধি ক'রে নেয়, আর সেইজন্যে তারা অবশ্য তাদের পীড়ন করে আর সুবিধা পেলেই দুর্ব্যবহার করতে ছাড়েনা। সেই দুর্বল মানুষটি কিছু ভুল বা অন্যায় করেছে বলে নয়, কেবল শক্তি আছে বলেই তার খুশিমত অপপ্রয়োগ ক'রে আপন খেয়ালকে চরিতার্থ করে।

মনে করে দেখ, সারা বিশ্ব জুড়ে এমন অদিব্য শক্তিরা রয়েছে যাদের কাজই হলো সব কিছুকে আপন দখলে রাখা, তেমনি সব আসুরিক শক্তির দল পৃথিবীতে নিজেদের রাজত্ব গর্বদার জন্য বজায় রেখেছে। তাদের দখল তারা কোনোমতে ছাড়তে চায় না, যখনই দেখে যে অন্য কোনো শক্তি এসে তাদের হটাতে চাইছে তখনই তারা প্রাণপণে সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে থাকে, তাদের পুরাণো দখল বজায় রাখতে। কিন্তু তাই বলে... তাই বলে তারা যে খুব খারাপ বা ক্রূর এমন মনে কোরোনা, কেবল তফাৎ এই যে তাদের ভিতরকার শক্তি এবং আলো অন্যান্য শক্তির চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

প্রশ্ন : মা, শোনা যায় যে অসুরদের মধ্যেও ভগবানের কিছু অংশ থাকে ?

উত্তর : হাঁ, সেটা স্বাভাবিক।

প্রশ্ন : তাহলে যখন আসল ভগবৎ শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে তখন তাদের ভিতরকার সেই অংশটুকু কি করে ?

উত্তর : সে অংশটি তখন ভগবানেই ফিরে যায়। শেষ পর্যন্ত সে নিজেও ভগবানে

বিলীন হয়ে যায়। তোমরা সেই গল্প তো জানো, সেই রামায়ণে যা পড়েছো। এই অর্থে তা সত্যি কথা।

প্রশ্ন ভগবৎ অংশটুকু ফিরে গেলে তো ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই নয় কি? ভগবানের সে অংশ যখন থাকবেই না?

উত্তর আমি এমন অনেককে জানি যারা চৈত্যকে বর্জন করেও টিঁকে রয়েছে। অথচ যুক্তি অনুযায়ী চৈত্য ছাড়া কারো বাঁচার কথা নয়, তবু তারা বেঁচেই থাকে। হয়তো সেই রকমই দরকার, আধেরে আসুরিক শক্তিদের বিনাশের জন্য, হয়তো ভগবান সমগ্র সৃষ্টি নিজের মধ্যে নিতে চান, কারণ এরা আছে সৃষ্টির গোড়া থেকে।

প্রশ্ন : তাহলে রূপান্তর কেমন ক'রে হবে সমস্তই যদি ফিরে না নেন?

উত্তর : তাহলে সে তো প্রলয় হয়ে গেল! রূপান্তর না হয়ে এই পৃথিবীর বিলোপ হয়ে গেল। কথিত আছে যে সৃষ্টি ছয় দফা করা হয়ে গেছে, অর্থাৎ এই বিশ্ব ছয় বার সৃষ্ট হয়ে পরে আবার তার মূল উৎসে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। শাস্ত্রে বলেছে এ কথা, তোমরা তো জানো—তাতে আরো বলেছে যে এবারকার সৃষ্টি হলো শেষ বারের জিনিস, কিন্তু এখনও তার কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ এর মধ্যে অনেক কিছু ঘাটতি রয়ে গেছে, একে এখন একবার গুটিয়ে না নিলে আবার নতুন ক'রে গড়া যায় না। কিন্তু তথাপি আরো বলা হয়েছে যে এবারকার এই সপ্তম সৃষ্টিই হলো চূড়ান্ত, একে আর গুটিয়ে নেওয়া হবে না, ক্রমশ একেই রূপান্তরিত ও ত্রুটিমুক্ত করা হবে, যাতে আবার গুটিয়ে নেবার প্রয়োজন না হয়।

প্রশ্ন : এই সব কথার কতখানি সত্য?

উত্তর : তা আমরা দেখতেই পাবো।

প্রশ্ন কিন্তু আগের ছয় বারের সৃষ্টি, তাও কি এইভাবে গড়েছিল?

উত্তর : আগেকার ছয়বারের সৃষ্টি এই ভাবেই গড়েছে। তখন বিশেষ কতকগুলি গুণ জুগিয়ে দিয়ে সৃষ্টি করার আদেশ দেওয়া হলো। আমি সে কথা জানি (কোথায় তা লিখেও রেখেছিলাম কিন্তু সে লেখা এখন আমার কাছে নেই, এখন তা বলতে গেলে ভুল হয়ে যাবে, একদিন তা এনে তোমাদের দেখাবো)। এখন এই পর্যন্ত জানি যে এবারকার সৃষ্টি সামঞ্জস্য-গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই বলা হয় যে প্রত্যেক জিনিসটি যদি যথাযথ স্থানে রাখা থাকে আর প্রত্যেকের ভারসাম্য ঠিক ঠিক বজায় থাকে, তাহলে অন্তত নষ্ট কিছু হবে না। যা দোষ হয় তা এই শুধু সামঞ্জস্যের অভাবে। নতুবা মন্দ বলতে কিছু নেই, শুধু অবস্থাভেদ। অর্থাৎ যথাযথ স্থান থেকে সরে গেলেই এই সব গণ্ডগোল হয়।

প্রশ্ন : তাহলে অসুরেরা কোন অবস্থাতে চলে যাবে?

উত্তর : ভগবানের মধ্যেই ফিরে যাওয়া। অসুর ছিল প্রথমে চার জন। তার মধ্যে দুজন তাদের অসুর-ধর্ম বদলে ভগবানের অভিপ্রেত কাজ করছে। বাকি দুজন এখনও

আসুরিক ভাবেই চলছে। কতকাল এমনি চলবে? সেটা দেখা যাক। হয়তো তাদের এ আচরণ ছেড়ে আগের শুদ্ধ অবস্থাতে ফিরে যেতে হবে, নতুবা বিলোপ, অর্থাৎ খতম হয়ে মূল উৎসে মিলিয়ে যাওয়া।

ওদের মধ্যে একজন চেষ্টা করেছিল আসুরিকতা বদলাতে কিন্তু তা পারলে না। ভালো ধর্মে যেতে গিয়ে দারুণ অস্বস্তি বোধ হলো, আপাতত তাই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে। পরে কখনো হয়তো আবার চেষ্টা করবে।

আর অপর জন চেষ্টা করতেও নারাজ। সেই এখনকার জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক'রে আছে। যারা অজ্ঞান তারাই তাকে মানে আর বলে, "জগতের বিভিন্ন জাতি-সকলের প্রভু"। (আগেই বলেছি সেই সব শক্তির কথা যারা এখনকার জগতে রাজত্ব করছে, তাদের দখল কোনোমতে ছাড়ছে না, ওতেই তাদের আনন্দ, সে আসলে ওরই শক্তি। সেই অসুর বিলক্ষণ জানে যে একদিন এর শেষ হবে, তবু যতটা পারে তা পিছানো যায়।

কিন্তু মানুষদের কালের মাপ তো ওদের মতো নয়, তাই ওর শেষ আসতে দীর্ঘকাল লাগবে, তাই নয় কি? যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মানুষের তরফ থেকে ওরা সমর্পন ও খোরাক পাবে, ততক্ষণ সে টিঁকে থাকবে। তাহলে সমস্যাটি বুঝে দেখ। অসুর কেবল ব্যক্তিগত দিক দিয়ে কাজ করেনা, তার কাজ হল সামগ্রিকভাবে, জাতিগত ভাবে।

প্রশ্ন না, ঐ চারজনের মধ্যে কোন দুটি শক্তি তাদের ধর্ম বদলে নিয়েছে?
উত্তর তুমি কি জানো ঐ চারজন অসুরকে?

প্রশ্ন না, তা জানিনা।
উত্তর কোথা থেকে ওদের চারজনের উৎপত্তি তাও কি জানো? (অন্যদের দিকে ফিরে) তোমরা কে তা বলতে পারো?
জনৈক শ্রোতা না, তুমিই বলেছিলে একবার এই ক্লাসে।
উত্তর: হাঁ, সেইজন্যই তো এখন জিজ্ঞাসা করছি, দেখি আমি যে কথা বলি তা তোমরা স্মরণ রাখো কিনা।
শ্রোতা: তুমি বলেছ যে ওরা আগে ছিল চারটি ভগবৎ শক্তি—প্রেম, আলো, সত্য, আর মৃত্যুর বিপরীত।
উত্তর সেটা আর কি?
অন্য শ্রোতা (হাসতে হাসতে) আর জীবন।
উত্তর: আ।
শ্রোতা তারপর তারা ভগবান ছেড়ে মিথ্যার দিকে পরিবর্তন নিলে।
উত্তর: হাঁ, কতকটা তাই বটে। ঐ রকমই। যে ছিল আলো সে বেছে নিলে অন্ধকারকে, চেতনা চলে গেল অচেতনাতে, আনন্দ সে গিয়ে ভর করলে ঘৃণা ও নিরানন্দের উপর, সত্য বরণ ক'রে নিলে মিথ্যাকে, আর জীবন বরণ করলে মৃত্যুকে। ওর মধ্যে প্রথম যে জন সে যদিও এখন ফিরে গিয়ে তার আজ করছে, কিন্তু সাধারণ মানবদেহ নিতে

চায় না, কারণ তাতে সে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। হয়তো পরে সে এতে রাজি হতে পারে, কিন্তু আপাতত নয়। আর দ্বিতীয় জন স্বেচ্ছায় পূর্বাবস্থা নিয়েছে। কিন্তু শেষের দুজন এখনও তাদের ছাপটা বজায় রেখেছে।

যে জন মৃত্যু ছেড়ে চেয়েছিল আগের অবস্থায় ফিরে যেতে, কিন্তু তা সে পারলে না, জীবনে যেন্না খুবই দুরূহ। যা ফল হলো তা আংশিক মাত্র, পুরোপুরি নয়। সেটা হওয়া ওর পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ মানুষের দেহটা তো একটুখানি মাত্র, এবং তার চেতনাটুকুও তাই। সংকীর্ণ ও সীমিত।

আর শেষের জন কখনো কখনো বিভূতিরূপে এসে মানুষের দেহে ঢুকে পৃথিবীতে সম্প্রতি কিছু কিছু মহৎ ও কল্যাণের কাজ করেছে।

প্রশ্ন মা, অসুরেরা পরস্পরে মারামারি করেনা?

উত্তর হাঁ, করেই তো। নিশ্চয় করে। কিন্তু যে সব মানুষের উপর ওরা ভর ক'রে তাই করে, তাদেরকে আমি বরং পছন্দই করি। পরস্পরে হয় তারা পরস্পরের প্রবল শত্রু। সেটা একরকম মঙ্গলই বলবো, কারণ পরস্পরে মিলমিশ থাকলে ওরা আরো দুর্দান্ত হয়ে উঠতো। বোধ করি জগৎ পরিচালনার আইনই তাই, ওতে বিভিন্ন অসুরদের প্রভাব কার কতখানি তা যাচাই হয়। কিন্তু তথাপি...বিদ্যার যিনি মূল মালিক তার প্রভাব অনেক বেশি। সে প্রভাব অনায়াসে সংক্রামিত হয় ছোঁয়াচে রোগের মতো। তার চেয়েও বেশি।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, বিদ্যাশক্তি কি তার বিভূতি পাঠাতে চেষ্টা করেনি?

উত্তর চেষ্টাও সে করেছে আর পাঠিয়েওছে এই পৃথিবীতে তার বিভূতি, কিন্তু নিজেকে বদলে নয়, তা সে পারেনি।

প্রশ্ন মানুষেরই দিকে বিরোধী শক্তিদের এত আক্রোশ কেন? মানুষ তো নিতান্ত সীমাবদ্ধ সামান্য নিরীহ জীব।

উত্তর তাই তো হয়ে থাকে। পারে বলেই করে। আর তারা কেবল একটিমাত্র মানুষকেই ধরে না। পার্থিব পরিস্থিতির উপর দখল আসতে না পেরে যাদের মধ্যে তার অভিব্যক্তির সুযোগ সব চেয়ে বেশি তাদেরই গিয়ে ধরে। মানুষের দেহের আশ্রয়ে এরা যে পুরো ক্রিয়া প্রকাশ করতে পারেনা, তার কারণ খুবই সোজা।... মানুষের দেহে রয়েছে চৈত্যসত্তা, এমন কোনো অসুর নেই যে সেই চৈত্যসত্তাকে চিরদিন দাবিয়ে রাখতে পারে। যদিও সে প্রাণপণ চেষ্টা করে তার বাঁধনে বাঁধা না পড়তে, তবু কেবল ব্যর্থ হতেই হয়। সেইখানেই তার অস্তিত্বের বিধ্বংস ঘটে।

প্রশ্ন : মধুময়ী মা, শ্রীঅরবিন্দ যে বলেছিলেন মানবীয় প্রেম থেকে দিব্য প্রেমে যেতে পারার কথা—

উত্তর : হাঁ, কিন্তু তিনি বলেছেন সেই রকমের মানবীয় প্রেমের কথা যা ভগবানের উপর ভক্তি রূপে প্রকাশ পায়। প্রথম দিকের সেই ভক্তি বা প্রেম হয় নিতান্তই মানবীয়,

কারণ তার মধ্যে সেই ধরনেরই মত সব লক্ষণ থাকে, কিন্তু পরে তা ক্রমশ গভীর ও উচ্চতর হতে হতে আত্মাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে তখন তা তদ্ভাবৎ প্রেমে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। শ্রীঅরবিন্দ কখনই এমন কথা বলেন নি যে মানুষে মানুষে সাধারণত যে প্রেম হয় সেই জিনিসই দিব্য প্রেমে পরিণত হতে পারে। তা সম্ভব নয়, বরং তার উল্টো রকমই হয়। কোনো সাধক তাঁকে এই দিব্য প্রেম নিয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি বলেছিলেন যে প্রথম দিকের যে ভক্তিমুখী প্রেম তা হয় মানুষের প্রেমেরই মতো, তার মধ্যে পাল্টোয়াপী বা লেন-দেনের ভাবই প্রবল থাকে, কিন্তু ক্রমশ তা গভীর ও উচ্চতর হতে থাকলে শেষে খাঁটি ভক্তি বা শুদ্ধা ভক্তি বা দিব্য প্রেমেতে গিয়ে পৌঁছয়।

প্রশ্ন : মা, শ্রীঅরবিন্দের বই-এর মধ্যে কখনো কখনো তার ভিতরকার বিশেষ কয়েকটি অধ্যায়ের প্রতি আমার বেশি রকম আকর্ষণ হয় কেন,—যেমন এই ঐকান্তিকতা বা আশ্পৃহার অধ্যায় ?

উত্তর : তুমি বলছ ঐ অধ্যায়গুলি পড়তে বেশি আগ্রহ হয় কেন ? হয়তো তার ভিতরে যা বর্ণিত হয়েছে সেই জিনিসই তোমার পক্ষে জানা প্রয়োজন। সেই বিশেষ জিনিসেরই দরকার রয়েছে তোমার সত্তাতে, তাই তারই কথা ভালো ক'রে তুমি শুনতে বা জানতে চাও। এমন কি স্থূল জিনিসের সম্পর্কেও তা হতে পারে যা তোমাদের প্রায়ই আমি দিয়ে থাকি। শোনো এমনও হয় যে তোমার মধ্যে যদি কোনো কিছু বাধা থাকে বা সমস্যা থাকে যার সমাধান তুমি পেতে চাও ও সে জন্যে সাহায্য পেতে চাও, তখন যদি খুব একাগ্রতা এনে এই বইটির মধ্যে যে কোনো জায়গাতে পাতা-বার্কারের ফলা ঢুকিয়ে দিয়ে পরে সেই নির্দিষ্ট পাতাটি খুলে দেখ যে তাতে কি লেখা আছে, তাহলে দেখবে যে তোমার সেই প্রশ্নেরই জবাব সেখানে রয়েছে। এই হলো সাহায্য পাবার একরকম স্থূল পন্থা, তেমনি এও হয় যে তোমার মনের মধ্যে নিবিষ্টতা থাকলে বইটির কোনো অধ্যায়ের উপরকার শিরোনামা দেখেই তোমার মন বলে ওঠে, "ওহো, ঠিক এই জিনিসই তো আমি খুঁজছিলাম, তার ভিতরে কি লেখা রয়েছে সে কথা না জেনেই, তথাপি তোমার মন বলছে যে তোমার সমস্যার জবাবটা ওরই মধ্যে পেতে পারো।

তা ছাড়া তুমি অকস্মাৎ এমন সব মানুষের দেখা পাবে যে তোমার কাছে এসে, তুমি কোনো উত্থাপিকানন্দ না করলেও একটা বই তোমার হাতে দিয়ে হয়তো বলবে, এই বইটা পড়ো, এতে তোমার উপকার হবে। আবার তুমি কোনো বাড়ির মধ্যে ঢুকেই হয়তো দেখবে যে টেবিলের উপর এমন একটি বই পড়ে আছে যার মধ্যে তোমার আকাঙ্খিত জিনিস রয়েছে। এই সব জিনিস ঘটা অনেকটাই নির্ভর করে তোমার ভিতরকার আন্তরিক আশ্পৃহার উপর। তোমার আশ্পৃহা তেমন আন্তরিক হলে তোমার আশপাশের সব কিছুই নিশ্চয় তোমার সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ সেই সহায়তা তোমার ক্রমোন্নতির পক্ষে নতুন সাহায্য কিছু মিলিয়ে দেবে, কিংবা তোমার প্রকৃতির মধ্যে যা বর্জনীয় তাকে বর্জনও করিয়ে দেবে। এটা খুবই আশ্চর্যের কথা যে তোমার আশ্পৃহা যথেষ্ট তীব্র ও ঐকান্তিক হলে এমন কোনো ঘটনা নেই যা তোমার সেই আশ্পৃহাটির পূরণে কিছু সাহায্যে না করে। প্রত্যেক জিনিস এমন ভাবে এসে হাজির হবে, যেন

কোনো সর্বজ্ঞ মহাচেতনা সঠিক যোগাযোগ করে সেগুলিকে এনে জুটিয়ে দিচ্ছে। অজ্ঞতাবশত তুমি হয়তো তার মূল্য বুঝলেনা, হয়তো তাকে বাধা দিতে বা প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, প্রতিবাদ ক'রে অবস্থাটি বদলাতেও ইচ্ছা করলে। কিন্তু এরপরে যখন তোমার কিছু জ্ঞান জন্মাবে তখন দেখবে যে ঠিক সেই জিনিসই তোমার উন্নতি আনবার পক্ষে আবশ্যক ছিল। তুমি তখন জানবে যে এক অদৃশ্য শুভেচ্ছা শক্তি সর্বদা তোমাকে ঘিরে থেকে সব কিছু প্রকৃত প্রয়োজনে জুটিয়ে দিচ্ছে, এমন কি যদি তুমি সেটা মেনে না নিয়ে বিরক্ত হয়ে তাকে ঠেলে ফেলতে চাও, তখনও ঠিকই তার কাজ হবে।

আগামী সংখ্যা "বুলেটিনে" আমি ছোটো একটু লেখা দিয়েছি—কথাগুলি এখন ঠিক মনে নেই, তার মোট ভাবটি এই যে, তুমি যদি পুরো আত্মার সঙ্গে ভগবানকে ডেকে বলো, "আমি শুধু তোমাকেই চাই" ভগবান সে কথা শুনবেন। তবে তোমার আত্মা ও একাগ্রতা পুরোপুরি খাঁটি হতে হবে। নতুবা তোমার সত্তার একটা কোনো অংশ বলছে "তোমাকেই চাই"—এই আশ্পৃহা সেখানেই জেগেছে, আর এদিকে তুমি কত কি একশো রকমের জিনিস কামনা করে চাইছ, ঠিক কথা নয় কি? আবার কখনো এমন ব্যাপারও হয় যে হঠাৎ কোনো বিশেষ ঘটনাচক্র এসে বিপরীত ভাবে তোমার সব আশ্পৃহাকে বিগুড়ে দিলে। কিন্তু ভগবান তখন কি করেন, নিজেকে গোপন রেখে তোমাকে কিছুমাত্র টের পেতে পর্যন্ত না দিয়ে তোমার আশ্পৃহার সাফল্যের পক্ষে যা কিছু অন্তরায় হয়ে আছে তাকে বেমালুম সরিয়ে ফেলেন। তুমি তখন যদিও চেঁচামেচি ক'রে তার প্রতিবাদ করতে থাক, তথাপি পরে যখন আশ্পৃহার কথা স্মরণ ক'রে স্থির হয়ে নিজের দিকে তাকাও...তখন মনে পড়বে যে ভগবানকে তুমি বলেছিলে, "আমি শুধু তোমাকেই চাই", তাই সমস্ত বাধাকে ছেঁটে ফেলে দিয়ে তিনিই শুধু তোমার রইলেন। এটি হলো আরো উচ্চতর কৃপার কাজ।

সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে সমগ্র সত্তা দিয়ে ও কথা তখনই বলতে হবে তা আমি বলছি না, কিন্তু কেবল এক অংশও যদি কেন্দ্রীভূত ইচ্ছার সঙ্গে বলে "শুধু তোমাকেই চাই," তাতেও কাজ হবে। এমন কি একবার মাত্র বললেও হবে, যদিও তার ফল হতে অল্পবিস্তর বিলম্ব হতে পারে, হয়তো বছর পার হয়েও যেতে পারে, কিন্তু তবু একদিন লক্ষ্যে গিয়ে তুমি পৌঁছবেই।

প্রশ্ন কিন্তু আমাদের মধ্যে যে বিস্তর অপূর্ণতা রয়ে গেছে?

উত্তর অঁ্যা! যত বেশি অপূর্ণ তা তত বেশি বিলম্ব হবে, যত বেশি কামনা ও আসক্তি লেগে থাকে তত বেশি দেরি হবে। দেরি তো হবেই।

কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছে যাবেই, এটা অবশ্যম্ভাবী।

২৩ জুন, ১৯৫৪

Elements of Yoga, Chap. XIII-এর Sex-Food-Sleep (যৌনতা-খাদ্য-নিদ্রা) অধ্যায়টি না পড়লেন।

প্রশ্ন: খুব কম ক'রে খেলে কি ইন্দ্রিয় চেতনার দমন হতে পারে?

উত্তর: না, ওতে বরং আরো বিপর্যয় এসে পড়ে। সাম্য রেখে খাওয়াই সব চেয়ে

ভালো, কমও না বেশিও না। যারা সপ্তাহে নিত্য উপবাস করে তাদের ভাবনারা নষ্ট হয়, উত্তেজনার মাত্রাই শুধু বেড়ে যায়।

প্রশ্ন : আর কেবল নিরামিষ খাদ্য খেলেই কি ইন্দ্রিয় দমন হয়?

উত্তর : ওতে মাংসাশীদের বিষগুলি বাদ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তাতেই যে খুব লাভ হয় এমন নয়। আর কোনো প্রশ্ন আছে?

প্রশ্ন মাংস খাওয়াতে কি দোষ হয়?

উত্তর এ সম্বন্ধে একটা গল্প শুনবে? আমি একজন সুইডিশ তরুণীর কথা জানি, সে সাধনার পথ নিয়েছিল। স্বভাবতই সে ছিল নিরামিষভোজী, চিরদিন তাতেই অভ্যস্ত। একদিন সেই মেয়েটি বন্ধুদের নিমন্ত্রণে গেলে বন্ধুরা তাকে মুরগির মাংস খেতে দিল। কি আর করে, কোনো গণ্ডগোল না ক'রে সে যা পেলে তাই খেয়ে নিলে। কিন্তু তার পরে হল কি, বাড়িতে ফিরে রাত্রে শুয়ে দেখতে লাগল, তাকে যেন এক ঝুড়িতে পুরে ঝুড়ির দুই প্রান্তে ঝাঁকানি দিতে দিতে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানেই শেষ নয়, পরে তার পা থেকে কে একজন খানিকে ছিঁড়ে নিতে থাকল, খুব ব্যথা পেতে লাগল তাতে। শেষে তার মাথা নিচে আর পা উপরে ধরে সে একটা ছুরি নিয়ে তার গলা কাটতে লাগল, তখন ঘুম ভেঙে সে জেগে উঠল। আমার কাছে এসে সে এই সব কথা বর্ণনা করে বললে। ঘুমের আগে এ সম্বন্ধে সে কিছুই ভাবেনি। কিন্তু পরে বুঝলে যে হতভাগ্য সেই মুরগিটার চেতনাই তার মধ্যে এসে তার যা যা ঘটেছে তার পুনরভিনয় করলে—কেমন করে তাকে ঝুড়িতে ভরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কারাগারে নিয়ে গিয়ে বেচা হলো, তারপর তার পায়ের পালক টেনে ছেঁড়া হলো, শেষে তার গলা কেটে জবাই করা হলো। (হাস্য)

এই রকম জিনিস হয়! অর্থাৎ যে জন্তুর মাংস তুমি খাও তার চেতনার কিছুটাও তুমি সেই সঙ্গে গলাধঃকরণ করো। তা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়, কিন্তু সব সময়ে জিনিসটা সুবিধাজনক হয়না। অন্তত মানবত্বের মধ্যে থেকেও তুমি যেন কতকটা পশুত্বের দিকেই রয়ে গেলে। আদিম কালের মানুষ যখন আত্মিক চেতনা না পেয়ে পশুভাবাপন্ন ছিল, তখন তারা কেবল কাঁচা মাংসই খেতো, যা রাঁধা মাংসের চেয়ে বেশি বলকারক। জীবন্ত মেষে তার কাঁচা মাংসই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতো, তাতেই তারা শক্তি পেতো। আর সেই সমস্ত খাদ্য হজম করার জন্যে অন্ত্রের ভিতরকার অ্যাপেন্ডিক্স নামক অংশটাও অনেক বড়ো ছিল। পরবর্তী যুগে মানুষ যখন দেখলে যে অগ্নিপক্ক ক'রে খেলে খাদ্য সুস্বাদু হয়, তখন তারা তাতেই অভ্যস্ত হলো। তার ফলে মানুষের অ্যাপেনডিক্স অনেক ছোটো হয়ে গেছে, কারণ আর তার কোনো কাজই নেই। বরং সেটা এখন অনাবশ্যক বোঝা মাত্র, মাঝে মাঝে তাতে রোগ জন্মায়।

এসব কথা তোমাদের বলছি এইজন্যে যে এখন আমাদের পশুত্ব বোধহয় আরো কমে যাবার সময় হয়েছে, তদনুযায়ী খাদ্যরীতিরও পরিবর্তন দরকার। তবে তা নির্ভর করে প্রত্যেকের ভিতরকার চেতনার অবস্থার উপরে। যারা সাধারণ চেতনার মানুষ, সাধারণ কাজে নিযুক্ত থেকে সাধারণ জীবন যাপন করে, শুধু জীবিকা অর্জন ছাড়া অন্য কোনো চিন্তার

যার ধারেনা আর নিজে কিসে সুখে থাকবে ও পরিবার প্রতিপালন করবে তাই যাদের চিন্তা, তারা অবশ্য মাংসাদি সব কিছুই খাবে, যা তাদের কাছে বোধ হবে উপাদেয় ও স্বাস্থ্যদায়ক।

কিন্তু যে এমনি সাধারণ জীবন ছেড়ে উচ্চতর জীবনে যেতে চায়, তার পক্ষে প্রশ্নটা হবে অন্যরকম। আর উচ্চতর জীবন বলতে ক'রে যখন সে রূপান্তর লাভের জন্যে প্রস্তুত হবে, তখন ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। তখন অবশ্যই তাকে বিবেচনা করে দেখতে হবে যে কোন খাদ্য তার পক্ষে সাত্ত্বিক ও সূক্ষ্মরুচিযুক্ত, আর কোনটি বা পশুত্ববর্ধক। কিন্তু এ বিচার কেবল তখনকার সময়ের পক্ষেই জরুরী, তার পূর্বে নয়। তার পূর্বে এ ছাড়া অনেক কিছু করবার বাকি রয়েছে। এই দেহশুদ্ধির দিক ছাড়া বাকি রয়েছে মনের ও প্রাণসত্তার বিশুদ্ধি, সেই দিকেই তার আগ্রহ থাকা চাই। কারণ দেহকে বিশুদ্ধ রাখতে যতই কেন বেছে বেছে সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক ধরনের খাদ্য খাও, মন ও প্রাণ যদি থাকে অশুদ্ধ ও অজ্ঞান, তামসিক, কামনা বাসনার বশীভূত, তাহলে শুধু সেরূপ সাত্ত্বিক খাদ্য খেয়ে কিছুই লাভ হবেনা। বরং দেহ দুর্বল হয়ে আভ্যন্তরিক জীবনের সামঞ্জস্য হারাবে ও শেষে তুমি অসুস্থ হয়ে পড়বে।

এ কাজ আরম্ভ করা চাই ভিতরের দিক ও উপরের দিক থেকে। তাই আমি আগেও অনেকবার বলেছি যে আগে শোধরাও উপরের ও ভিতরের দিক, পরে বাহ্য ও নিচের দিক। কিন্তু তাই বলে এমন বলছি না যে দেহকে ততদিন তার নিচু কাজগুলোই ক'রে যেতে প্রশ্রয় দাও। বলছিনা যে কামনা বাসনাকে দমন তখন করতে হবে না। মোটেই তা নয়। বলছি যে ভিতরের দিকে মনে প্রাণে অল্প কিছু সাধুত্ব ও পবিত্রতা আসার আগে কেবল দেহের দিকে এক্কেল বা সাধু বনতে যেওনা। কারণ তাতে অপর দিকে দিয়ে হানি হবে, ভালো ফল কিছু মিলবে না। তাই সেদিন বলা হয়েছিল যে সব চেয়ে ভালো কাজ হলো সর্বদিকেই সমান সামঞ্জস্য রেখে চলা। এমন না হয় যে এক অংশে অন্ধকারে রেখে অন্য অংশে আলো আনলে। অর্থাৎ সব দিকেই সমানভাবে অগ্রসর হতে হবে, কোনো কোণে যেন কিছু অন্ধকার না থাকে। এই হলো কথা।

প্রশ্ন মা, আশ্রমে কেন আগে ডিম খেতে দেননি, এখন তো দিচ্ছেন?
উত্তর ডিম খাওয়া কি তখন নিষিদ্ধ ছিল?

প্রশ্ন তা জানি না, তবে তাই শুনেছি।

উত্তর ও! তা লোকে তো কতরকম কথাই বলে, সেজন্যে আমি দায়ী নই (হাস্য) আবার মনে তো পড়েনা যে এমন কাউকে ডিম দেওয়া হয়নি যার স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ডিম খাওয়া দরকার। তবে কেউ যদি লোভবশত বা কেবল বিলাসের কারণে কোনো কিছু জিনিস চায়, আমি সে জিনিস দিতে অস্বীকার করি, আগেও তাই আর এখনও তাই। কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বা দেহসঙ্গতি রক্ষার প্রয়োজনে যার যেটা পাওয়া দরকার তাকে তা অবশ্যই দেওয়া হয়। এমন কি যার পক্ষে মাংস খাওয়া দরকার তাও আমি নিষেধ করিনা। এখানে কেউ কেউ মাংসও খেতে পেয়েছে, প্রয়োজন থাকাতে। কিন্তু কেউ যদি কেবল মনের বিলাস বা খুশির জন্যে আমার কাছে কিছু চাইতে আসে, আমি তাকে বলি "না"। এমন কি আইসক্রিমও না। (হাস্য)

প্রশ্ন ডিম খেলেও কি তার ভিতরকার জীবটিকে খাওয়া হয়না ?

উত্তর তখনও সে জীব তৈরী হয়নি, অন্তত চেতনা আসেনি। তাই এমন সদ্য পাড়া ডিমই খাওয়া উচিত যার মধ্যে বাচ্চা গড়ে ওঠেনি।

প্রশ্ন : মধুমতী মা, যদি মুরগি খেলে তার ব্যথার চেতনা আমাদেরও অন্তরে আঘাত করে, তাহলে বীট গাজর প্রভৃতি উদ্ভিদের বেলাও তাই হবেনা ?

উত্তর : সে পক্ষে আমি এই মনে করি যে বীট প্রভৃতির চেতনা মুরগির থেকে অনেক কম (হাস্য)। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিজে যা এ সম্বন্ধে দেখেছি তাই তোমাদের বলছি, যদিও সাধারণত তেমন হয়না।

চৌকিওতে যখন ছিলাম তখন সেখানে আমার একটি বাগান ছিল, সেখানে আমি নিজের হাতে শাকসবজি আনাজ প্রভৃতি জন্মাতাম। বাগানটি বেশ বড়ো ছিল, সুতরাং অনেক রকম জিনিস উৎপন্ন করা যেতো। রোজ সকালে সেখানে গাছে গাছে ঘুরটুল দিয়ে গাছ-গুলির পরিচর্যা ক'রে সেখানে ঘুরে বেড়িয়ে দেখতাম কোন কোন জিনিস খাবার মতো তৈরি হয়েছে, সেগুলি বেছে বেছে তুলে আনতাম। কিন্তু ভেবে দেখ, কি আশ্চর্যের কথা। ওদের মধ্যে কেউ কেউ কাছে গেলেই অমনি বলে উঠতো "না, না, না, না, না"। আবার অন্যেরা আমাকে ডেকে বলতো, "নাও, নাও, আমাকে নাও, আমাকে নাও"। সুতরাং আমার কাজ সহজ হলো, যারা নেওয়া চাইতো তাদেরই নিতাম, যারা চায়না তাদের ছুঁতাম না। এটা আমার কাছে অসাধারণ ব্যাপার বলেই বোধ হতো।

কিন্তু আবার দক্ষিণ ফ্রান্সে যখন গেলাম সেখানেও এই জিনিস হলো। সেখানে কলাইশুঁটি, গাজর, মূলো, এই সব আনুজেছি। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ নিজের খুশিতে বলেছে, "আমাকে নাও, আমাকে নাও," আবার কেউ কেউ বলেছে, "না, না, আমাকে ছুঁয়োনা (হাস্য)।

প্রশ্ন মধুমতী মা, তারা অমন ক'রে বলতো কেন ?

উত্তর তাও পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। তার কারণ তারা তখনও ঠিক খাবার মতো তৈরি নয়, খেতে গেলে নীরস বিস্বাদ, তিক্ত। হয়তো ঠিক পাকেনি, কাঁচা আছে। কিন্তু দেখি যে দুদিন পরে তারাই বলে, "আমাকে নাও, নাও।" (হাস্য)

প্রশ্ন মা, পূর্বকালে সাধুরা ভগবান পেতে অনেক দেহ-নির্যাতন করতো।

উত্তর : তাদের আমি সাধু বলব না। (হাস্য) ওতে শুধু গর্বভাবই আনে। সেটা আধ্যাত্মিক গর্ব মাত্র, আর কিছু না। অন্তত ভগবানের সম্যক উপলব্ধি নিশ্চয়ই নয়।

প্রশ্ন : কিন্তু শোনা যায় তারা সাধনাতে চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছে।

উত্তর : শোনা যায়। এমন অনেক কিছুই শোনা যায়।

প্রশ্ন মা, মানুষের চেয়ে কুকুরের শ্রদ্ধা প্রেম কি বেশি খাঁটি নয় ?

উত্তর : নিশ্চয়, তার কারণ তাদের প্রকৃতিই সহজ বিশ্বাসী, মনের মধ্যে কোনোরকম

জটিলতা তাদের নেই। মানুষের মনে নানারূপ জটিলতা থাকে বলেই তেমন হতে পারেনা। অধিকাংশ লোকই অবিশ্বাসী হয়, কারণ মনের মধ্যে এই ভয় থাকে যে বিশ্বাস ক'রে পাছে প্রতারিত হতে হয়। ঠকে যাওয়া কাকে বলে তা জানো তো? এই ভয় সর্বদা থাকে যে তারা ঠকে যাবে, বিশ্বাস করলেই ফাঁকি দিয়ে কেউ কিছু বাগিয়ে নেবে। এই মনে শুধু ভয়...আর তা ছাড়া অল্পবিস্তর গোপনে এক অন্তচেতনা থেকে এসেছে এক পাটোয়ারী লেনদেনের মনোভাব যার ক্রিয়ার ফলে মানুষ সর্বদাই প্রত্যাশা করে যে কাউকে কিছু দিলে সে তার হক্ পাওনা স্বরূপ প্রতিদানে কিছু পাবে। তুমি শ্রদ্ধা রাখো, কিন্তু সেই সঙ্গে মুখে না বললেও, চাও যে অন্যেও তোমার প্রতি শ্রদ্ধা রাখুক, লোকে তোমাকে সেবাযত্ন করুক, মিষ্টি ব্যবহার করুক, তোমার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে কেবল যেন স্বার্থ সিদ্ধি না করতে চায়। এই সব নানা জটিলতা কুকুরের মধ্যে নেই, কারণ মন তাদের একটুখানি অংকুর মাত্র। মানুষের মতো প্রস্ফুরিত বুদ্ধি তাদের নেই, যে বুদ্ধিতে মানুষ প্রায়ই নানা নূচতা প্রকাশ করে।

কিন্তু তাই বলে তোমরা তো আবার সেই কুকুরের মতো আদিম অবস্থাতে ফিরে যেতে পারো না। সুতরাং এর পরে মানুষের চেয়ে আরো উচ্চস্তরে উঠে তোমাকে উচ্চস্তরের কুকুর হতে হবে, অর্থাৎ তোমার এই বর্তমান আধাচেতন আধাবিশ্বস্ততা,—যা অনেকটা প্রবৃত্তিজাত ও স্বার্থপর আত্মপ্রয়োজননুখী ক'রে তোমাকে নিচের দিকে নামায়—তার স্থানে আসা চাই পুরোপুরি সহজ ও মুক্ত স্বেচ্ছাজাত বিশ্বস্ততা, বিশেষত যা সব রকম অহংজ্ঞান-বর্জিত। এমন একটি অবস্থা আছে যখন সর্ব গুণের একত্রে সমন্বয় হওয়াতে তুমি অহং-জ্ঞানকে ছাড়িয়ে ওঠো। এই নির্মল বিশ্বস্ততা, শ্রদ্ধাভক্তি, প্রেম ও সেবাগুণকে একত্রিত ক'রে যখন তুমি অহংকে ছাড়িয়ে উঠে যাও, তখন এই হয় যে তুমি কেবল দিতেই চাও, তার বদলে কিছু পেতে চাও না। আর তুমি যদি ওর চেয়েও আরো এক ধাপ উপরে উঠতে পারো, কর্তব্য হিসাবেও বাধ্য হয়ে কিছু করার বদলে শুধু মাত্র আনন্দের প্রেরণাতেই তা করো, আর সেই আনন্দই হয় তোমার একমাত্র পুরস্কার, অন্য কিছুই আর চাওনা। কিন্তু এমন অবস্থা আনতে তোমাকে উঠতে হবে অনেক উচ্চে, যেখান থেকে নিজের দিকে চাওয়া নেই—যাতে মানে কেবল নিচের দিকে। আর যাতে কেবল আসে আত্মাভিমান ও আত্মনমতা, আর তুমি মনে মনে বলো—"আহা রে বেচারা আমি।" সে কি মারাত্মক জিনিস, যা নিত্য হতে থাকে অন্তরের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতে। অতিরিক্ত আত্মাদরের বশে তুমি দুঃখের সঙ্গে বলো, "কেউ আমার দাম বুঝলে না, কেউ আমাকে ভালোবাসে না, নোটে গ্রাহ্যই করে না", ইত্যাদি। এমনি অহংভাব থাকলেই তা ফুলে উঠে ভয়ানক ভাবে তোমাকে নিচেকার গর্তের মধ্যে টেনে ফেলে।

এই সব অবস্থা পিছনে ফেলে তোমাকে উঠে যেতে হবে অনেক উচ্চে, তাহলে পুরো বিশ্বস্ত চেতনা নিয়ে আত্মদানের সেই বিমল আনন্দ উপলব্ধি করবে যার মধ্যে তাই ছাড়া আর অন্য কিছু নেই, তার প্রতিদানে কোনো সাড়া আসে কিনা সেদিকে দৃক্‌পাত মাত্র নেই। তুমি যা কিছু করছো তার ফলাফলের কথা ভাবতে যাবে না, কঠোর তপস্যা করছি বা নিজেকে আহুতি দিচ্ছি এমন চেতনাও আনবে না, কেবল থাকবে সেই আনন্দ চেতনা, যা সকল প্রাপ্তির চেয়ে অনেক বড়ো। তবে সে হলো আবার অন্য কথা,—"ঐ দুই অবস্থার মাঝখানে কয়েকটি ধাপ রয়েছে।

প্রশ্ন: মা, আপনি বলেছেন মধ্যরাত্রের আগেকার যে ঘুমটা হয় তাতেই সব চেয়ে বেশি বিশ্রাম নেলে?

উত্তর: হাঁ, দেহের বিশ্রাম।

প্রশ্ন তা হয় কেন?

উত্তর: ওটা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। এ ছাড়া ওর অন্য কিছু কেন নেই, তা আছে কি? প্রত্যেকেই জানবে আপন অভিজ্ঞতা থেকে যে তার বেলা তাই হয় কিনা। তবে যারা পার্থিব রসায়নশাস্ত্র নিয়ে কাজ করে তাদের কাছে শুনেছি কতকগুলি সূর্যরশ্মি নাকি—(পবিত্রের দিকে ফিরে)—তাই নয়? তুমি জানো তো বলোনা?—সেই সব রশ্মি নাকি মধ্যরাত্রি পর্যন্ত থেকে কাজ করে ও শক্তিসঞ্চার করে, আর মধ্যরাত্রির পরে অন্য যে সব রশ্মি থাকে, তাতে শক্তি টেনে নেয়। এই রকম সব কথা শোনা যায় কিংবা বইতে পাওয়া যায়। যা শুনেছি তাই বললাম, নিজে কিছু জানি না। যাদের ভালো-রকম জানা আছে তাদের কাছে এই কেন-র বিশদ জবাব মিলবে (হাস্য)। তবে তাদের কতক কথা সত্য বলেই দেখা যায় কেন জানি না, হয়তো ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেই তা সত্য হয়। কিন্তু আমি অন্যের মুখেও এমন ধরনের কথা শুনেছি। যেমন শুনেছি, তুমি একবার সমুদ্রে ডুবে যদি তখনই ফিরে এসো তাহলে তাতে শরীরের তেজ বাড়ে, কিন্তু যদি ঘন্টাখানেক ধরে সমুদ্রে থাকো তাহলে ক্লান্ত ও শক্তিহীন হয়ে তুমি ফিরবে। আরো আমি নিজে এই জানি যে গরম জলে স্নান বা হটবাথ নিলেও এইরকম ফল হয়, অর্থাৎ অল্পক্ষণের গরমজল স্নানে শরীর চাঙ্গা হয়, কিন্তু পনেরো মিনিট ধরে তাই করলে তাতে শক্তিলোপ ক'রে দেহকে দুর্বল ক'রে দেয়। এ সব জিনিসের কি কারণ তা জানি না, যা হয় দেখেছি তাই বললাম। কিন্তু তা কেবল আমার নিজেরই পক্ষে, অন্যের পক্ষে হয়তো অর্থহীন।

আর ঘুমের সময়কার যে সব অবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্বন্ধে বলতে পারি যে তুমি যদি রাত্রিকালে চেতন থাকতে পারো, তাহলে কয়েক মিনিটেই সে অবস্থাগুলি পার হয়ে যেতে পারো, তার জন্যে কয়েক ঘন্টার ঘুম অতিক্রম করবার দরকার হয়না, চেতন হতে পারলে কয়েকটি মিনিটেই সেগুলি অতিক্রম করা যায়। এর জন্যে দরকার প্রথমত, গভীর ঘুমে ঘুমোবার আগে নিজেকে সম্পূর্ণ শিথিল ক'রে এলিয়ে দেবে, সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত ও শিথিল ক'রে আনবে, নিজেকে পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দেবে এমনিভাবে (ইঙ্গিত), যেমন আগেও বলেছিলাম—আর সেইসঙ্গে একটু বিশেষ চেষ্টার দ্বারা সমস্ত মানসিক ক্রিয়া থামিয়ে দিয়ে মনকে যথাসাধ্য নীরব ক'রে রাখতে হবে; মন যতক্ষণ পর্যন্ত একেবারে স্থির ও শান্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোবে না। এতে মনের অনাবশ্যক উত্তেজনাকে ও কষ্টপ্রয়াসকে এড়িয়ে যেতে পারবে। ঘুমের আগে মনকে যদি নিখুঁত ও শান্তিপূর্ণ ক'রে নিতে পারো, তাহলে সেই ঘুমও তখনই হবে শান্তিময় ও তৃপ্তিকারক। অবশ্য সে সময়ে প্রাণসত্তারও তরফে কোনো তৎপরতা বা চাঞ্চল্য না থাকে, কারণ তাতে তোমাকে নানা মূঢ়তার মধ্যে কোথায় নিয়ে যেতে পারে, আর তুমি সেই ঘুম থেকে জাগো ক্লান্তক্লিষ্ট হয়ে।

আর তুমি যদি সেইরূপ চেতনার অবস্থাতে দেহচেতনার এলাকা ছেড়ে সূক্ষ্মচেতনার রাজ্যে চলে যাও এবং প্রাণসত্তাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে তাকে বলো, "এখন চুপ ক'রে স্থির হয়ে

থাকো," আর সে ঘুমোনে তখন মনকে ডেকে বলো, "তুমি চুপ থাকো, এখন কোনো কথাটি নয়," এই বলে তাকেও ঘুম পাড়িয়ে দাও,—তখন তুমি মনের রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে আরো উচ্চতর লোকে, আর সেখানে গিয়ে প্রথমেই দেখতে পাবে অনেক আশ্চর্য জিনিস (যা সময়ে সময়ে অত্যাশ্চর্য) আর অনেক কিছু শিক্ষাও হবে, যাতে তোমার সাধারণ জ্ঞান বেড়ে গিয়ে অনেক মানুষ ও অনেক জিনিসের সম্বন্ধে তুমি অনেক কিছুই জানবে। এ খুব চমৎকার ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা পাকা হয়ে গেলে যখনই তুমি বলবে, "স্থির হও, নড়াচড়া না ক'রে ঘুমিয়ে পড়ো", এই বলে তখনই উচ্চ থেকে আরো উচ্চতর চেতনার রাজ্যে চলে যেতে পারবে, আর তারও পরে শেষ পর্যন্ত মূল আকৃতির বা রূপের কিনারায় গিয়ে হাজির হবে। সে এমন কোনো মূল আকৃতি নয়—চিন্তা বা স্পন্দনাদিরও সকলরূপ আকৃতি ছাড়িয়ে অনির্বচনীয় রূপে সেই জিনিস যাকে আমরা বলি "সচ্চিদানন্দ"।

সেখানে গেলে সব কিছুই থেমে যায়, সকল স্পন্দন স্তব্ধ হয়, আর সেখানে মাত্র তিন মিনিট থেকে দেহের মধ্যে যখন ফিরে আসবে তখন দেখবে যে এমন তাজা ও চাঙ্গা হয়ে তুমি জেগে উঠেছ যেন অনেক ঘন্টাই ঘুমিয়ে উঠলে। এ জিনিস অবশ্য শেখা যেতে পারে, কিন্তু অল্পদিনে হয় না, এর জন্যে খাটতে হয়, এই নিয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে হয়, কিন্তু তবু...এ জিনিস শিখতে পারা খুবই ভালো। কারণ যখন তুমি কোনো কিছুতে উদ্বিগ্ন ও কাতর হয়ে পড়ো,....যেমন বিরোধী শক্তিদের আক্রমণে যখন তুমি পর্যুদস্ত, তখন এ উপায়ে কয়েক মিনিটেই তাকে কাটিয়ে উঠবে। এ শিক্ষার মূল্য সামান্য নয়, তবে এর জন্যে অনেক অনেক বেশি চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকা চাই, যেহেতু আমি...আচ্ছা রও রও, এ সম্বন্ধে আমি আরো কিছু বিশেষ কথা বলি শোনো।

আমি প্রথম যখন গুহ্যবিদ্যা শিখতে শুরু করি, তখন রাত্রে শুয়ে চেতন থাকার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি যে মূল প্রাণসত্তার ও সূক্ষ্মদেহের চেতনার মাঝখানে রয়েছে ছোটো একটু দুর্লঙ্ঘ্য অংশ, একটুখানি হলেও ঐ দুই জিনিসের মাঝে ব্যবধান স্বরূপ হওয়াতে দুই জিনিসের ক্রিয়াকে মিলিয়ে দিতে পারছে না। সেইজন্যে মূল প্রাণের মূল চেতনা সূক্ষ্ম দেহের সূক্ষ্ম চেতনাতে চলে যেতে পারছে না। সূক্ষ্মের দিকে যেতে যেতে তা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে—শূন্য হয়ে যাচ্ছে না কিন্তু হয়ে যাচ্ছে যেন বোজা অন্ধ অর্ধচেতনার মতো। তখন আমি বুঝলাম যে ঐ বাকি অংশটিকেই আগে সম্যকভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

সেই ভাবেই আমি চেষ্টা শুরু করলাম। এটা শুরু হলো বোধ করি ফেব্রুয়ারি মাসে। তারপরে এক মাস, দু'মাস, তিন চার মাস কেটে গেল, কিন্তু কোনো ফল নেই। তবুও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। পাঁচ ছয় মাসও কাটল...তখন জুলাইএর শেষে কিংবা আগস্টের গোড়াতে ...আমি প্যারিসের আবাস থেকে চলে গেলাম সমুদ্রতীরে এক নগণ্য গ্রামে কয়েকজন বন্ধুর অনুরোধে, সেখানে তাদের সঙ্গে কিছুদিন বাস করতে। চমৎকার সুন্দর নিরিবিলি, কোনো কোলাহল নেই। সেখানে আছে তাদের বাগান, সেই বাগানের মধ্যে একটি লন্। কাকে বলে লন্ তা জানো তো? অর্থাৎ ঘাসবিছানো জমি। তার চারি পাশে ফুলের বাগান, আর তাকে ঘিরে অনেক বড়ো বড়ো গাছ। জায়গাটি বেশ নির্জন দেখে আমি সেই লনের ঘাসের উপর উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম, ঘাসের মধ্যে কনুই দুটি রেখে। থেকে থেকে হঠাৎ চেয়ে দেখি একেবারে আচম্বকা ভাবে চারিদিকের সমগ্র প্রকৃতি যেন এক মুহূর্তে

জীবন্ত হয়ে আশ্চর্যরকমের তীব্র চেতনাতে প্রতিভাত হয়ে উঠল। গাছপালার মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে চেতনার ঠিক সেই অংশটাই বেশি প্রকাশ পায় যেটি আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যবর্তী। কিন্তু হঠাৎ কোনো কিছু না জানিয়ে আর অল্পে অল্পে নয়, একেবারে পুরোপুরিভাবে ঘটে গেল এই প্রস্ফুরিত জীবন্ত বিকাশ। এমনি করে হঠাৎ এখানেই এইভাবে মিলে গেল আমার সেই ছয় মাসের চেষ্টার ফল, তাই নয় কি? ছয় মাসের মধ্যেও কিছু হয়নি, কোনোরূপ ইঙ্গিতও মেলেনি, কিন্তু এই সামান্য মাত্র ঘটনাসূত্র ধরে তারই পুরো ফল পেয়ে গেলাম। এ যেন ঠিক বুরগির ডিম ফোটার মতো। হাঁ ঠিক তাই, দিনের পর দিন কেটে যায়, ডিম ফোটার কোনো লক্ষণই নেই, সন্দেহ হতে থাকে যে ওর মধ্যে বাচ্চা সত্যি রয়েছে কিনা। তারপর অকস্মাৎ একদিন 'টুক্' ক'রে একটু ফুটো হয়ে ডিমটি চৌচির হয়ে যায় আর ভিতর থেকে পুরো তৈরি বাচ্চা বেরিয়ে আসে। পুরোপুরি তৈরি, তার কেবল অতদিন সময় লাগে ভিতরে ভিতরে তৈরি হতে। এ সব জিনিস এমনি ভাবেই হয়। নিজের মধ্যে তুমি যখন বিশেষ কিছু গড়ে নিতে চাইবে তখন ঐ ডিমের মধ্যে বুরগির বাচ্চার মতো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে, তখন কিছুমাত্র ফল দেখা যাবে না, কিন্তু তাতে কখনো নিরুদ্যম হওয়া চলবে না, বরাবর তোমার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সমান ভাবে। যেন চেষ্টা তোমার চিরদিনের জন্যে, আর শুধু তাই নয়, নিষ্কাম নিরপেক্ষ ভাবে, ফলের চিন্তা মাত্র না ক'রে। তুমি কেবল তোমার চেষ্টার কাজটি ক'রে যাবে। পরে হঠাৎ একদিন যখন ঐ ডিম ফাটার মতো সময় আসবে তখন তোমার কাজের ফল পুরোপুরি নিজেই দেখতে পাবে।

কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলে তো? রাত্রে শুয়ে চেতন থাকার কথা মুখে বলা খুব সোজা, কিন্তু ঘুমের সময়কার ঘটনাগুলিকে আয়ত্ত করতে পারা এবং আরো যা যা ঘটছে তাকে ধরে রাখতে পারা, তার জন্যে ঐরূপ নিরন্তরের চেষ্টা বাস্তবভাবে কাজের বেলাও করা চাই, যেমন আগে বলেছি। অনেক কিছুই করতে হয় তবে ফল মেলে। একটা চেষ্টা সফল হলে তখন দেখতে হবে যে আরো কিছু বাকি রইল কিনা, তখন সেদিকেও কাজ করবে। পরে হয়তো দেখবে তখনও কিছু ঘাটতি আছে, সেটাও পূরণ করবে। এই ভাবে চলতে চলতে দেখবে একদিন যে আমি যা যা বললাম সবই তুমি করতে পারছো, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সহজে যেতে পারছো, শেষে চূড়ান্ত বিশ্রামের স্থানে চেতনভাবেই যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। চেষ্টার দাম আছে বৈ কি।

এ সম্বন্ধে সব কিছু শুনলে তো?
আর কোনো প্রশ্ন আছে? না?
তবে এখন এখানেই ইতি।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

"ছোট্ট হাসি"কে লেখা শ্রীমা'র পত্র

(তিন)

২২শে আগস্ট, ১৯৩৩

শ্রীমা—তুমি হলে সুদক্ষ কর্মী এবং অধ্যবসায়ী। তোমার যদি শুধু কাজের কথা আমাকে জানান ছাড়া আর কোনো কথা জানাবার না থাকে তবে আমারও ছোট্ট হাসিটিকে দেবার রয়েছে শুধু অন্তরের স্নেহাশীষটুকু।

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

স্নেহময়ী মা,

আমি কখনো অনুভব করি না যে কাজ করছি। তুমি আমাকে যে-সব অতুলনীয় খেলনাগুলি দিয়েছো সেগুলি নিয়ে ছোট একটি শিশুর মত আমি সারাদিন ধরে খেলা করি। আমি জানি না কি প্রকারে তোমাকে লিখতে হবে, তাই "আমি খেলা করছি" এ-কথার পরিবর্তে "আমি কাজ করছি" এই কথা লিখে ফেলি।

মা, আজ যে শাড়ী তুমি পরেছিলে, মনে হয় এইটিই আমার হাতে সব চেয়ে সুন্দর সূচী-শিল্পের কাজ। তুমিও কি তাই ভাবো?

ইতি—তোমার মেয়ে

শ্রীমা—কাজের দিক থেকে এটা একটা সুন্দর আর্ট। প্রকৃতই এটি চমৎকার হয়েছে। শাড়ীটি পরে মনে হলো যেন আমি আলোক সজ্জায় সজ্জিত।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩

শাশ্বত জননী, আজ আমি সারা দিন বিশ্রাম নিয়েছি। এখন আমার ঘাড়ের ব্যথা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় হয়েছে।

আগামী কাল থেকে ধূসরবর্ণের শাড়ীর কাজ আরম্ভ করবো।

মা, তোমার চন্দ্রমল্লিকার ফুল-আঁকা ব্লাউজের হাতাগুলো খুব আঁট হয়ে গেছে, নয় কি? তুমি ব্লাউজটি আবার পাঠিয়ে দিও, আমি সামান্য একটু বড় করে দেবো।

—ইতি

শ্রীমা—আমি ভাবছি ব্লাউজটাকে এই রকমই রেখে দেবো। আবার হাতদুটো বর্তমানে একটু যেন মোটা হয়েছে তাই এখন একটু অসুবিধে বোধ হচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এই মনে করো না যে, বরাবরই আমি এমনি থাকবো?

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

আজ সারা দিন ধরে শাড়ীর কাজ করেছি।

তোমার জন্যে শাড়ী ছাড়াও আরো একটা কিছু নিয়ে যাবো—অনুমান করো তো সেটা কি হতে পারে?

না, আমি নিজেই বলে দিই—তোমার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি একটা ধূসর রংয়ের ব্লাউজ, তার ওপর তিনটি পাখী এমব্রয়ডারী করা।

—ইতি

তোমার 'হাসি'

শ্রীমা—এমন ধরনের অনুমান করা সত্যিই কি খুব কঠিন বলে করো।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩

ভগবতী জননী,

রুমালের উপর সোনালী ও রুপালী রঙের সুতো দিয়ে আমি একটি ছোট্ট 'ডিজাইন' আরম্ভ করেছি। সেটি আগামী কাল তোমাকে দেখাবার জন্যে পাঠাবো।

—ইতি

শ্রীমা—সত্যিই তোমার হাতের কাজ অতি চমৎকার।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

আজ আমি সারা দিন কাজ করেছি। বাগো, কি যে লিখবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

—ইতি

শ্রীমা—আজ সকালে উঠে আমি আবার তোমার হাতের তেমনি সুন্দর একটি রুমালের চিন্তা করছি। তোমার সূচী-শিল্প সত্যিই একটি আর্ট!

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩

মা, আমি 'গ্রে' শাড়ীতে কাজ শুরু করেছি। অধিক কি? তোমাকে আর আমি কি লিখতে পারি?

—ইতি

তোমার ছোট্ট হাসি।

শ্রীমা—আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে এই একটি কথাই যথেষ্ট। যখন তোমার আরো কিছু বলবার থাকবে তখন বলবে।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

তোমার কতো কাজ! তোমার সময়ের এতটুকুও অপচয় করতে ইচ্ছা করে না।

—ইতি

শ্রীমা—যা ভাল বুঝবে তাই করবে আমার 'ছোট্ট হাসি।' আমি খুবই ব্যস্ত এ কথা সত্য; তবে তোমাকে কয়েকটি মিনিট সময় দেবার ব্যবস্থা আমি করতে পারি। অকারণে আমার কাজ না বাড়াবার জন্য এই যে চিন্তা এটা সত্যিই খুব ভাল। তোমার মতো এমন করে বড়ো কেউ ভাবে না।

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৩

শ্রীমা—গতকল্য উর্ধ্ব থেকে তোমার জন্যে নেমে এসেছে একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা তোমায় সকল বাধা-বিঘ্ন থেকে মুক্ত করবে—তোমার মন হবে সুস্পষ্টরূপে শান্ত, হৃদয় হবে পরিতৃপ্ত।

তুমি কি কিছু অনুভব করেছো?

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৩

শ্রীমা—নিজেকে বিবৃত করোনা আমার 'ছোট্ট হাসি'।

শ্রীঅরবিন্দের আশীর্ব্বাদ লাভ করার পর তোমার নিকট এখন যা আসছে তাকেই তুমি একটি উপলব্ধি ব'লে ভাববে, সেটি আসছে তোমাকে একটি বিশেষ শিক্ষা দেবার জন্যে। এই সময় সবচেয়ে ভাল উপায় হলো—অন্য লোকের কাছে কিছুই ব্যক্ত না করে, ঐ আনন্দকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে অন্তরে অন্তরে তাকে অনুভব করো। ঐ সকল অনুভবের কথা যখনই অন্যের কাছে প্রকাশ করবে তখনই তা বাষ্পের মত উবে যাবে, তারা যে সুফল তোমাকে দিতে পারবে তা থেকে তুমি হবে বঞ্চিত।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩

মা,

তুমি আমাকে দিয়ে একের পর এক অপূর্ব্ব ধরনের প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্ছ—আর আমি তাই পালন করে চলেছি।

এমন হলে কি করে আমি সব সময় খুশীতে থাকবো?

—ইতি

তোমার মেয়ে

শ্রীমা—তুমি ঐ সব বিষয় নিয়ে মোটেই ভাববে না, ভাববে না তুমি প্রতিজ্ঞা করেছো বলে তোমাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে। জড়ের জগতে উপলব্ধির ফল কার্যকরী হতে সময় লাগে।

শ্রীমা—তুমি কি মনে প্রাণে বিশ্বাস করো না যে, তুমি যখন আমার সন্তান তখন সেই সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দেরও সন্তান হয়ে গেছো ?

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩

ভগবতী জননী,

আজ সারা দিন ধরে আমি শাড়ীর কাজ করেছি। তবে কতো ঘন্টা করেছি তা তোমাকে লিখবো না। কারণ, যদি আমি লিখি, "আমি দশ ঘন্টা কাজ করেছি," তুমি তখনি আমাকে লিখে পাঠাবে, "এমনটি চলবে না।"

শ্রীমা—তুমি হলে একটি সাহসী এবং উদ্যমশীলা মেয়ে।

স্নেহাশীষ ছেনো—

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩

মা, এই আইবিস্ ফুলগুলি খুব সুন্দর। ফুলগুলির মর্মার্থ কি ?

শ্রীমা—ফুলগুলির মর্মার্থ হলো 'সৌন্দর্যের আভিজাত্য'। আভিজাত্য এই জন্যে যে, প্রগতির পথে নিজেকে খুব প্রভু করে ধরে রেখেছে। এই ফুলের আকৃতি থেকেই ফ্রান্সের রাজাদের প্রতীক চিহ্ন হয়েছে fleur de lis নামে।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩

মধুময়ী মা,

আজও সারা দিন ধরে আমি ব্লাউজের কাজ করেছি।

—ইতি

শ্রীমা—আমার গভীর স্নেহাশীষ রইল এই পরিশ্রমী 'ছোট্ট হাসি'র জন্যে।

৩রা জানুয়ারী, ১৯৩৪

শ্রীমা—কী আর বলবো ? আমি তো সদা সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি—তোমার কর্মে ও চিন্তায়, তোমার নিদ্রায় ও জাগরণে।

১৩ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

ওগো আমার আদরের মেয়ে। আমি তোমার সঙ্গে সর্বদাই রয়েছি—তোমার সংগ্রামে ও তোমার বিজয়ে।

১৮ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

মাগো, আজ আমি নয় ঘন্টা ধরে তোমার শাড়ীর কাজ করেছি।

শ্রীমা—তা হলে তো তোমার কাজ খুব দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। কর্মে তোমার এক আশ্চর্য দক্ষতা রয়েছে, আমার ছোট মেয়েটি।

১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

শ্রীমা—আমার শক্তি এবং ভালবাসা সর্বদাই তোমায় ঘিরে রয়েছে।

২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

আমার আদরের মেয়েটি,

আজ সকালে প্রণামের সময় তুমি অতো কাঁদছিলে কেন? তখন আমি এতো ব্যস্ত ছিলাম যে, তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিনি। তুমি কি আমাকে তোমার দুঃখের কথা জানাতে চাও না যাতে আমি সম্ভব হলে তা দূর করে দিতে পারি। তুমি তো জানো, আমার ভালবাসা তোমার সঙ্গে রয়েছে। আর সেই সঙ্গে রয়েছে আমার শ্রেষ্ঠ শুভেচ্ছা তোমায় সকল আপদবিপদ থেকে মুক্ত করে দিতে।

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

কখনো কখনো আমি খুব বেয়াদপ হয়ে উঠি, তাই নয় কি, মা?

—ইতি

শ্রীমা—বেয়াদপ নয়, বেচারা মেয়ে। শুধু তোমার জন্যে কেমন একটু কষ্ট অনুভব করি। কারণ, আমি যে তোমাকে সর্বদাই হাসিখুশীতে দেখতে চাই।

২৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

মা,

আমি তোমার ছোট্ট শিশুটি হয়ে যেতে চাই, তাহলে তোমার কোলের মধ্যে থাকতে পারবো—পারবো সদাসর্বদা তোমার কাছে কাছে থাকতে।

মাগো, আমি যোগ করতেও চাই না যোগিনী হতেও চাই না। কারণ, এটা ঠিক নয় যে, কেউ যোগসাধনা ক'রে 'ক'-এর মতো হয়ে উঠুক, (এবং অন্য সকলে তাকে অনুসরণ করুক) আর বলে বেড়াক "আমি মহাকালী, আমি বিশ্বজননী, আমিই পূর্ণ।"

কিন্তু আমি একে ভয়ঙ্কর ভয় করি। এটা খুবই খারাপ। পরে এই স্থান ত্যাগ করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। এই কারণেই আমি যোগ করতে চাই না।

আমি তোমার ছোট্ট শিশুটি হয়ে থাকবো এবং তুমি আমাকে তোমার হৃদয়ের মণিকোঠায় লুকিয়ে রাখবে। তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পারবে না—পারবে না তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে।

শ্রীমা—এটা খুবই চমৎকার।

এটা খুবই ভাল, তাই নয় কি, মা ?
শ্রীনা—হ্যাঁ খুবই উত্তম। আমি সর্বান্তঃকরণে এটি সমর্থন করি।

তাহলে আমিও তুমি যেমনটি চাও তেমন হাসি-খুশীতে থাকতে পারবো। —ইতি
তোমার ছোট্ট মেয়েটি

২৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

মা, আমি বুঝতে পারছি আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়টি যেমন সুন্দর জিনিষে পূর্ণ রয়েছে তেমনি আবার এখানে খারাপ জিনিষও কিছু আছে। (যা তোমাকে পূর্বে বলেছি)

এই ছোট্ট হৃদয়টি ভালবাসা দিয়ে পূর্ণ। মাগো, আমাদের এই ছোট্ট হৃদয়ে যা কিছু খারাপ জিনিষ রয়েছে তা আমরা ভস্মীভূত করে চলেছি।

তাহলেই আমার হৃদয়ের ওই ভালবাসা অতি মধুর হয়ে উঠবে। মধুর হয়ে উঠবে শুধু তোমারই জন্যে।

শ্রীনা—তুমি যা আমাকে লিখেছো, তা অতীব সুন্দর অতীব সত্য। একটি কদর্য জিনিষের চেয়ে একটি সুন্দর জিনিষের শক্তি খুবই বেশি। সৌন্দর্যের জয় হবে নিশ্চিত। তোমার সংগ্রামে ও বিজয়ে সর্বদাই আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি।

৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩৪

আমাদের মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আছে, তাদের মধ্যে গর্ব একটি, যা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আপনা থেকেই ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে। এইগুলিকেই প্রয়োজনানুযায়ী কাজে লাগিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে হয়।

তুমি ঠিকই বলেছো। এই সকল দম্ভ দাক্ষিণ্য ও বোকামি দূর করা উচিত। তোমার এই ইচ্ছার মধ্যে আমি পরিপূর্ণরূপে রয়েছি একমত এবং আমি নিশ্চিত যে তোমার এই ইচ্ছার জয় হবে।*

(ক্রমশঃ)

---

* অনুবাদ : রীণা মিত্র

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(৩৭)

বিশ্বচেতনার পরেই একত্বের কথা আসে। বস্তুত, এটি আগের দুটি অধ্যায়ের পরিশেষ বলা চলে। সক্রিয় ও অক্রিয় ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্বিশেষ, এই দুই বোধ দ্বৈধিতা সৃষ্টি করে, একত্বের বোধে প্রতিষ্ঠা হলে, তা আর থাকে না। কর্মের মধ্যে ব্যক্তির মধ্যে, জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখতে পাই, এখানে দ্বৈতবোধ যায় না। তাই এই জগৎ ছাড়িয়ে তুরীয়ে বিশ্বাতীত চৈতন্যে স্থিতি লাভ করে, দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে চাই, এইটেই চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের চেতনায় কুণ্ঠা রয়েছে, দৈন্য রয়েছে, তাই সগুণ বা নির্গুণ, ব্রহ্মের একদিক ধরতে ও নিতে চাই। কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের যে কোন ভূমিতেই গতি হোক না কেন, নির্গুণ ব্রহ্মেই তার প্রতিষ্ঠা। তিনি নির্গুণে বা গুণাতীতে প্রতিষ্ঠ থেকেই সগুণের লীলা চালিয়ে যান। যতক্ষণ আমার চেতনা ক্ষুদ্র সংসারটুকু নিয়ে ব্যাপৃত থাকে, ততক্ষণ এ সমস্যার সমাধান হতে পারে না, এ জন্য চাই চেতনার ব্যাপ্তি। তবুও এই মানুষের ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব দিয়ে সে ভাবনা পাকা হয় না। মহাপুরুষের জীবনে ও বাণীতে, ব্যক্তির আত্মবোধের প্রতিষ্ঠা কোথায়, তার আভাস পেয়ে মানুষ তখনই দৃষ্টির গভীরতা হতে অন্তরে সেই অনুভবের সন্ধানও পেয়ে যায়। সেখানে, অন্তরে অন্তর মিলিয়ে একত্বের বোধেই তার পরিচয় মেলে।

পূর্ণযোগীর সম্যক জ্ঞানে, এক আর বহুর মাঝে কোনও বিরোধ থাকে না। সগুণে নির্গুণে, অব্যক্তে ব্যক্তে, অবিগ্রহে সবিগ্রহে, সর্বত্র সব অবস্থাতেই তিনি পরমের এক নিবিড় অনুভব পেয়ে থাকেন। বহুর প্রপঞ্চে তিনি দেখেন, একই শক্তি-বৈচিত্রীর উল্লাস। ইন্দ্রিয় সসীমকে দেখে, কিন্তু ভাব তারই মধ্যে অসীমকে আবিষ্কার করে। মরুমরীচার দৃষ্টি বিন্দুর মধ্যে তাই দেখে সিন্ধুর উন্মেলন, অখণ্ডের পরিপূর্ণ প্রকাশ খণ্ডের মধ্যে উদ্ভাসিত দেখে।

All life is Yoga—যেখানে যা পেয়েছি, তাই দিয়ে জাগ্রত চেতনাকে ভরে রেখে দিই, চেতনার প্রবৃত্তিতে চলি, ধর্মকর্ম দেশোদ্ধার নিয়ে মেতে আছি। কিন্তু সব সময় তো তা নিয়ে থাকতে পারি না। ঘুমাতে হয়, চেতনা তখন গুটিয়ে আসে, প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে এই ব্যবস্থা। নিদ্রায় জগৎ লোপ পায়, আবার চেতনা সুপ্তির মাঝে স্বপ্ন দেখে, তারপরে আরও গভীরে গুটিয়ে গেলে স্বপ্নও থাকে না। স্বপ্নে যদি সচেতন থাকা যায়, তা হল যোগনিদ্রা। স্বপ্ন, নিদ্রাজ্ঞান অবলম্বন করে ঋষিরা পথ দেখতে পান, ঊর্ধ্বজগতের ইসারা পেয়ে যান। কবির ভাবলোক অন্তরজগৎকেও এই স্বপ্ন বা নিদ্রাভূমির জাগরণ বলা যায়। যোগনিদ্রা থেকে সমাধি প্রবর্তিত হয়। সমাধিও তিন প্রকারের দেখানো হয়েছে—ভাবসমাধি, জড়সমাধি, জাগ্রৎ-সমাধি। সগুণ ব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্মের অন্তর্বর্তী এই সব অবস্থা রয়েছে। পুরাণে যেমন বলা হয়েছে, ব্রহ্মার জাগরণে সৃষ্টি, সৃষ্টি নিদ্রায় প্রলয়। বিশ্বলীলা বলতে আমরা এই রকমই বুঝে থাকি, সুষুপ্তিতে চেতনার স্থিতি হলে তাকে একেবারে প্রলয় বলা চলে, কিছুই থাকে না। সেখানে গভীর অনুভবে যে আস্বাদ পাওয়া যায়, তারই নাম সম্প্রসাদ। সুষুপ্তির ব্যুত্থানে অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর

নিদ্রার পর যে সুখ, আরাম পাওয়া যায় তাতে তার আভাস মেলে। ঐ ভূমিতে আত্মার রমণ আত্মারামতা। ব্রহ্ম একাকী, আবার তিনি আত্মারাম, আবার সেই রমণের সম্প্রসাদ নিয়ে জাগ্রতে বা জগতে নেমে আসেন। ঐ স্মৃতি যদি ধারণ করা যায়, বহন করা যায়, তাহলে জাগ্রতেও সম্প্রসাদেরই বিচরণ হয়। গীতায় তাকে বলা হয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞের সমাধি, তিনি ওই সম্প্রসাদ নিয়েই জগতে বিচরণ করেন, জেগে থাকেন। এই হল একত্বের পশ্চাৎপট বা ভূমি। যুগ-ভাবনা যুগ-চেতনা মানুষকে আবিষ্ট করে, সেটা যদি বিশুদ্ধ ভাব নিয়ে আলোর দিকে চলে, প্রবল শক্তি সংহত হয়, আর তখন আলোর পিপাসা সবার মধ্যে জেগে ওঠে। তখন তার গন্তব্য বিজ্ঞান-ভূমিতে, পরে আনন্দভূমিতে অধিকার আসবে, এক শক্তি-সম্পাতের ফলে। এই দুই ভূমি অধিকার করতে না পারলে, মনোভূমিতে থেকে আবর্তন চলতে থাকবে, কোনও সমাধানে পৌঁছন যাবে না, আমরা কখনই যোগী হতে পারব না।

আবার যোগভূমিতে গতি ও প্রতিষ্ঠা হলে পরে, আমার ভাবনা আমিই সঞ্চারিত করতে পারব, শ্যেনচক্ষু সুরচক্ষা হয়ে আলো ভেদ করে করেও তা নিয়ে চলেছি।

তখন ব্রহ্মের দুটি দিক যেমন নির্গুণ ও সগুণ, তেমনি আমার সুষুপ্তিস্থান পুরুষ ও স্বপ্নস্থান পুরুষকে জাগ্রতে প্রবর্তিত করতে পারি। আর তাতেই সবটা একত্বে মিলিয়ে নিতে পারি। এ সব বাদ দিয়ে এক নয়, সবের মধ্যে যা অনুস্যূত সবার মধ্যে তাকে আবিষ্কার করা। এইভাবে দিব্যজীবনের কর্মে তা নেমে এলে, একত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। আর কর্মও তখন দায় থাকে না, সৃষ্টির উল্লাসে সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। তাই, সগুণে নির্গুণে বিবাদ কিছুই নেই, আনন্দ ব্রহ্ম ও বিজ্ঞান ব্রহ্মের লক্ষ্যকে যদি নামিয়ে আনা যায়, এই হল নির্দেশ। একত্বের প্রতিষ্ঠায় অন্তর্মুখ হয়ে কাজ করতে হবে। তখন একাগ্র হলে, গভীর হতে শক্তি নেমে এসে কর্ম হয়ে যাবে। তা না হওয়া পর্যন্ত কর্মের ঝামেলা সংসারের ঝামেলা থেকে পালাতে হবে। সেই মুক্তি আমার কাম্য হয়, যা একান্ত আমার নিজেরই। বিশ্ব তাতে বাদ পড়ে যায়। আর, সকলের মুক্তি ঐ সঙ্গে আমারও, এই যদি কাম্য হয় লক্ষ্য হয়, তাহলে যোগের আর এক ধারা পেয়ে যাব। অতি গভীরে যে শান্তি, আলো, প্রশান্তির আনন্দ, ও তা থেকে বিচ্ছুরিত স্বপ্নভূমির আদর্শ, তাকে নিয়ে আসতে হবে জাগ্রতে। প্রসন্ন আকাশ ব্রহ্ম, আদিত্য ব্রহ্ম, এই দুই রূপ দুই ভাবে মিলিয়ে নিতে হবে এই জাগ্রত ভূমিতেই। আদিত্যের উদয় অস্ত আছে, কিন্তু আকাশ তারও ওপরে। মিত্র আদিত্যের আলো সেই আকাশে অবরুদ্ধ থাকতে পারে না। ছড়িয়ে পড়ে...

"উদীর্ঘ্বং জীবো অসুর্ং আগাদপ প্রাগাতম আ জ্যোতিরেতি।" এই যে জ্যোতি এসেছে, উঠে চল জীব। বীর্য আমাদের এসেছে, তমসা দূরে চলে গিয়েছে। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে ঋষির এই ঘোষণা—একত্বের অনুভব হলে দেখব, বুঝতে পারব। আকাশেই আদিত্য পৃথিবী সব এক। অথও পূর্ণ যোগ এই। ব্রহ্ম ভাবনা এই সঙ্গে মেলাতে হবে। ব্রহ্মের ভাব দিয়ে এইখানের ভাবকে উজ্জীবিত করতে হবে

দেহে শান্তি ব্রহ্ম সদ্ভাব বজ্রসত্ত্ব তৈরী হবে,

প্রাণে আদিত্যদ্যুতি ভরিয়ে দিতে হবে,

ব্রহ্মের আনন্দ হৃদয়ে নামিয়ে আনা আর অতিমানসের মুখোমুখি মন, এই ভাব আনতে পারলে, নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণকে এইখানে এনে ফেলতে পারি।

প্রধানত একত্বের সমস্যা দেখা দেয় এই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মে আমরা ভেদ সৃষ্টি করি বলে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্য উপলব্ধিতে আনতে, একত্বে প্রতিষ্ঠা চাই। দেহ প্রাণমনের অধীনে যখন থাকি আমরা সেই এককে বিভক্তবৎ দেখি, তাকে ছাপিয়ে বিজ্ঞানে গেলে একত্বকে পাব। দেহ আলাদা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রাণে দ্বন্দ্ব আর মনে মতান্তর, এ সবই দুটো বস্তু উৎপন্ন করে। একটা পীড়া, অপরটি ঐ ভেদবুদ্ধি জিইয়ে রাখার জন্য অবসাদ। এই জাগ্রতের জীবনে কিছুটা প্রাণের উদ্দীপন, আবার তারপর অবসাদ। একটা একাকার তামসিক নিদ্রার ভাব। তাই, একত্বের দিকে আসতে নেতির পথ ধরতে হয়। আত্মাকে প্রথম আবিষ্কার করে পেলে শান্তি আসে। তা থেকে বোধের স্বচ্ছতা এবং ফলে প্রসন্নতা। প্রাকৃত চিত্তে এগুলি একসঙ্গে থাকতে পারে না, সমাধি ও ব্যুত্থানে মেলাতে পারি না। এখানে যখন থাকি বেশ থাকি, কর্মের জগতে ঝামেলায় নামতে ভয় হয়। নৈকর্ম্যে না থাকলে যেন জ্ঞান আসে না, এই রকম ধারণা পেয়ে বসে। গীতায় এর প্রতিবাদ, কেননা নৈকর্ম্যবাদে অদ্বৈতজ্ঞান পূর্ণ হয় না। বিশ্বাতীত ব্রহ্ম এক আর বিশ্বের ঝামেলা তার বিপরীত নেরু তাতে মিলন হয় না।

কিন্তু এই দর্শনের মূলে আছে দৃষ্টির দ্বৈত। সবই ব্রহ্ম বুঝেছি, বলেছি কিন্তু অনুভবের পাকা ঘুঁটি এখনও হয়নি। তিনি আকাশবৎ, সূর্যের আলোর মত চারিদিকে সমভাবে ব্যাপ্ত, আমার দৃষ্টিও সেই দিকে খুলে যাচ্ছে। তাই ঝামেলা দেখছি, কিন্তু সেটা আমাকে বিচলিত করে না। আত্মারই সব উদ্ভাসন, সেই দিকে দৃষ্টি খুলে গেলে, সব কিছু আত্মার মধ্যে আমারই মধ্যে ভাসছে, এই অধিষ্ঠান তত্ত্ব, এই ভাব পাকা হয়ে গেলে অন্তরের শান্তিও অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই ঔপনিষদ দৃষ্টি অলৌকিক কিছু নয়। এরপরে, দৃষ্টি আরও গভীর হল। আলো কি ক্ষেত্র উদ্ভাসিতই শুধু করেছে, এ তো সবার মধ্যে সবের ভেতরে রয়েছে, তাঁর অন্তর্যামী রূপ—তিনিই সবার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সবাইকে একত্বের দিকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি দিশারী। শুধু তটস্থ থেকেই জগৎলীলা দর্শন করা নয়, তাঁর যে সৃষ্টিতে সব প্রকাশ—ফুলটি ফুটিয়ে তোলার উপাদান, তার মধ্যে যে আমারও কর্মের ভাগ রয়েছে, তা থেকে তো দূরে নই, ব্রহ্ম আর জগতে তখন সেতু বন্ধন ঘটে যায়। গভীরে প্রবেশ করে, এই ভাব বহন করে পোষণ করে চললে, চরম পরিণামের দিকে; অর্থাৎ যার যেখানে সার্থকতা সেদিকে দৃষ্টি রেখে চললে তবেই "যস্মিন্ সর্বে আত্মৈবাভূৎ...এই একত্বের সমদৃষ্টি খুলে যাবে। অন্তর্যামীর প্রেরণার মধ্যে প্রবেশ করে বাহিরের সম্বন্ধেও, স্বচ্ছ দৃষ্টি এসে যায়। তারা তো বুঝতে পারছে না, তাদের ভিতরে কি। কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়িয়ে শ্রীঅরবিন্দের ঘোষণা—"Supermind is inevitable।" এই হিরণ্যগর্ভের স্বপ্নের জীবন্ত অনুভবই তখন জীবন বেদ। যীশু বলেছিলেন, "I and my father in heaven are one", তবুও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু দুহাজার বছর পর্যন্ত তা সত্য হয়ে রয়েছে। জীবন্ত দশায় এত উজ্জ্বলভাবে তা ধরেছিলেন যে, দেহপাত হলেও, সে শক্তি অব্যাহত রয়েছে। বুদ্ধদেব সম্বন্ধেও তাই। নির্মাণকায় স্থূল শরীর, তার গভীরে সম্ভোগকায়, ধর্মকায়, সহজকায় হলে যে নিত্যবুদ্ধ, তাঁর তো মৃত্যু নেই। সেই শক্তির অধিকারবলে, তাঁর দেহত্যাগের পরে তা থেকেই বোধিসত্ত্ববাদ উদ্ভূত। ভবিষ্যতে বুদ্ধ আসবেন, বুদ্ধ এসে যাবার তাঁর ভার নেবেন, তাই সেই স্থূলে অবতরণ না হওয়া পর্যন্ত,

সেই নিয়ে কর্ম করে চলা, ভাবরূপ নিয়ে থাকা—এই সত্তা, এই আধ্যাত্মিক নিয়ম।

বেদান্তের সাধনায় আমরা লোকোত্তর ব্রহ্মে যত জোর দিয়েছি, লোকে তত জোর দিতে পারিনি। উপনিষদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম; আত্মচৈতন্যের বৃহত্ত্বের বোধে তার বোধ। তিনি সেই পুরুষ, বেদে যাকে পেয়েছিলাম। তিনিই সেই মহান্‌পুরুষ, তাঁকে জেনে, মৃত্যুঞ্জয় হতে হবে, এ ছাড়া অন্য পথ নেই। এই পুরুষের মধ্যেই সব পেয়ে যাই, দেহ-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান আর ও পরের অনুভূতি সব। এই দেহধারীর বোধ বাদ দিলে পুরুষ হয়ে যাবে এক বিমূর্ত ভাবনা। সাংখ্যভাবনা প্রকৃতিপুরুষের বিবেক যেমন বুঝিয়েছেন, পুরুষ সেখানে আলোর মত দ্রষ্টা হয়ে তাকিয়েই আছে; বেদান্তের সাধনাতেও, এই কল্পনায় ঐ দ্রষ্টার দিকে ঝোঁক পড়ায়, শক্তির ও ভক্তির দিক যেন বাদ পড়ে গেল।

শ্রীঅরবিন্দের ভাবনায়, সত্তার সপ্ততন্ত্রীতে সবদিকটাই এসে গেছে। ব্রহ্মে পুরুষ প্রকৃতি এক বহু সমন্বিত। তার সত্তা তিনি আছেন সবের মূলে, ব্রহ্ম সত্তাবান, তিনি চিৎ-স্বরূপ আনন্দস্বরূপ তাঁরই শক্তি ইচ্ছা বা সঙ্কল্প তা থেকে সৃষ্টি, সেই তাঁর তপ তপস্যার শক্তি, এবং সেই তপে তিনিই জগৎরূপে বিচ্ছুরিত, এই তাঁর শক্তির পরিচয়। তাঁর সংকল্প "বহুস্যাম প্রজায়েয়।" তাঁরই কামনা—"সোঽকাময়ত"। এই ঈষা সঙ্কল্প কামনা, তা থেকে যেন বিচ্ছুরিত হয়ে উল্টোদিকে জড় সৃষ্টি পর্যন্ত হয়ে যে থেমে গেল মনে হয়, তা থেমে যায়নি, ঘনীভূত হল। চিৎ ঘনীভূত হয়ে জীবের মধ্যে প্রবেশ করল অনুপ্রমাণ হয়ে; সেই শক্তি তাই সবার মধ্যে। জীবাণু একটা শক্তিসম্পাত। ঋগ্বেদ শুনিয়েছেন "তোমরা তাঁকে জানো না, তিনি তোমার অতি নিকটে অন্তরে। নব্বদ পুরুষ হয়ে জীবের অন্তিকে তিনিই।

ওদিকে ব্রহ্মজ্যোতি, এদিকে জীবস্বরূপ। জড়কে সংহত করল দেহবোধ, এই তার লক্ষ্য। জড়ের মধ্যে প্রাণ কিলবিল করছে, তাতে মন বিজ্ঞান, সেই পুরুষই বলে "অহং ব্রহ্মাস্মি"। অন্য প্রাণ মনে তিন হয়ে আছি, সাত হতে হবে, বিজ্ঞান আনন্দ চিৎ সৎ। তখন দেখি, দেহ প্রাণ মন নিয়ে একি অপরূপ! সমাধি যোগে যদি আত্মদর্শন করতে পারি, তাও কিন্তু দেহেরই ক্রিয়া, প্রাণ মনকে উজ্জীবিত করে। সেই ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়া দেহ-প্রাণ মন নিয়ে এক যোগে আমার মধ্যেই রয়েছে, এই ধরেই চলতে হবে, তাঁকে জানতে হবে। তিনি সূর্যের মত দেদীপ্যমান, তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আলো প্রাণ আনন্দ ওপর থেকে ঢেলে দিচ্ছেন, এ থেকে অহরহ শোষণ করে আমি বৃহৎ হই, হয়ে চলেছি, এই সাধনা।

এই বিরাট একত্ব নিজের মধ্যে পেয়ে আবার বাইরেও ছড়িয়ে দিয়ে একাকার হয়ে যাওয়া। একটা বটগাছ যেমন একাই একটি অরণ্য, বনস্পতি। নেরুদণ্ডটি হয়ে যায় বট-বৃক্ষের কাণ্ড আর মাথায় একটা ছাওয়া রয়েছে যেন "শিরসি সহস্রধারে অহিচ্ছত্র।" অনন্তে বিস্তারিত সেই কাণ্ড বিশ্ব ছাপিয়ে আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, এই হল বারুণ বৃক্ষের রূপ। এই বোধ যদি আসে, তাহলে একার মধ্যে যা পেয়েছি, সেই ভাবই সর্বত্র সঞ্চারিত করতে পারব। এই দেহের মধ্যেই তিনটি ভাব রয়েছে। এই দেহকেই সুস্থ প্রসন্ন করা, ধাতু প্রসন্ন হয়ে তখন তার মহিমা ফুটে বেরোয়। এই তনুকেই ব্রাহ্মী করা, বৃহৎ প্রাণ মহাপ্রাণ একাকার-বোধ এলে আর ক্ষুদ্র প্রাণ আঁকড়ে থাকার কোন বন্ধন থাকে না। এইরকম করে নিজেকে বৃহৎ করতে হয়।

সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ ওই, আর সান্ত ক্ষুদ্র আমিএই। শুধু ধ্যান করতে অনন্তে নিজেকে বিস্ফারিত করতে হলে, এই সান্ত আমিকে ছুটি নিতে হবে। ওই অনন্তের শক্তি নিয়েই আধ্যাত্ম ভূমিতে বিচরণ করা। তখন বিরাট বিশ্বচেতনা লাভ করে সবার প্রতি প্রেমে দরদে এক হয়ে যেতে হবে, আবার সব ছাপিয়ে তুরীয় ভূমির পরা শান্তিতে চেতনার স্থিতিও ঐ সঙ্গে থাকবে। সুষুপ্তিতে গভীর নিদ্রায়, দেহ অধিষ্ঠান হয়ে নীচে যেমন সব কিছু ধরে আছে তেমনি আবার সব ছাপিয়ে সবার ওপরেই এই চেতনা বিরাজ করছে, এই ভাব বহন করে চলতে হবে। আমার মধ্যে যেমন, চেতনা সবার মধ্যে অনুস্যূত, ওতপ্রোত আবার পরিব্যাপ্ত। এই পর্যন্ত মনের ভাবনা। এর পরে আর একটা ভাব বা শক্তির সাক্ষাৎ মেলে। ভাবনা বারবার করেও সাড়া জাগে না, কিন্তু নাড়ী চৈতন্য সক্রিয় হলে যখন সাড়া দেয়, শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বয়ে যায়, তখন সমস্ত দেহ যোগাগ্নিময় হয়ে যায়, "সুয়ের আগুন জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে"...। এই ভাবে দেহে প্রাণে মনে অনুভব করে উদ্দীপ্ত হতে না পারলে কিছু হবে না। এই উদ্দীপনার সাধনাই মন থেকে বিজ্ঞানে নিয়ে যায়, আর তাই হল বিশ্ব-চেতনার বোধ, যার মূলে ব্রহ্ম। এই বিজ্ঞানে পৌঁছতে হবে। এরই শুদ্ধ ভাব হল বোধি, বোধির উন্মেষে প্রতিবোধ জাগ্রত হয়, তখন আর বাহিরের কোন প্রমাণের পরে আর প্রত্যয়ের নির্ভর করতে হয় না। তখন ঈশ্বরে বিশ্বাস চেতনার অঙ্গীভূত হয়ে থাকে, তাঁকে ছেড়ে থাকতেই পারে না।

চিত্তের সাবালকত্ব না এলে বোধি উন্মেষিত হয় না, তাঁর ইচ্ছাশক্তি অতিমানসের ছোঁয়া বোধিরূপে উদ্ভাসিত হয় এই তাঁর প্রসাদ নেমে এল, তিনি যেন ছুঁয়ে গেলেন। যার, আসে বিদ্যুৎ ঝলকের মত, চোখের নিমেষ ফেলার মত, কিন্তু তাকে তো আর ভোলা যায় না। অতিমানস-বিজ্ঞানের আলো এসে পড়েছে! এ যে সত্য ঋত দিব্য মনের আলো! বহুদিন পর্যন্ত এরকম চলে, তাঁরই সহায়ে আলো পড়ে পড়ে পরিধানে দেহে প্রাণে মনে পর্যন্ত রূপান্তরের শক্তি আসে, দেহ স্থৈর্য গুণের আধার হয়, প্রাণে বীর্য মনে দীপ্ত জ্যোতি। জীবচেতনার আনন্দে সত্তা জেগে ওঠে, এই হল শক্তির উদ্বোধন। তার মহিমা জাগ্রত হল, তিনি আমি একাকার হয়ে গেলাম, আমি যে তাঁরই। এই একাকার হতে পারলে তখন জানাও সম্পূর্ণ হবে। সৌন্দর্য থেকে প্রেম, তা থেকে আনন্দ, এই একত্ব দ্বৈতলেশশূন্য। তাঁর সত্তা যেমন সব ছাপিয়ে আছে, জ্ঞানে ও প্রেমে তেমনি সবাইকে জড়িয়ে আছে। তাঁর অধিষ্ঠান তাঁরই চৈতন্য, তাঁরই লীলা। তাঁর জ্ঞান নিয়ে তিনি যে শুধু নির্বিকল্প নির্বিশেষ হয়ে আছেন, তা নয়, এই জগৎরূপেও তিনি, "আনন্দরূপং অমৃতং যদ্বিভাতি"। এই স্মরণ করে ভক্তি ও জ্ঞানে এক করে জানাই তো আনার পায়, আনার তপস্যা। তাঁর তিনটি লক্ষণ, সৎ চিৎ আনন্দ সূর্যের মতই নীলাকাশে ব্যাপ্ত এবং উদ্ভাসিত সেই আলোতে এই জগৎও স্ফুটিত, সবার মধ্যে সেই তাপের বিকিরণ, তিনি আমি জগৎ এক হয়ে জানা হয়ে যথার্থ অদ্বৈত জ্ঞান, আর তাতেই একত্বের বোধ পাকা হয়। সে একত্ব সব দিক দিয়ে সমরস। জ্ঞান শক্তি ও আনন্দ হতে বিযুক্ত নয়; সেই পরম একত্বেই সম্যক্ জ্ঞানের উপলব্ধি আমাদের নিয়ে যাবে।*

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ

সমীরকান্ত গুপ্ত

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ আমাদের সুরেনদা ছিলেন। কবে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ বা আলাপ তার ঠিকানা খুঁজে পাই না। কতদিন এখানে তাঁর মুখে বিপ্লবের ও দেশের রহস্যকাহিনী শুনতে শুনতে রাত্রি হয়ে গিয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পূর্বে এবং পরে দিল্লীতে সকল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাচক্রের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংযোগ ছিল—তাঁর আলাপে তাই জীবন্ত ইতিহাস, বর্তমানের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যতের চিত্র ফুটে উঠত। তিনি তথাকথিত পণ্ডিত ছিলেন না কিন্তু জীবনের বিপুল গ্রন্থ থেকে গভীর জ্ঞান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন নির্ভীক দুঃসাহসী—সংকল্পসিদ্ধির পথে কঠোর পর্যন্ত, তেমনি তিনি ছিলেন উদার বন্ধু, আশ্রিতবৎসল, প্রেমনথিত ভাবুক—বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি মৃদু। তাঁর মৃদু স্বভাব ও হাস্যোদ্ভাসিত মুখ অনেকে দেখেছেন, আমাদের বন্ধুবান্ধব দু'চারজন তাঁর সিংহগর্জনও শুনেছেন।

একবার সুরেনদা পণ্ডিচেরী এলেন P.A.C.-র কর্ণধার হিসাবে। এঁরা পার্লামেন্টের দল, ঘুরে ঘুরে জাতীয় শিল্পসংস্থার হিসাব পর্যবেক্ষণ করেন এবং পার্লামেন্টে তার আলোচনা করেন। পণ্ডিচেরীতে তাঁদের জন্য গোয়েল গেষ্ট হাউসে এক লাঞ্চের বন্দোবস্ত হল। নেপথ্যে সুরেনদা উদ্যোগী—সম্মুখে একজন ধনপতি। লাঞ্চের নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ করে আধঘন্টা পরে রন্ধনকে চীফগেষ্ট রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি মহাশয় উপস্থিত হলেন। তাঁকে সুরেনদা যে ভর্ৎসনা করলেন—সে রকম রূঢ় ভাষায় তিরস্কার পণ্ডিতরা তো সেকালের ছাত্রদের উপহার দিতেও দ্বিধা করতেন। তাঁর স্পষ্টবাদিতায় এতটুকু বাধা ছিল না। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, সময়ানুবর্তিতার অভাব, বৈঠকে অসৌজন্যতা তাঁকে সেদিন এত ব্যথিত করেছিল।

পুরানো দিনের স্মৃতিচারণে দেশবন্ধুর প্রসঙ্গে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তিনি বলতেন দাশমশায়ের দেশসেবাটা সৌখীন একটা শখ, এরকম ধারণা তাঁর মনে ছিল। একবার প্রাদেশিক কংগ্রেসের এক ঘরোয়া বৈঠকে সুরেনদা দেখেন চিত্তরঞ্জন টেবিলে বিরাট মুষ্ট্যাঘাত হেনে হুংকার দিয়ে উঠলেন, "আমি জানি, তোমাদের বিশ্বাস ইংরাজ আমাদের ভাল করবে।" সেই মূর্তি অবলোকন করে সেই কণ্ঠ শুনে তাঁর দ্বিধা এক মুহূর্তে চিরকালের জন্য মিলিয়ে গেল। চিত্তরঞ্জনের প্রসঙ্গে তিনি আর একটি মুখরোচক গল্প করেছিলেন। সুরেনদা তখন সম্ভবত জেলা-কংগ্রেস সভাপতি। তিনি দাশমশায়কে ময়মনসিংহে নিমন্ত্রণ করলেন। চিত্তরঞ্জন রাজি হলেন কিন্তু দাবি করলেন তাঁকে দু'লাখ টাকা দিতে হবে। অন্তরে বিরূপ হলেও নিজেকে বোঝালেন টাকাটা দেশের কাজের জন্য নিশ্চয়। তিনিও জেদ করেই রাজী হলেন। হাঁ, দু'লাখ টাকাই দেবেন। দু'টি দিনের মধ্যে দু'লাখ টাকা তোলা সেসময়ে সহজ ছিল না। দিনান্তে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত প্রায় লাখ খানেক সংগ্রহ হল। বিমর্ষভাবে তিনি চিত্তরঞ্জনকে জানালেন। কৌতুকোদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চিত্তরঞ্জন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সমগ্র জেলায় এমন কে আছেন যাঁর সামর্থ্য ঘাটতি অংশ পূরণ করার?

সুরেনদা এক ডেলির নাম করলেন, কিন্তু তাঁর হাত থেকে একটি কপর্দকও আদায় করা অসম্ভব। দেশবন্ধু পরের দিন সুরেনদার সঙ্গে নগ্নপদে মলিনবেশে এসে হাজির হলেন সেই ব্যক্তির বাড়ী। সংবাদ পেয়ে হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। চিত্তরঞ্জন সহসা ভূমিলুণ্ঠিত হয়ে ভদ্রলোকের পা জড়িয়ে ধরলেন। তারপর সাফল্য অনিবার্য। লক্ষ টাকা হাতে নিয়ে সহাস্যবদনে ফিরে এলেন দেশবন্ধু। সুরেনদা বিস্মিত অবাক। দেশের জন্য এ অর্থ প্রয়োজন—গরজ বড় বালাই।

বাইশ বছর ইংরাজের জেলে কাটাবার মধ্যে কিছুকাল তাঁর গিয়েছে ফ্রন্টিয়ার জেলে। সেখানে পাঠান রক্ষীরা অবাক হয়ে দেখত এই একান্ত ভদ্র শান্তশিষ্ট তরুণদের জন্য ইংরাজ কী আতঙ্কগ্রস্ত সন্ত্রস্ত। তাদের মধ্যে কেউ তো বলেই ফেলেছিল, "তোমরা নিশ্চয় বড় জানো, কোনো দারুণ মন্ত্রকৌশল যার ভয়ে সিংহ কম্পমান; আমাদেরও সেই মন্ত্রগুপ্তি দাও।" বিপ্লবীরা সেই গোপন অস্ত্র দেবার আশা দেখিয়ে তাদের মাধ্যমে নিজেদের কাজ করিয়ে নিতেন—বাহিরের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জিনিসপত্রের আদানপ্রদান। এই পাঠানদের কাছেই তাঁর শেখা 'নিরহুগোস্'—মাংস রান্নার বিশেষ কায়দা। সেটি তিনি পণ্ডিচেরীতে আমাদের প্রত্যক্ষ করিয়েছিলেন। তাতে অনুপান বা উপাদান হিসাবে সমান ভাগে থাকবে মাংস পাতিলেবু লংকা এবং ঘি। বুঝে দেওয়া মাত্র মনে হল মুখের সিলিংটা যেন মাথা স্পর্শ করছে। এটা একটা রীতিমতো গবেষণার বিষয় যে পাঠানরা দৌড় বা উচ্চলম্ফে প্রশিক্ষা নিলে কতদূর বিশ্বপ্রতিযোগিতায় পৌঁছাতে পারে এবং এই রসায়নটি অলিম্পিক ক্রীড়াপ্রস্তুতির ব্যবহৃত ডোপের নির্দোষ ও সাফল্যজনক বিকল্প হিসাবে চলতে পারে কিনা।

সুরেনদা রাজনীতিতে বল্লভভাই প্যাটেলের সগোত্র এবং বস্তুত প্যাটেলের প্রিয়-পাত্র। নেহেরুজী সেকথা জানতেন অথচ সুরেনদাকে সন্ত্রমের চক্ষে দেখতেন। একবার সুরেনদার মনোনয়ন নিয়ে কংগ্রেসীমহলে প্রশ্ন উঠেছিল—অনেক বছর তো তিনি পার্লা-মেন্টে ছিলেন। নেহেরু এক কথায় নিষ্পত্তি করে দিলেন—If he is not allowed to remain in the Parliament, I have no right to be there either. (তাঁকে যদি পার্লামেন্টে থাকতে দেওয়া না হয়, তবে আমারও সেখানে থাকবার কোনো অধিকার নেই)। অন্য এক দিন লবিতে সুরেনদা কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছিলেন, নেহেরু পাশ দিয়ে যেতে যেতে উভয়কে হাসিয়ে মন্তব্য ছেড়ে গেলেন—Who is spoling whom ? কে কাকে নষ্ট করছে? এখানে উল্লেখযোগ্য, নেহেরু যে তিনবার পণ্ডিচেরী এসেছেন প্রতিবার তাতে মূল ভূমিকা নিয়েছেন সুরেনদা। পণ্ডিচেরীতে আশ্রম-সম্পৃক্ত চিনির কারখানা ও ময়দার কল তাদের অস্তিত্বের জন্য সুরেনদার কাছে বহুলাংশে ঋণী।

সুরেনদার নিজের শরীরটাকে পুরোদমে খাটিয়ে নিয়েছিলেন। জলে জঙ্গলে অনক্ষ্যে তাঁকে যে কঠোর বিপ্লবীর জীবন যাপন করতে হয়েছিল তা বিস্ময়কর, নানা বিপদের সম্ভা-বনায় তা কোথাও কোথাও রোমাঞ্চকর। বলা বাহুল্য শরীর তাঁকে ক্রমে নোটিশ দিতে আরম্ভ করল। কলকাতায় তাঁর মারাত্মক অ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন করেছিলেন ডাঃ সান্যাল। তারপর প্রায় বছর দশেক আগে তিনি লক্ষ্ণৌ যান—এক অতি উচ্চপদস্থ

কংগ্রেসীর সম্পর্কে গোপন তদন্তে। এই কাহিনী সুরেনদার মুখে শোনা। রাত্রিতে তিনি শুয়েছিলেন সরকারী অতিথি-ভবনে। মধ্যরাত্রে দারুণ হৃদ্‌পিণ্ডের যন্ত্রণায় ঘুম ভাঙল তাঁর। ভাবলেন এই হয়ত শেষ। মনে মনে মাকে ডাকলেন, জানালেন—মৃত্যুতে দুঃখ নেই, তবে সঙ্গের ব্রীফকেসটি যেন দ্বিতীয় ব্যক্তির হাতে না পড়ে। সেই বেদনার তীব্রতা একটু কমতে খাট থেকে নেমে হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে সোরাই থেকে ঢেলে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। রাত্রিশেষে ডাক্তার ডাকাডাকি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা। তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

নেহেরুজীর ওপর তাঁর ছিল সহকর্মীর অনুরাগ, কিন্তু প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরার ওপর ছিল তাঁর অগাধ স্নেহ। ইন্দিরাকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে। কত গভীর রজনীতে প্রধানমন্ত্রীর বাড়ী থেকে জরুরী ডাক এসেছে—এক বস্ত্রে তিনি চলে গিয়েছেন সেই আহ্বানের সাড়ায়। কংগ্রেস-বিভাগের পূর্বাহ্নে হায়দারাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি ছিলেন ইন্দিরাজীর পাশে। এই অধিবেশন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে সুরেনদার সুটকেসটি খোয়া যায়। পরে তিনি রহস্যচ্ছলে গল্প করেছেন, যখন বেশ কিছুদিন পরে বাক্সটি উদ্ধার হল তার মধ্যে দামি কিছুই হারায়নি, সোনার বোতামটি পর্যন্ত অস্পৃষ্ট, কিন্তু অদৃশ্য হয়েছে ছোট্ট নোটবইটি—যাতে লেখা থাকত গোপন ঠিকানা, ঐতিহাসিক গোপন সব সাক্ষাৎকারের সময়-তারিখ।

সুরেনদা মাদ্রাজ বিমানবন্দর থেকে সোজা পণ্ডিচেরী চলে আসতেন। আমরা মাঝপথে চা-কফির জন্য থামতাম—একটুক্ষণ চালকেরও বিশ্রাম মিলত। একবার তিনি লিখলেন পানীয় জল নিয়ে মাদ্রাজে উপস্থিত থাকতে। বলাবাহুল্য আমি তাঁর যাতায়াতের সঙ্গী হতাম অনেক বছর ধরে। কিছুকাল অবরেন্দ্রও চালক হিসাবে সঙ্গে থাকত। পরে রাজেনদাও জুটেছিলেন। ভাবলাম বোধহয় ডাক্তারের নিয়মে তাঁর ওই রকম জলের ব্যবস্থা। প্লেন থেকে নেমে সটান গাড়ীতে চাপলেন। চালককে বললেন কোথাও না থেমে সোজা আশ্রমে যেতে। জলের কথা জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "ওটা তোমাদের জন্য। দিল্লীর তন্দুরী চিকেন ও পরোটার সঙ্গে খেতে লাগবে। তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই ঝুড়িতে।" সে সবের সদ্ব্যবহার পণ্ডিচেরীতে এসে হল সদলবলে। তাছাড়া নানারকম খাবার জিনিস প্রত্যেকবার সঙ্গে আনতেন। তা না হলে তাঁর মন ভরত না।

এর ব্যতিক্রমও ছিল। বুড়ো কংগ্রেস আর নব কংগ্রেস বিচ্ছেদের পর তিনি মাদ্রাজে নেমেই বলতেন, শহরে যাবো। ঘুরে ঘুরে নেতাদের সংগে দেখা করতেন—আলাগেশন, ভেঙ্কটরামন, কামরাজ কেউ বাদ যেতো না। একবার পণ্ডিচেরী থেকে ফিরতি-পথে তিনি থামলেন তাম্বারামে—এক বিরাট বাগানবাড়িতে নিরালা থাকেন ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী। আমাদের গাছতলায় বসিয়ে রেখে তিনি সোজা ঢুকে গেলেন অন্দর-মহলে। ঘন্টাখানেক পরে সহাস্যবদনে দু'জনে বের হয়ে এলেন। আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন সুরেনদা। টি.টি.কে আমাদের সম্বোধন করে বললেন, "Babu is an old friend of mine (অর্থাৎ এই বাবুটি আমার পুরাতন বন্ধু)। সুরেনদা রাস্তায় আসতে কৌতুকভরে বলেছেন, "তা তো বটেই; ওর পদত্যাগের জন্য আমার দায় কম ছিল না!" তবে দেশের হিতার্থে বন্ধুবিচ্ছেদের ভয়েও পেছপা হননি। তিনি বুঝেছিলেন

নিবেদিতার উভয়সঙ্কট—একদিকে তাঁর পুরাতন সহকর্মীরা, অন্যদিকে জওহরলালের কন্যা। সুরেনদা বুঝিয়ে তাঁকে নিরপেক্ষ থাকতে রাজী করিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ লড়াই তাঁর কাছে সাফল্যের জন্য কম গুণী নয়। উভয়বঙ্গের যোগসূত্রটি ধরে ছিলেন তিনি—সেই রোমাঞ্চকর ইতিহাস একদিন প্রকাশ হবে যখন বলা যাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তাঁদের নিবিড় সংযোগের রহস্যকাহিনী। স্বাধীন সোনার বাংলায় গিয়ে নিজের জন্মস্থান পর্যন্ত পরিদর্শন করে এসে তিনি বেশি অসুস্থ হন। তাঁর মুখে পণ্ডিচেরীতে শুনলাম প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—নতুন যুগের আশাবাদী বিপ্লবীদের দারুণ পরিকল্পনা, গোঁড়াধর্মের ভিতর থেকে ধর্মনিরপেক্ষ সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এক রাষ্ট্রের অদ্ভুত অভ্যুত্থান।*

সুরেনদা বলতে বলতে স্বপ্নের ঘোরে যেন ভবিষ্যৎ সার্থকতার মধ্যে চলে যেতেন বলতেন, স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম শ্রীঅরবিন্দের ভারতপ্রতিমার পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ। সেই ভারতের মূর্তি তিনি দেখতে পেতেন, যোগশক্তির লীলা একে সম্ভব করে তুলেছে তারা তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ বস্তুর মতোই বাস্তব। ভগবানের যন্ত্র হয়ে ইন্দিরাজী ভারতকে নিয়ে চলেছেন সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে। এখানে তিনি একান্ত নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন।

তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল আর এক ভাবনা। সেটি আশ্রমের—শ্রীমার স্বপ্নসৌধের নিরাপত্তা। মায়ের শারীরিক অবর্তমানে তার নিবিঘ্ন চলা। তিনি নিজে এই জগন্নাথের রথের চাকায় কাঁধ লাগিয়েছিলেন। এই উদ্যোগে আবার সংগ্রহ করেছিলেন এমন এক সহকর্মী—তাঁর কথায়, যিনি যোগ্যতায় সামর্থ্যে একাকী এই ভার উদ্ধারে সক্ষম। এখানেও তিনি নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

১৯৭৩এর ১৭ই নভেম্বর শ্রীমা দেহত্যাগ করলেন। ১৮ই সে-সংবাদ পেয়ে সুরেনদা হতভম্ব। তিনি তখনই পণ্ডিচেরী রওনা হবেন। অথচ হাত শূন্য। স্নেহভাজন আত্মীয়া জোৎস্না জানালেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, হরিদ্বারে তীর্থযাত্রার মানসে কেউ কিছু টাকা গচ্ছিত রেখে গেছে। সেই টাকা ধার চেয়ে নিয়ে বিমানে তিনি পণ্ডিচেরী পৌঁছুলেন ১৮ই।

যখনই কোনো সংকট দেখা দিত, মা বলতেন, সুরেন্দ্রমোহনকে ডেকে পাঠাও। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, he is my man. নলিনীকান্ত বলেছিলেন, সুরেন্দ্রমোহন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার উপযুক্ত। এর উপর টীকাটিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

---

* পরবর্তী কালের ইতিহাস নগ্ন করে দেখিয়ে দিয়েছে সুবিধাবাদী সাম্প্রদায়িকতা-বাদীরা বৈদেশিক শক্তির হাতে ক্রীড়নক হয়ে কী এক counter revolution এনেছে বাংলাদেশে ; তবু তার মুক্তি অনিবার্য, ভারতের ও এশিয়ার পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধির লক্ষ্যে সে তার বর্তমান পরিস্থিতি ও ব্যবস্থা নিয়ে অনড় হয়ে থাকতে পারে না।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের একখানি পত্র

Surendra Mohan Ghosh
Member of Parliament
(Rajya Sabha)
Deputy Leader, Congress Party
in Parliament

21 Janpath, New Delhi-1
Phone: 47782
17-B, Rammoy Road, Calcutta-25
Phone: 47-2780
New Delhi/Calcutta 6-11-1965

স্নেহের—,

গতকাল তোমার চিঠি পেয়ে সুখী হয়েছি। আমি যখনই আসি ৬।৭ দিন আগে খবর দিয়েই আসব। এখনও বলতে পারছি না কবে আসব। আসবার ইচ্ছা প্রবল এই মাত্র বলতে পারি। নিখেছ ভয় আমাদের হবেই। গতকাল শাস্ত্রীজীর স্টেটমেন্ট দেখেছ। প্রতিটি কথা সমগ্র ভারতবাসীর মনের কথা। এর পিছনে দেশের জনতার মনের ছাপ প্রতি-ফলিত হয়েছে। শাস্ত্রীজীও যা বলেছেন তার প্রতিটি উক্তি ওজন করে বলেছেন, ওর কমা, সেমিকোলন বাদ দিয়ে কোন কিছু ভারতবর্ষ মেনে নিবে না পৃথিবীতে যাই কেন না ঘটুক।

মায়ের আশীর্বাদ পূর্ণমাত্রায় রয়েছে কাজও করে যাচ্ছে। প্রাণ দেবার জন্য যাকে বলে হড়োহড়ি তাই লেগেছে সর্ব্বত্র। যাদের প্রাণ দেবার কথা তারা হড়াহড়ি করেই এগিয়ে আসছে। 'কার আগে প্রাণ কে করিবে দান' সর্ব্বত্র এই আবহাওয়া তবে একটা 'কিন্তু' আছে। সেটা বড় 'কিন্তু'। যাদের হাতে সোনাদানা আছে, টাকা আছে বাণ্ডিল বাণ্ডিল নোট সেই সব হতভাগাদের কানে মায়ের ডাক পৌঁছে নাই। আর আছে আমাদের একদল হতভাগা যাদের আমরা জানি বুদ্ধিমান বলে। সমাজের স্তরে স্তরে এরা রয়েছেন, খ্যাতিমান ব্যক্তি বলে সকলের কাছে সমাদর লাভ করছেন। এই বুদ্ধিমানেরা হাঁ-কে না এবং না-কে হাঁ বুঝিয়ে দিবেন জলের মত তরল করে। এদের কাছে মায়ের ডাক পৌঁছা চাই। আমি দেখতে পাচ্ছি যারা গরীব যারা মধ্যবিত্ত তারা পাগল হয়ে উঠেছে কি করে গভর্ণমেন্টকে সাহায্য করতে পারে কিন্তু যাদের কথা উপরে লিখলাম তারা হাত গুটিয়ে, বিজ্ঞের মত বসে আছে পরে মজা লুটবে, যেমন লুটে এসেছে ইংরেজের সময় এবং যেমন লুটে চলেছে স্বাধীনতার পর। হতভাগারা তাদের দুর্দ্দিন যে ঘনিয়ে আসছে—সুদে আসলে মা আদায় করে নিবেন সেকথা আজও বুঝতে পারছে না। আজ এই পর্যন্ত, লোক এসে পড়েছে—

ইতি—

সুরেনদা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobinnro	5·00
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurocindo	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		যন্ত্রস্থ
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে, আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, Benaras Road,
H O W R A H.
Phone 66-2434

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু গুহের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—
চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
অথবা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

Our Homage to Sri Aurobindo and The Mother

Mitra Engineering & Construction Co.

(ENGINEERS OF REPUTE)

Phone : 46-3957

Specialist in Insulation Work, Air Conditioning & Refrigeration, Electrical Engineers & Builders.

16/1, Chandranath Chatterjee Street
Calcutta–25

BINDER
OF
Viswa-Bharati & Sri Aurobindo Pathamandir
QUALITY & RELIABILITY
ARE SPECIALITIES

M/s. Indian Book Binding Agency
72, Baithak Khana Road
CALCUTTA—700009

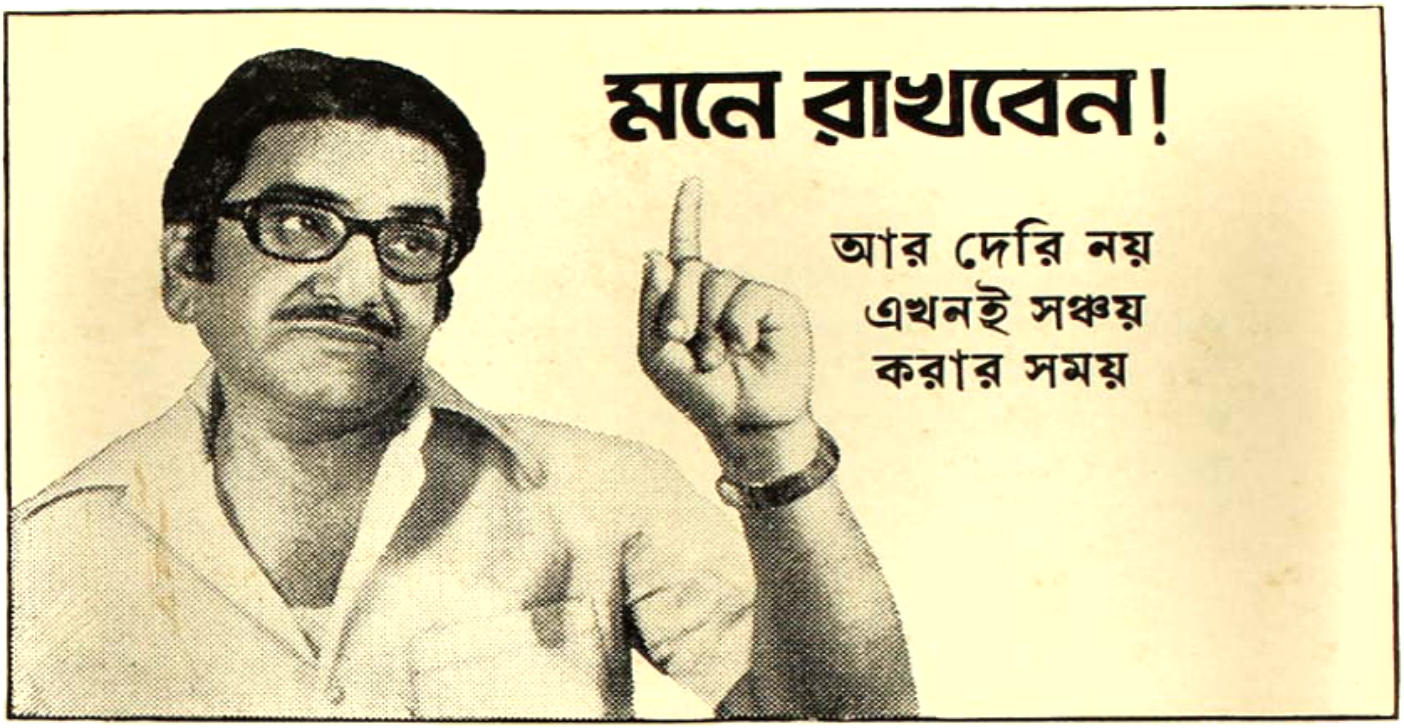

আপনার নিশ্চিন্ত সুখের
ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট

১৫ বছর পরে
৪১,৮০০৲ টাকা পেতে হলে প্রতিমাসে
১০০৲ টাকা সঞ্চয় করুন
অথবা
২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲ টাকা পেতে হ'লে প্রতিমাসে
৫০৲ টাকা সঞ্চয় করুন।

॥ এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থা নিচের তালিকায় পাবেন ॥

মাসিক সঞ্চয়	১০ বছর পরে পাবেন	১৫ বছর পরে পাবেন	২০ বছর পরে পাবেন	২৫ বছর পরে পাবেন
১০৲	২০৬৬৲	৪১৮০৲	৭৬৬০৲	১৩,৩৮০৲
২০৲	৪১৩২৲	৮৩৬০৲	১৫,৩২০৲	২৬,৭৬০৲
৫০৲	১০,৩৩০৲	২০,৯০০৲	৩৮,৩০০৲	৬৬,৯০০৲
১০০৲	২০,৬৬০৲	৪১,৮০০৲	৭৬,৬০০৲	১,৩৩,৮০০৲

এই প্রকল্পে আপনার সঞ্চয় দ্রুত হারে বেড়ে উঠবে!

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৫৬ ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১
অথবা আমাদের যে কোন শাখা অফিস

Progressive- UIB-6/78

শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ [illegible] পরবর্তী সময়ে [illegible] এবং [illegible] পাঠমন্দির প্রকাশনের ভারতে। [illegible] পুস্তিকায় [illegible] মূল বক্তব্য এবং [illegible] অনুদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। [illegible] প্রকাশ করা হবে। [illegible] প্রকাশের কথা, গ্রন্থ ও উহার, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি। আশা করা যায় [illegible] ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

গ্রাহক প্রকাশনী মূল্য—৩০৲ টাকা (সাড়ে ৩৮৲ টাকা) ([illegible] প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪০৲ টাকা (সাড়ে [illegible] টাকা)

[শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র রচনা সম্পূর্ণ জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। [illegible] ছাপা ও [illegible] কাগজের অত্যন্ত ধীরগতি হওয়ায় [illegible] বেড়ে যাবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।]

গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা জমা দিয়ে গ্রাহক হতে হবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

২। পুস্তিকা ৭৩ প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ৩৮৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।

৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জন্য ৩০৲ টাকায় সেট বিনামূল্যে জমা করা হবে।

যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩০০৭৩

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮ [illegible] কলিকাতা-৭৩০০১৩

[illegible] ও যোগাযোগ [illegible] পরবর্তী সময়ে [illegible] ও পরদিন থেকে [illegible] হবে।]

APR 1971

বা ত্রৈমাসিক পত্রিকা

বর্তিকা

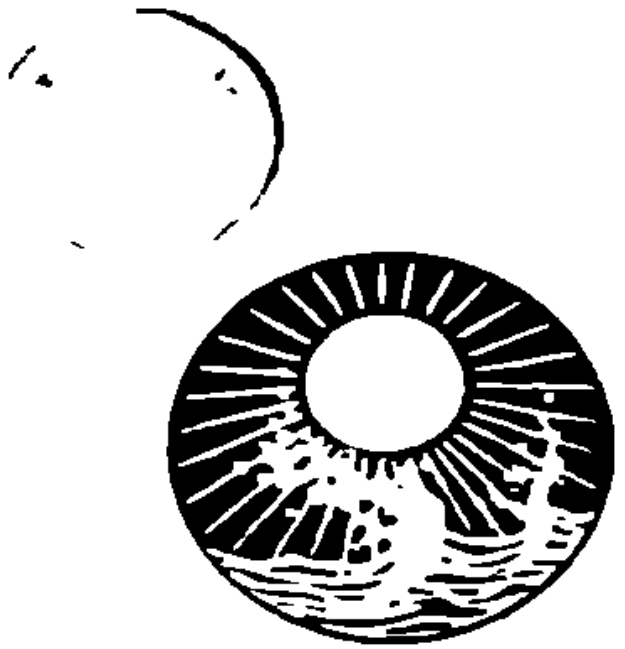

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৬

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭৬)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

প্রণাম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৫
সাবিত্রী	শ্রীঅরবিন্দ	৬
ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিনিবেশ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	১২
মায়ের সঙ্গে কথা		২২
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী		৩১
ছোট্ট হাসিকে লেখা শ্রীমার পত্র		৩৬
একরাশি ফুল	রবেন সেনগুপ্ত	৪৩
অদ্বৈত সমুদ্র	শ্রীঅরবিন্দ	৪৪
একমেবাদ্বিতীয়ম	শ্রীঅরবিন্দ	৪৫

পত্রিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by : **Nolini Kanta Gupta**
Published by : Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12
Printed by : Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2

He who lives to serve
the Truth is not affected
by outward circumstances.

"দর্শন"

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

মা বলছেন :

"এই দেখ আমি এসেছি আমার রূপান্তরিত জ্যোতির্ময় সোনার দেহ নিয়ে, তোমাদের কাছে। তোমার, তোমাদের বা আর পাঁচজনের ব্যক্তিগত সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত কেন? দেখ, চেয়ে দেখ আমাকে, আমার সোনার দেহকে—একদৃষ্টে, নির্নিমিষে যাও তার সঙ্গে, এক হয়ে যাও—সবই মিলবে তবে, সব সিদ্ধিই এসে যাবে—সবই পাওয়া যাবে—দেখ, তাকিয়ে দেখ আমাকে, ডুবে যাও আমার মধ্যে—শান্তিতে, আনন্দে, তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে।"

আজ আমাদের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে—

৪, ৩—১—৭৭

সাবিত্রী

শ্রীঅরবিন্দ

৩য় পর্ব—৩য় সর্গ

অন্তঃপুরুষের গৃহ—নবসৃষ্টি

(১)

যা কিছু সে করেছে সেসবের চেয়ে বৃহত্তর কর্তব্য তার রয়েছে এখনও।
তারই দিকে ফিরে দাঁড়াল সকল সত্তার উৎস যা,
নির্দেশ এক সেই গুপ্ত রহস্য হতে
জানে যে আমাদের চিন্তার পশ্চাতে অলক্ষ সত্তাকে,
ঘিরে রাখে জগৎকে সর্বদর্শী দৃষ্টি দিয়ে।
আপন অন্তরাত্মার দূরবগাহ স্তব্ধতার অন্তরে
তীব্র, একাগ্র, স্থির প্রস্তরমূর্তি যেন, নিঃসঙ্গ,
ধীর সে আসীন সাকার আশাসম
প্রার্থনার বেদী'পরে অচঞ্চল।
সেই সামর্থ্য খোঁজে সে যা পৃথিবীর উপরে এখনও দেখা দেয়নি,
সহায় এক এমন শক্তি হতে, মর্ত্য মানুষী সঙ্কল্পের আয়ত্তের অতীত,
জ্যোতি এক সত্যের, এখন তারে দেখা যায় শুধু দূর হতে,
স্বীকৃতি এক তার আপন সমুচ্চ সর্বশক্তিময় উৎস হতে।
কিন্তু সেই দুর্দর্শ শিখর হতে কোন কণ্ঠ আসত হানি
কালহীন নয়নপক্ষ্ম নিমীলিত; রন্ধ্রপথ নাই কোন।
নিশ্চেষ্ট নিঃসহায় শূন্যের ভার পীড়ন করে বৎসরের পর বৎসর।
আমাদের বদ্ধ মানুষী সত্তার অঙ্গে অঙ্গে
অনুভব করে সে বিপুল নূক অসম্বৃত বিরোধ
আমাদের চেতনাহীন দৃষ্টিহীন মূলাধারে,
অবাধ্য নির্বাক অস্বীকার প্রাণসত্তার গভীরে,
অজ্ঞানের "না" বিশ্বের উদ্ভবে।
নৈশ শক্তির সঙ্গে প্রচ্ছন্ন এক সহযোগ
আপন অন্তরে বর্তে রয় এখনও, আপনার দৃষ্টি হতে লুকায়ে:
তার পার্থিব সত্তার কোন অঙ্গ যেন ধরে রাখে এখনও
আপন উৎসস্থান নিশ্চেতনার সঙ্গে সাজাত্য।
বিলুপ্ত অতীতের সঙ্গে ছায়াময় ঐক্য এক
পুরাতন বিশ্ব-আধারের অন্তরে রক্ষিত গোপন রয়েছে সেখানে,
প্রচ্ছন্ন, ধরা দেয় না মানস আলোকে,
অবচেতন অস্ফুট আরাবে স্বপ্নের আবেশে

এখনও জানায় অসম্মতি মনের অন্তঃপুরুষের নির্বাচনে।
তার প্রতারক উপকরণ সব ছড়িয়ে যায় পিচ্ছিল দানাসব যেন
আশা তার আসন্ন সত্যের যেন পথে ঘটে পদস্খলন, অধঃপতন,
পুরাতন মানস আদর্শের কণ্ঠ সব করে বিচরণ শোকাকুল
ভিক্ষা করে স্বর্গের করুণা
আমাদের পৃথিবীর কমনীয় ত্রুটি যত
আর আমাদের মর্ত্যজীবনের মধুর যত দুর্বলতা তরে।
এবে সংকল্প হল তার অধিকার করা, নির্বাসিত করা
তার অন্তরের সেই উপাদান ভগবানকে প্রতারণা করে যে।
প্রকৃতির যত নিগূঢ় অবকাশ বিদীর্ণ মুক্ত করে ধরে সে,
যত তার ছায়াচ্ছন্ন গুহা আর কন্দর খোঁজে আগুনের মশাল ধরে
যেখানে পলাতক যত সংস্কার আর রূপহীন বিদ্রোহ যত
আশ্রয় গ্রহণ করে অন্ধকারের নিরাপদ গর্ভে
স্বর্গের পাবকশিখা শুভ্র বিশুদ্ধির বিরোধী হয়ে।
মনে হয় এবে সবই বিধ্বস্ত যা-কিছু ছিল অদিব্য :
তবুও অণুতন কিছু বিরোধীরা পালিয়ে বাঁচতে পারে,
হয়তো অন্ধশক্তির ক্ষুদ্র কেন্দ্র এক লুকিয়ে থাকতে পারে।
নিশ্চেতনা অবধি সীমাহীন ;
তার অতল গহ্বর সব যত আমরা তলিয়ে পরীক্ষা করি
তত সে বিস্তৃত হয়ে যায়, বিস্তৃতির শেষ হয় না আর।
তখন পাছে আকুল মানুষী কণ্ঠ সত্যকে বিকল করে ধরে,
তাই সে বাসনাকে উৎপাটিত ক'রে তার রক্তঝরা মূল হতে
দেবতাদের কাছে নিবেদন করে দিল সেই শূন্য স্থান।
এইভাবেই সে অপাপবিদ্ধ স্পর্শের সহনে সবর্থ হয়।
এল তবে এক অস্থির আর মহত্তর রূপান্তর।
অন্তরাত্মা তার সম্পূর্ণ সম্মুখে এল বিপুল সাগর যেন,
তরঙ্গে তার প্লাবিত করে দিল মন আর দেহ
সত্তা তার প্রসারিত, বিশ্বকে ধরে আলিঙ্গনে,
বাহির আর অন্তর একীভূত—
জীবন এখন বিশ্ব-সুসঙ্গতি,
অন্তর্যামী ভগবানের সাম্রাজ্য।
এই যে বিরাট বিশ্বভূতি তার মধ্যে
কেবল আপনার অন্তরাত্মার প্রকৃতি এবং মানসইন্দ্রিয় নয়,
সকল অন্তরাত্মা সকল মানস সঙ্গে নিয়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে,
অধিকন্তু স্থূলদেহের এবং স্নায়ুমণ্ডলীর প্রাণস্পন্দ পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়েছে
সকল জীবের দেহ এবং স্নায়ুর সঙ্গে একীভূত হয়েছে ;

অপরের আনন্দ সে নিজেরই আনন্দরূপে অনুভব করে,
অপরের দুঃখ সে আপনার দুঃখরূপে বহন করে।
বিশ্বগত সৌহার্দ্য তার উর্ধ্বে তুলে ধরে,
বিশাল মহাসাগরের মত, সৃষ্টির ভার
পৃথিবী যেমন তুলে ধরে বিশ্বজীবের আত্মবলি
অগোচর বিশ্বাতীতের আনন্দে এবং শান্তিতে শিহরিত।
বিভেদের অন্তহীন তালিকার সমাপ্তি :
বিশ্বচৈতন্যের প্রচ্ছন্ন অদ্বৈত সত্তায় এক সে,
সকল প্রকৃতি ফিরে আবার অনুভব করে অভিন্ন আনন্দ ;
আত্মায় আত্মায় আর নাই কোন বিচ্ছেদ,
জগতের আর ভগবানের মাঝে প্রাচীর নাই কোন।
রূপের স্মৃতির চেলরেখা সব মুছে গিয়েছে ;
আধবক বানস হয়েছে করতলগত, ছিন্ন দীর্ণ,
গলিত, এখন অস্তিত্ব নাই তার ;
অদ্বিতীয় চেতনা যে সৃষ্টি করেছে জগৎ দৃষ্টিগোচর এখন সে :
সবই এখন শক্তি আর ঔজ্জ্বল্য।
শেষ ক্ষীণ নিলীয়মান রেখাটি তার হারিয়ে
ক্ষুদ্র অহমের মণ্ডল নিশ্চিহ্ন এখন ;
পৃথক সত্তা আর বোধ হয় না কোন ;
অদৃশ্য হয়ে গেল সে, হারিয়ে গেল তার আত্মবোধ,
লুপ্ত সে আত্মচৈতন্যের বিশাল একত্বে।
প্রকৃতি তার হয়েছে বিশ্বভূত গতি,
আপন সন্ধানে রত দেখে সে সকলেই হল সেই পুরুষ,
তার আপন আত্মা সর্ব-সত্তার প্রতিভূ
আপনার হতে যুদে দাঁড়িয়েছে পুনরায় যুক্ত হতে সেই পরমের সঙ্গে।
অতিক্রম করা হল মানুষী সূত্র ;
মানুষী হৃদয়, ঢেকে রেখেছিল যে সেই অধৃষ্যকে,
এখন সে ধারণ করেছে দেবতার বিপুল স্পন্দন ;
তার জিজ্ঞাসু মন জ্ঞানময় মহাসত্যের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে ;
জীবনধারা তার হল বিশ্বপ্রাণের প্রবাহ।
দাঁড়াল সে পূর্ণসিদ্ধ জগতের উর্ধ্বতম সীমানাপরে
অপেক্ষা করে আরোহণ তরে জগতের, অতীতে,
অপেক্ষা করে অবতরণ জগৎ-পরিত্রাণ তরে।
মহান্ ঔজ্জ্বল্য এক, মহান প্রতীক এক পৃথিবী ঘিরে রয়,
প্রশান্ত জ্যোতিপুঞ্জসব করে দৃষ্টিপাত, পুণ্য প্রসার সব
চতুর্দিকে, জ্ঞানময় আনন্ত্য সব সমীপে আসে,

উজ্জ্বল দূরত্ব সব আনত হয় নিকট স্বজন যেন।
ইন্দ্রিয়ানুভব বিফল সেখানে সেই বিরাট বিভাসের মাঝে.
ক্ষণিকের কণ্ঠ সব ঠিকরে পড়ে তার শ্রবণ হতে,
চিন্তাবৃত্তি অক্ষম এখন ডুবে যায় ছড়িয়ে পড়ে বিবর্ণ হয়ে
শ্রান্ত দেবতা যেন রহস্যময় সাগরের তলে।
মর্ত্য চিন্তার পরিচ্ছদ সব খসে পড়ে
জ্ঞান মুক্ত বিবসন অব্যভিচারী দৃষ্টির কাছে
থেমে গেল নিয়তির চালনা আর প্রকৃতির অতন্দ্র যন্ত্রণাঘাত
সঙ্কল্পের বহুস্থলভ শ্বাসপ্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে যায়
সর্বশক্তিলয়ের অচঞ্চল শান্তির মাঝে।
প্রাণধারা প্রতি অঙ্গে তার পড়ে রয় যেন ভূলুণ্ঠিত বিপুল নির্বাক
নিরাবরণ নির্বাধ নির্ভয় সহ্য করে চলে সে
অমরত্বের দৃষ্টি সুবিশাল।
অন্তিম গতিস্পন্দ থেমে গেল, নিস্তব্ধ অকস্মাৎ সব।
অদৃশ্য লোকাতীতের ছিল যে হস্তচার
এঁকে দেয় তার সর্বাঙ্গে চিৎপুরুষের অপরিমেয় চিহ্ন আপন,
অসীম গ্রাস করে তাকে সীমাহীন সমাধিতিমির্ভে।

এ যেন পার তুলে বেয়ে চলা রহস্যময় তীর অভিমুখে
ভেদ করে মহাসাগর সব ভগবানের ফুৎকারের বলে,
নীচে চলে যায় অতল, চারিদিকে অজ্ঞাত,
অন্তরাত্মা তার বিসর্জন দিয়েছে আকাশ, অন্ধ তারকাকেন্দ্র।
এই পরিমিত জগতের সবকিছু হতে সুদূরে,
ডুবে যায় গুপ্ত মত সব সনাতনী হতে, সরিয়ে নেয় আপনাকে
মনের ফেনিল বাহ্য পরিসর হতে বৃহতের অভিমুখে
কণ্ঠহারা অন্তরে আমাদের সর্বজ্ঞানী সুপ্তির মাঝে।
বাক্যের চিন্তার অসম্পূর্ণ সামর্থ্যের উর্ধ্বে,
রূপের শেষ আশ্রয় দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে,
পরাচেতন জ্যোতির গভীরসব তলদেশে লুপ্ত হয়ে,
অথবা রিক্ত রূপহারা শূন্যতার মাঝে ভেসে চ'লে,
পথরেখাশূন্য অপরিমেয়ের গর্ভে নিঃসঙ্গ,
অথবা পার হয়ে অনাত্মা আত্মা, শূন্যাত্মা,
পার হয়ে সচেতন মনের স্বপ্নময় তটসব
পৌঁছিল সে অবশেষে তার চিরন্তন প্রতিষ্ঠায়।
দুঃখহীন শিখরপরে কোন আর্তকণ্ঠ উড়ে এসে বিঘ্ন ঘটায় না,
বিশুদ্ধ স্পর্শাতীত মর্ত্যলীলার উর্ধ্বে

প্রসারিত অধ্যাত্মপুরুষের নিস্তব্ধ নিশ্চল পরিবেশ।
সেখানে নাই আদি, নাই কোন অন্ত;
সেখানে রয়েছে সকল অস্তিত্বের স্থাবর শক্তি;
যুগযুগান্তরের শ্রমিক সেখানে বিশ্রাম নিয়েছে।
সেখানে শূন্যের মধ্যে কোন সৃষ্টি চলে না কলকৌশলে,
কোন মহাকায় যন্ত্রের নাই কোন সাক্ষীরূপী অন্তঃপুরুষ
নিয়তিচালিত কোন বিশাল কলকব্জার পুঞ্জ তোলে না ঘর্ঘর ধ্বনি।
সেখানে পাপও পুণ্যের সঙ্গে বদ্ধ পরিণয়ে একই হৃদয়তলে,
প্রেমের আলিঙ্গনে জেগে ওঠে দ্বন্দ্বের সংঘর্ষ;
জীবনের বিপদসঙ্কুল বেদনাময় পরীক্ষা চলে
তার অসংলগ্নতা আর যদৃচ্ছার ওজন দিয়ে,
দুঃসাহসী জুয়াড়ী মন ছুঁড়ে দেয় জীবন আমাদের
পণ যেন উদাসীন দেবতাদের দ্যূতক্রীড়ার,
চিন্তাবৃত্তির চঞ্চল আলোছায়া
খেলে যায় বাহ্য চেতনার উপর দিয়ে,
নির্বাক সাক্ষী পুরুষ স্বপ্নে তার
সৃষ্টি করে অর্ধদৃষ্ট জগতের ভ্রান্তি এক,
জ্ঞান সেখানে অন্বেষু অজ্ঞান;
জীবন পারম্পর্যহীন পদস্খলনের সারি,
অহেতুক রেখাবলী দিয়ে গড়া তার রূপ,
সত্যের ও মিথ্যার সমান পরিমাপ সেখানে,
এ সবই কিন্তু সেই অচল অব্যয় রাজ্যে
প্রবেশপথ পায় না, তাদের বর্তিবার নাই কোন হেতু, নাই কোন অধিকার
বিরাজে কেবল সেখানে চিৎপুরুষের নিশ্চল শক্তি
আকাঙ্ক্ষিত স্তব্ধ শাশ্বতের মধ্যে,
তার সর্বজ্ঞানময় সর্বশক্তিময় শান্তির মধ্যে।
চিন্তার সংঘর্ষ নাই চিন্তার সঙ্গে, সত্যের সঙ্গে সত্যের নাই সংঘর্ষ,
নাই কোন সংগ্রাম অধিকারের বিরোধী অধিকারের সঙ্গে;
জীবনধারার নাই পদস্খলন, নাই অর্ধদৃষ্টি
চলে যে আকস্মিক হতে অপ্রত্যাশিত আকস্মিকের মধ্যে,
হৃদয় বাধ্যতার বশে বেদনায় স্পন্দিত হয়ে ওঠে না
অসাড় নিশ্চেতনায় গঠিত দেহভাবের মধ্যে।
অভেদ্য অদৃশ্য অনির্বাণ বহ্নি বর্মে ঘিরে রেখেছে যেন
শাশ্বতের অধিদেবতাদের, ধর্ম তার রক্ষা করে চলে তারা
অটল চিরপ্রতিষ্ঠ তারা মহাসত্যের বিশাল পাদপীঠ পরে
আপন তার ঐশ্বর্যভূষিত সীমাহীন চিরন্তন ভবনে।

প্রকৃতিশক্তি সেখানে তার নির্বাক অধ্যায় শয়নে,
লোকাতীত নিত্য রূপে জাগে তার উৎসস্থান.
বহুবিধ জগৎরাজির গতিচাঞ্চল্যে
সাড়া দেয় সে আপনি অচঞ্চল চিরস্থির প্রশান্তির মধ্যে।
সর্বহেতু, সর্বধারক, উদাসীন,
সাক্ষী সে দেখে তার নিষ্পন্দ স্থিতি হতে,
বিপুল চক্ষু এক দৃষ্টি দিয়ে চলে সকল কৃতকর্মের পথে।
একান্তে, সৃষ্টিচাঞ্চল্যের উর্ধ্বে শান্তিমগ্ন,
নিমজ্জিত চিরন্তন শিখরাবলী মাঝে,
আপন তটহীন আত্মার ভবনে সুরক্ষিত সে,
সঙ্গী কেবল সর্বদর্শী অদ্বিতীয় সত্তা।
বিরাট মানস এখানে, চিন্তা বাঁধে না তারে,
প্রাণধারা সীমাহীন, লীলা তার ধরে না আকাশে,
অন্তঃপুরুষ সীমানাবিহীন, অ-কালকবলিত,
অনুভব করে সে অবসান জগতের সুদীর্ঘ বেদনার;
হয়েছে সে এখন মৃত্যুহীন অজাত আত্মাপুরুষ,
মুক্ত সে অসীমের যাত্রায়।
বিশ্ব-আরাবের পরে নেমে এল আদি নিস্তব্ধতা,
মুছে গেল যত স্পর্শ ঘটেছিল কালজাত বস্তুর সঙ্গে,
প্রকৃতির বিশাল সমবায় হয়ে ওঠে শূন্যভাণ্ড।
সকল বস্তু সংবৃত হল পুনরায় তাদের আদি রূপহীন বীজসত্তায়,
সৃষ্টি নীরব হল এক যুগধারার ক্ষণিকায়।
ফেলে সে এসেছে বেদনাক্লিষ্ট প্রকৃতিকে
এখনও আপন পদতলে তবু ধরে রেখেছে তার বিপুল অর্পিত ক্ষেত্র সব,
বিরাট কর্মাবলী তার সরে যায় দূরে, মুছে যায় ক্রমে
শূন্যাত্মা স্বপ্ন যেন এক অবশেষে তিরোহিত।
কণ্ঠ নেমে আসে না কোন সমুচ্চের সব নীরবতা হতে,
সাড়া দেয় না কেউ তার নির্জন নিঃসঙ্গতা হতে সব।
নির্বাণের স্তব্ধতা বিরাজে সেখানে,
অমর নিস্তব্ধতার প্রসার সেই দেবতাদের জন্মের পূর্বে;
বিশ্বভূত মহাশক্তি অপেক্ষায় রয়, নির্বাক,
প্রচ্ছন্ন পরাৎপরের অস্তিম অনুজ্ঞার তরে।

ঋষি বিশ্বামিত্রের অগ্নিমন্ত্র*

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৩য় মণ্ডল—২য় সূক্ত

১। বৈশ্বানরায় ধিষণান্‌তাবৃধে ঘৃতং ন পূতমগ্নয়ে জনামসি।
দ্বিতা হোতারং মনুষশ্চ বাঘতো ধিয়া রথং ন কুলিশঃ সমৃণ্বতি ॥১॥

বৈশ্বানরায়—বিশ্বপুরুষের জন্য
ধিষণাম্‌—ধী বা বুদ্ধিকে
ঋত-বৃধে—সত্যবর্ধকের জন্য
ঘৃতম্‌—তেজকে
ন—যেন
পূতম্‌—বিশুদ্ধ
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
জনামসি—জন্মদান করি, সৃষ্টি করি
দ্বিতা—দুইভাবে
হোতারম্‌—আহ্বায়ক বা আহ্বানকারীকে, আহ্বাতাকে (সায়ণ)
মনুষঃ—মানুষেরা
চ—আর
বাঘতঃ—ঋত্বিকেরা, মন্ত্রবিৎ বা, মন্ত্রকৃৎ সকলে, স্তোতৃবৃন্দ
ধিয়া—চিন্তাশক্তির সহায়ে
রথম্‌—রথকে ন—যেন, মত
কুলিশঃ—করাত
সম্‌—সম্যক্‌
ঋণ্বতি—তক্ষণ করে, খোদাই করে, কেটে তোলে

বিশ্বপুরুষ সত্যের বর্ধক অগ্নির জন্য আমরা বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ তেজরূপে জন্মদান করি, মানুষী স্তোতৃবৃন্দ তাদের ধীশক্তি দিয়ে দুইভাবে আহ্বাতা অগ্নিদেবকে করাত দিয়ে যেন রথের মত করে সুষ্ঠুভাবে খোদাই করে তুলেছে ॥১॥

২। স রোচয়জ্জনুষা রোদসী উভে স মাত্রোরভবৎ পুত্র ঈড্যঃ।
হব্যবাড়গ্নিরজরশ্চনোহিতো দূডভো বিশামতিথির্বিভাবসুঃ ॥২॥

সঃ—সে
রোচয়ৎ—উজ্জ্বল করে ধরেছে, আলোকিত করেছে

* বর্তিকার গত সংখ্যায় (আগস্ট, '৭৬) এই মণ্ডলের প্রথম সূক্তটি ভুলক্রমে "ঋষি অত্রির অগ্নিস্তব" বলে ছাপা হয়েছিল।—ব.স.

জনুষা—জন্ম হতে
রোদসী—লোককে
উভে—উভয়
সঃ—সে
মাত্রোঃ—পিতা-মাতার
অভবৎ—হয়েছে
পুত্রঃ—পুত্র
ঈড্যঃ—প্রেয়, কাম্য
হব্য-বাট্—হব্যবাহক, আহুতিগ্রাহক
অগ্নিঃ—অগ্নি
অজরঃ—অজর, জরাহীন
চনঃ-হিতঃ—আনন্দে নিহিত, আনন্দ-প্রতিষ্ঠ
দুঃ-দভঃ—দুর্দম, অদম্য
বিশাম্—সকল লোকের
অতিথিঃ—অতিথি
বিভা-বসুঃ—জ্যোতি-গন্ধ, জ্যোতি-সমৃদ্ধ

জন্ম হতেই উভয় লোক সে আলোকিত করেছে, মাতা-পিতার সে হয়েছে কাম্যপুত্র, অজর অগ্নি আহুতি বহন করে, পুলক-প্রতিষ্ঠ সে, দুর্দমনীয়, বিশ্বলোকের অতিথি জ্যোতি-সমৃদ্ধ ॥২॥

৩। ক্রত্বা দক্ষস্য তরুষো বিধর্মণি দেবাসো অগ্নিং জনয়ন্ত চিত্তিভিঃ।
রুক্মচানং ভানুনা জ্যোতিষা মহামত্যং ন বাজং সনিষ্যন্নুপ ব্রুবে ॥৩॥

ক্রত্বা—সঙ্কল্পের বলে
দক্ষস্য—সাক্ষাৎ বিচারের
তরুষঃ—ত্রাতা, তারক বা তারণকর্তা যে
বি-ধর্মণি—ধর্মের ধারা অনুসারে
দেবাসঃ—দেবতারা
অগ্নিম্—অগ্নিকে
জনয়ন্ত—জন্ম দিয়েছে
চিত্তিভিঃ—চেতনাবৃত্তি দিয়ে
রুক্মচানম্—প্রোজ্জ্বল হয়ে
ভানুনা—আলোক দিয়ে
জ্যোতিষা—জ্যোতির্ময়, দীপ্ত
মহাম্—মহান
অত্যম্—অশ্ব
ন—যেন

বাজম্—পূর্ণতাকে
সনিষ্যন্—জয় করবার জন্য
উপ ব্রুবে—আহ্বান করি

সত্য সঙ্কল্পের সহায়ে পার করে দেয় যে সত্য বিবেচনা তার সহায়ে দেবতারা তাদের চিৎ-বৃত্তিকে আশ্রয় করে ধর্মের ধারা ও ক্রম অনুসারে অগ্নির জন্ম দিয়েছে, আপন দীপ্ত প্রভায় উদ্ভাসিত এই মহান অশ্বকে পূর্ণতা কামনা করে আমি আহ্বান করি ॥৩॥

৪। আ যজ্ঞস্য সনিষ্যন্তো বরেণ্যং বৃণীমহে অহ্রয়ং বাজমৃষিবয়ম্।
রাতিং ভৃগূণামুশিজং কবিক্রতুমগ্নিং রাজন্তং দিব্যেন শোচিষা ॥৪॥

যজ্ঞস্য—আনন্দময়ের
সনিষ্যন্তঃ—বিজয়কামী সকলে
বরেণ্যম্—বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ
আ + বৃণীমহে—আমরা বরণ করি
অহ্রয়ম্—অচ্যুত, বিচ্যুতিহীন, অভ্রষ্ট, অক্ষয়
বাজম্—পূর্ণতা
ঋষিবয়ম্—দীপ্তবাঙ্ময়
রাতিম্—দান, উপহার
ভৃগূণাম্—ভৃগুদের (অগ্নিস্রষ্টাদের)
উশিজম্—অভিলাষীকে, আশ্পৃহানয়কে
কবিক্রতুম্—দিব্যদৃষ্টিময় সঙ্কল্প বা ইচ্ছাশক্তিকে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
রাজন্তম্—উদ্ভাসিত যে
দিব্যেন—দিব্য
শোচিষা—আলোকের দ্বারা

আমরা জয় করতে চাই সেই আনন্দময়ের জ্যোতির্ময় অক্ষয় পরম পূর্ণতাকে, তাই আমরা বরণ করি ভৃগু ঋষিদের এই দান, এই অগ্নিদেবকে যিনি চলেছেন তাঁর আশ্পৃহা নিয়ে, যাঁর ইচ্ছাশক্তি দৃষ্টিময়, দিব্যপ্রভায় উদ্ভাসিত যিনি ॥৪॥

৫। অগ্নিং সুম্নায় দধিরে পুরো জনা বাজশ্রবসমিহ সুক্রতুবিষঃ।
যস্যর্চিঃ সুক্রচং বিশ্বদেব্যং ক্রত্বং যজ্ঞানাং সাধদিষ্টিমপসাম্ ॥৫॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে
সুম্নায়—পরম সুখের জন্য
দধিরে—স্থাপন করেছে
পুরঃ—সম্মুখে
জনাঃ—লোকেরা
বাজ-শ্রবসম্—পূর্ণ অনুপ্রেরণা যিনি

ইহ—এখানে
বৃক্ত-বর্হিষঃ—কুশতৃণ আহরণ করেছে যারা, কুশাসন পেতেছে যারা
ঘৃত-সূচঃ—গৃহীত চমস ধরেছে যারা
সুরুচম্—শ্রীময় ও দীপ্তিময়
বিশ্বদেব্যঃ—বিশ্বভূত দেবতা
রুদ্রম্—রুদ্র
যজ্ঞানাম্—যজ্ঞসকলের
সাধৎ-ইষ্টিম্—লক্ষ্যসাধক
অপসাম্—কর্মীদের

কুশগুচ্ছ আহরণ করে, চমস প্রসারিত করে পুণ্য সুখের উদ্দেশ্যে লোকেরা অগ্নিকে এখানে তাদের সম্মুখে স্থাপন করেছে। অগ্নি হল পূর্ণ সত্যশ্রুতি, প্রোজ্জ্বল শ্রী তাঁর, বিশ্বদেবভূত রুদ্র তিনি, কর্মীদের যজ্ঞীয় লক্ষ্য সম্পাদন করেন তিনি ॥৫॥

৬। পাবকশোচে তব হি ক্ষয়ং পরি হোতর্যজ্ঞেষু বৃক্তবর্হিষো নরঃ।
অগ্নে দুব ইচ্ছমানাস আপ্যমুপাসতে দ্রবিণং ধেহি তেভ্যঃ ॥৬॥

পাবক-শোচে—শুদ্ধিকর হে জ্যোতি
তব – তোমার
হি—ফলতঃ, নিশ্চয়
ক্ষয়ম্—গৃহ, আবাস
পরি—চারিদিকে
হোতঃ—হে আহ্বাতা
যজ্ঞেষু—যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞকর্মে, যজ্ঞের মধ্যে
বৃক্ত-বর্হিষঃ—কুশ আহরণকারী
নরঃ—মানুষেরা
অগ্নে—হে অগ্নি
দুবঃ—কর্ম
ইচ্ছমানাসঃ—কাময়মান, ইচ্ছা করে, কামনা করে যারা
আপ্যম্—লাভযোগ্য, প্রাপ্তিযোগ্য, গ্রহণীয়
উপ-আসতে—উপবেশন করে
দ্রবিণম্—সম্পদকে
ধেহি—স্থাপন কর
তেভ্যঃ—তাদের জন্য

হে শুদ্ধিকর দীপ্তি, হে দিব্য আহ্বাতা, মানুষেরা যজ্ঞে যজ্ঞে কুশ আহরণ করেছে, তোমার আবাসকে ঘিরে আসন গ্রহণ করেছে, হে অগ্নি, তাদের আকাঙ্ক্ষা হল তাদের সম্পাদ্য কর্ম, তাদের জন্য তুমি সত্য সম্পদ প্রতিষ্ঠা কর ॥৬॥

৭। আ রোদসী অপৃণদা স্বর্মহজ্জাতং যদেনমপসো অধারয়ন্।
সো অধ্বরায় পরি ণীয়তে কবির্বত্যো ন বাজসাতয়ে চনোহিতঃ ॥৭॥

আ (+অপৃণৎ)—পরিপূর্ণ করেছে
রোদসী—দুইলোক, উভয় লোক—দ্যুলোক ও ভূলোক
অপৃণৎ (আ+)—পরিপূর্ণ করেছে
স্বঃ—স্বর্লোক, সূর্যলোক
মহৎ—মহান
জাতম্—জাত, জন্ম হলে
যৎ—যখন
এনম্—একে
অপসঃ—কর্মীরা (কর্মবন্ত—সায়ণ)
অধারয়ন্—ধারণ করেছে
সঃ—সে
অধ্বরায়—যজ্ঞযাত্রার জন্য
পরিণীয়তে—চারিদিকে চালিত করা হয়েছে
কবিঃ—দিব্যদ্রষ্টা
বত্যাঃ—অশ্ব
ন—যেন, মত
বাজ-সাতয়ে—পূর্ণতা জয়ের জন্য
চনঃ-হিতঃ—আনন্দ-প্রতিষ্ঠ

উভয় লোককে সে পূর্ণ করেছে, পূর্ণ করেছে মহান সূর্যলোক, জন্ম হলে যখন তাকে কর্মসাধকেরা ধারণ করে রয়েছে যজ্ঞযাত্রার জন্য, তাকে চারিদিকে পরিক্রমণ করান হয়েছে অশ্বের মত পূর্ণতা জয়ের জন্য, সত্যদ্রষ্টা সে, আনন্দ-প্রতিষ্ঠ সে ॥৭॥

৮। নমস্যত হব্যদাতিং স্বধ্বরং দুবস্যত দম্যং জাতবেদসম্।
রথীর্ঋতস্য বৃহতো বিচর্ষণির্বৃষ্টের্বানামভবৎ পুরোহিতঃ ॥৮॥

নমস্যত—প্রণত হও, প্রণাম কর (তাকে)
হব্য-দাতিম্—আহুতি দান করে যে
সু-অধ্বরম্—সুষ্ঠু যজ্ঞসাধক
দুবস্যত—কর্মে চালিত কর
দম্যম্—গৃহপতিকে, গৃহবাসীকে
জাত-বেদসম্—জন্মজ্ঞানীকে
রথীঃ—রথী সে
ঋতস্য—সত্যের
বৃহতঃ—বৃহৎ
বি-চর্ষণিঃ—সর্বদ্রষ্টা

অগ্নিঃ—অগ্নি
দেবানাম্—দেবতাদের
অভবৎ—হয়ে উঠল
পুরঃ-হিতঃ—সম্মুখে স্থাপিত, সম্মুখগামী

প্রণাম কর আহুতিদাতাকে, কর্মে চালিত কর সুষ্ঠু যজ্ঞসাধককে, গৃহাভ্যন্তরে যার নিবাস, সকল জন্ম যার জ্ঞানে, বৃহৎ সত্যের সর্বদর্শী রথচালক যে, এই অগ্নি হয়েছেন দেবতাদের পুরোধা ॥৮॥

৯। তিস্রো যহ্বস্য সমিধঃ পরিজ্মনোঽগ্নেরপুনন্নুশিজো অমৃত্যবঃ।
তাসামেকামদধুর্মর্ত্যো ভুজমু লোকমু ঈ উপ জামিমীয়তুঃ ॥৯॥

তিস্রঃ—ত্রিধা
যহ্বস্য—বলবন্তের
সমিধঃ—সমিধ
পরিজ্মনঃ—সর্বব্যাপক
অগ্নেঃ—অগ্নির
অপুনন্—পরিশুদ্ধ করেছে
উশিজঃ—আত্মাহুতিময়
অমৃত্যবঃ—অমৃতেরা, অমর সকলে
তাসাম্—তাদের মধ্যে
একাম্—একটিকে
অদধুঃ—স্থাপন করেছে
মর্ত্যো—মর্ত্যজীবের মধ্যে
ভুজম্—সম্ভোগকে
ঊঁ—ঐ
লোকম্—লোকে
ঊঁ—ঐ
দ্বে—দুই
জামিম্—সহচর, সহযোগী, সঙ্গী
উপ-ঈয়তুঃ—নিকটে গিয়েছে, সমীপে গিয়েছে

শক্তিমান সর্বব্যাপক অগ্নির ত্রিধা সমিধ অমর সত্তারা তাদের আত্মাহুতি নিয়ে পরিশোধন করেছে, তাদের একটিকে তারা মর্ত্য সত্তার মধ্যে ভোজ্যরূপে, ভোগের জন্য স্থাপন করেছে, আর দুটি উঠে গিয়েছে ঐ সঙ্গীলোকে ॥৯॥

১০। বিশাং কবিং বিশ্পতিং মানুষীরিষঃ সং সীমকৃণ্বন্স্বধিতিং ন তেজসে।
স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎস গর্ভমেষু ভুবনেষু দীধরৎ ॥১০॥

বিশাম্—লোকসমূহের

কবিন্—দ্রষ্টাকে
বিশ্পতিন্—লোকপতিকে
মানুষী:—মানুষী
ঈম:—প্রেরণাসব
সম্—সম্যক্
সীন্—সর্বত্র
অকৃণ্বন্ (সম্+)—সম্যক্ সৃষ্টি করেছে, গড়ে তুলেছে
স্ব-ধিতিন্—কুঠার
ন—যেন, মত
তেজসে—উজ্জ্বল ক্ষুরধারের জন্য
স:—সে
উৎ-বত:—উর্ধ্বস্থ
নি-বত:—নিম্নস্থ
যাতি—চলে যায়
বেবিষৎ—ব্যাপ্ত করে
স:—সে
গর্ভন্—শিশুকে
এষু—এই সব
ভুবনেষু—ভুবনের মধ্যে
দীধরৎ—ধারণ করে রয়েছে।

এই দ্রষ্টাকে, সকল জনরাজির অধিপতিকে মানুষী প্রেরণা সর্বত্র পূর্ণ করে গড়েছে একখানি শাণিত কুঠারের মত, উর্ধ্বে ও নিম্নে সকল স্থান সে অতিক্রম করে চলেছে, এই সব লোকে সে ধরে রেখেছে জাত শিশুকে ॥১০॥

১১। স জিন্বতে জঠরেষু প্রজজ্ঞিবান্বৃষা চিত্রেষু মানবন্ন সিংহ:।
বৈশ্বানর: পৃথুপাজা অমর্ত্যো বসু রত্না দয়মানো বি দাশুষে ॥১১॥

স:—সে
জিন্বতে—বর্ধিত হয়েছে
জঠরেষু—জঠরসকলে
প্রজজ্ঞিবান্—জন্মগ্রহণ করে
বৃষা—পুরুষবৃষ
চিত্রেষু—বিবিধ
মানবৎ—গর্জন করে
ন—যেন
সিংহ:—সিংহ
বৈশ্বানর:—বিশ্বশক্তি, বিশ্বদেব

পৃথু-পাজাঃ—বিপুল শক্তিমান
অমর্ত্যঃ—অমর
বসু—সম্পদ
রয়া—সুখভোগ
দয়মানঃ—প্রদান করে, দান করে
বি—ব্যাপকভাবে, উদারভাবে
দাশুষে—প্রদাতাকে (আহুতিপ্রদাতাকে)

বিবিধ জঠরে জন্মগ্রহণ করেছে সে, সিংহের মত বৃষরাজ গর্জন করে সে এগিয়ে চলেছে, বিশ্বদেব বিপুল শক্তিধারে এই অমর দাতাকে দান করে চলেছে সকল সম্পদ, সকল ভোগ ॥১১॥

১২। বৈশ্বানরঃ প্রত্নথা নাকমারুহদ্দিবস্পৃষ্ঠং ভন্দমানঃ সুমন্মভিঃ।
স পূর্ববজ্জনয়ন্নস্তবে ধনং সমানমজ্মং পর্যেতি জাগৃবিঃ ॥১২॥

বৈশ্বানরঃ—বিশ্বপুরুষ, বিশ্বদেব
প্রত্ন-থা—প্রাচীনকালের মত
নাকম্—স্বর্গে
আ+অরুহৎ—আরোহণ করেছে
দিবঃ—দ্যুলোকের
পৃষ্ঠম্—পৃষ্ঠ
ভন্দমানঃ—আনন্দপ্লুত হয়ে, সানন্দে
সুমন্মভিঃ—সম্যক্, সমুচ্চ চিন্তার সহায়ে
সঃ—সে
পূর্ববৎ—পূর্ববৎ, পূর্বের মত, চিরকালের মত
জনয়ন্—জন্মদান করেছে
অস্তবে—জীবেদের জন্য
ধনম্—সম্পদকে
সমানম্—একই, সমান অজ্মম্—পথ
পরি+এতি—অতিক্রম করে চলে
জাগৃবিঃ—সদাজাগ্রত হয়ে

বিশ্বদেব প্রাচীনকালের মত তার সমুচ্চ চিন্তার সহায়ে সানন্দে উঠে গিয়েছে স্বর্গলোকে, দ্যুলোকের পৃষ্ঠ অবধি, পূর্বের মতনই সে জীবের জন্য সম্পদ সৃষ্টি করেছে, সদাজাগ্রত সে সেই একই পথ অতিক্রম করে চলেছে ॥১২॥

১৩। ঋতাবানং বজ্রিয়ং বিপ্রমুক্থ্যা যং দধে মাতরিশ্বা দিবি ক্ষয়ম্।
তং চিত্রয়াম হরিকেশমীমহে সুদীতিমগ্নিং সুবিতায় নব্যসে ॥১৩॥

ঋত-বানম্—সত্যবান, সত্যময়

যজ্ঞিয়ম্—যজ্ঞরূপী
বিপ্রম্—জ্ঞানজ্যোতির্ময়
উক্থ্যম্—বাঙ্ময়
আ (+দধে)—স্থাপন করেছে
গম্—যাকে
দধে (আ+)—স্থাপন করেছে
মাতরিশ্বা—জীবন-মাতৃকা, জীবনীশক্তি
দিবি—স্বর্গে
ক্ষয়ম্—অধিবাসী (নিবসন্তম্—সায়ণ)
তম্—তাকে
চিত্রয়ামম্—বিচিত্র বা বিবিধগতি
হরি-কেশম্—পিঙ্গলশিখা (পিঙ্গলার্চি—সায়ণ)
ঈমহে—আকাঙ্ক্ষা করি
সু-দীতিম্—প্রদীপ্ত
অগ্নিম্—অগ্নিকে
সুবিতায়—সুগতির জন্য
নব্যসে—নূতন

সত্যময় যজ্ঞরূপী জ্ঞানোজ্জ্বল সত্যবাঙ্ময় স্বর্গনিবাসী এই যাকে জীবন-জননী স্থাপন করেছে, সেই বিচিত্রগতিময়, পিঙ্গলশিখাময় দীপ্ত অগ্নিকে আমরা কামনা করি অভিনব সুগতির জন্য ॥১৩॥

১৪। শুচিং ন যামন্নিষিরং স্বর্দৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থামুষর্বুধম্।
অগ্নিং মূর্ধানং দিবো অপ্রতিষ্কুতং তনীনহে নবমং বাজিনং বৃহৎ ॥১৪॥

শুচিম্—শুভ্র
ন—যেন
যামন্—গতিধারায়
ইষিরম্—প্রবেগময়
স্বঃ-দৃশম্—সূর্যলোকদর্শী
কেতুম্—সাক্ষাৎ জ্ঞান (প্রজ্ঞাপক—সায়ণ)
দিবঃ—দ্যুলোকের
রোচন-স্থাম্—জ্যোতির্লোকে প্রতিষ্ঠিত
উষঃ-বুধম্—উষার সঙ্গে প্রবুদ্ধ
অগ্নিম্—অগ্নিকে
মূর্ধানম্—মূর্ধা, শির
দিবঃ—দ্যুলোকের
অপ্রতি-স্কুতম্—অন্ধকারেও অপ্রতিহত

তম্—তাকে
ঈমহে—আমরা চাই
নমসা—প্রণতি দ্বারা
বাজিনম্—(যিনি) পূর্ণতা
বৃহৎ—(যিনি) বৃহৎ

একান্ত শুভ্র তিনি, প্রবেগময় তাঁর গতিধারা, সূর্যলোকে দৃষ্টি তাঁর, স্বর্গের সাক্ষাৎ জ্ঞান তাঁর, উজ্জ্বল লোকে তাঁর আসন, উষার সঙ্গে তাঁর জাগরণ, সেই অগ্নিকে, স্বর্গের বৃধ। যিনি, অন্ধকারেও অপ্রতিহত, তাঁকে আমরা আমাদের প্রণতি দিয়ে কামনা করি, যিনি পরিপূর্ণতা, যিনি বৃহৎ ॥১৪॥

১৫। মন্দ্রং হোতারং শুচিমক্ষয়াবিনং দমূনসমুক্থ্যং বিশ্বচর্ষণিম্।
রথং ন চিত্রং বপুষায় দর্শতং মনুহিতং সদমিন্নায় ঈমহে ॥১৫॥

মন্দ্রম্—আনন্দময়
হোতারম্—আহ্বাতাকে
শুচিম্—শুভ্র বা দীপ্ত
অক্ষয়াবিনম্—অদ্বৈত, দ্বৈতহীন
দমূনসম্—গৃহবাসী
উক্থ্যম্—সত্যবাক্ময়
বিশ্ব-চর্ষণিম্—সর্বদ্রষ্টা
রথম্—রথ
ন—যেন
চিত্রম্—নানা বর্ণময়
বপুষায়—বাহ্যরূপে, দেহধারণের জন্য
দর্শতম্—দৃষ্টিমান
মনুঃ-হিতম্—মানবী মানসে প্রতিষ্ঠিত
সদম্ + ইৎ—সর্বদাই
রায়ঃ—তাঁর সম্পদসব
ঈমহে—কামনা করি

আনন্দময় হোতা তিনি, অদ্বৈত তিনি, গৃহের অধিকারী, সত্যবাক্ময়, বিশ্বদৃষ্টিময়, দেহধারণ তাঁর বিবিধবর্ণ রথের মত, দৃষ্টিময় তিনি, মানুষী মনের মধ্যে স্থাপিত তাঁকে ও তাঁর সম্পদরাশি নিরন্তর আমরা কামনা করি ॥১৫॥

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৩০ জুন ১৯৫৪

(বৃষ্টির জন্য জিম্‌নাসিয়মে ক্লাস বসেছে।...Elements of Yoga, Chap. XIV. থেকে মা পড়লেন তাঁরই প্রশ্নোত্তর হতে)

"প্রশ্ন যোগের ক্ষেত্রে গুহ্যশক্তির স্থান কোথায়?

উত্তর তার অলৌকিক সূক্ষ্ম ক্রিয়া আনা যোগের একটা অংশবিশেষ।

প্রশ্ন গুহ্যশক্তির প্রেরণা লাভ ও প্রকাশের অর্থ কি?

উত্তর অবশ্য হিসাবে তার সাধারণ অর্থ বাইরে সেই শক্তির দৃশ্যমান ক্রিয়া কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে গুহ্য কথার অন্য অর্থ হবে।

প্রশ্ন সকল যোগীকেই কি গুহ্যশক্তির সাধনা করতে হয়?

উত্তর না। যার মধ্যে ঐ দিকে বিশেষ কিছু স্বাভাবিক পটুত্ব আছে সে করতে পারে, কিন্তু যার তা নেই, তাকে অপেক্ষা করতে হয় সেই পটুত্ব আসতে।"

মা এ বইটি এখানেই শেষ হয়েছে।

বাকে প্রশ্ন মধুময়ী মা, এখানে শ্রীঅরবিন্দ বলছেন যে স্বাভাবিক পটুত্ব যার নেই তাকে অপেক্ষা করতে হবে, কিন্তু চেষ্টা করতে থাকলে কি সেটা আসে না?

মা না। অর্থাৎ যার মধ্যে আপনা হতে তার কিছু বীজ লুকানো থাকে, কেবল সে চেষ্টা করলে তখন তার মধ্যে গুহ্যশক্তি প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু যার মধ্যে তেমন কিছু লক্ষণ নেই সে পঞ্চাশ বছর চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। গুহ্যশক্তি সকল লোকই পেতে পারে না। যেমন ইচ্ছা করলেও সকলেই গায়ক হতে পারে না, চিত্রকর হতে পারেনা...এ সব নির্ভর করে ব্যক্তিগত ধাত বা প্রকৃতির উপর।

প্রশ্ন: গুহ্যশক্তি ও অতীন্দ্রিয় শক্তির (mystic) কি পার্থক্য?

উত্তর এ দুটি এক বস্তু নয়।

অতীন্দ্রিয় শক্তি হলো তাই যাকে ভগবৎশক্তির মতোই জ্ঞান করো, এর সঙ্গে হৃদয়ের আবেগাদির কোনো সম্পর্ক থাকবে—অর্থাৎ যে অদৃশ্য শক্তিকে ভগবান স্বরূপ মনে করছ তার সঙ্গে তোমার অন্তরের উচ্চ ধরনের সুতীব্র সংযোগ থাকবে।

আর গুহ্যশক্তি, উনি এখানে যেমন বলেছেন, এক অলৌকিক অদৃশ্য অর্জিত শক্তি, যার আছে সে বাইরে কাজে লাগাতে পারে। এটি হলো এক রকমের বিদ্যা, এক ধরনের বিজ্ঞান। আমি এর তুলনা করি কেমিস্ট্রির সঙ্গে, কারণ তা জড়বিজ্ঞানেরই অনুরূপ ভাবে শিখতে হয়। কেবল বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির স্পন্দন ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে তার কারবার, সেগুলিকে একজোট ক'রে তার দ্বারা কিছু ক্রিয়া হয়। একে বিজ্ঞানেরই মতো নিরপেক্ষ

ভাবে শিখতে হয়, অর্থাৎ তার মধ্যে কোনো আবেগাদি বা অস্পষ্টতার কিছু নেই। যেমন কেমিস্ট্রিতে তার পদ্ধতিগুলো জেনে কাজ করতে হয় সেইরকমভাবে এতেও চলতে হয়। শিক্ষা দেবার কেউ না থাকলে নিজে নিজে চেষ্টা করতে গেলে বিপদ ঘটতে পারে, কেমিস্ট্রির মতোই বিপরীত শক্তিসম্মেলনে বিস্ফোরণ হতে পারে।

প্রশ্ন : এই জীবনের মধ্যে কি গুহ্যবিদ্যার কিছু প্রয়োজন আছে?

উত্তর : এই জীবনের মধ্যে? তা সেটা নির্ভর করবে তুমি তোমার জীবনে কি করতে চাও তারই উপরে। যোগের জীবনের কথা বলছ? এতে তার কোনো দরকার নেই। তা ছাড়া, এখানে উনি যেমন বলেছেন,—সকলের তো ওর মতো পটুত্ব থাকেনা। অনেকে আছে যাদের মধ্যে ঐ জিনিসের সামান্যমাত্র অভিজ্ঞতা এলেই, যেমন দেহ ছেড়ে বেরিয়ে পড়া শুরু হয়েছে,—অমনি দারুণ ভয় পেয়ে সম্বিৎ হারায়, তাদের সারিয়ে তোলা কঠিন হয়। কেবল সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও আত্মশাসনের জোরেই তা সারতে পারে। অনেকে আপন সত্তাকে পৃথক করে নিতে পারে না, তা করতে গেলেই দেহের কল বিগড়ে যায়। আবার কেউ কেউ অনায়াসে দেহ থেকে বেরিয়ে চারদিক ঘুরেফিরে দেহের মধ্যে ফিরে আসতে পারে। এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিকের মতো। যার এ বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ আছে—কেবল মানসিক কৌতূহল নয়—তার মধ্যে পটুত্বও থাকে। তারা নিজেরা হয়তো সেটা জানে না, কিন্তু শেখানো যেতে পারে কেবল তাদেরকেই। কিন্তু এ সব কাজ চারিদিকে আঁটঘাট বেঁধে সতর্কে করতে হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি—কেউ হয়তো মনের দিক দিয়ে সামান্যমাত্র পৃথক হয়ে বেরিয়ে পড়েছে, অর্থাৎ তার চিন্তক ও বিচারক মনের অংশটা বেরিয়ে চলে গেছে আর মনের স্বয়ংক্রিয় অংশটা ঐ শাসক অংশের পাহারাশূন্য থেকে কাজ করছে,—তখন হয় কি, আবহাওয়াতে যে সব সূক্ষ্ম ছোটো ছোটো অসংখ্য প্রাণশক্তিরা ঘুরে বেড়াচ্ছে —মানুষেরই ধ্বংসাবশেষ মাত্র—তারা যদিও মারাত্মক নয়, কিন্তু নানারকম দুষ্টুমি করে অনেক বিপর্যয় ঘটায়। এরা রোগবীজাণুর মতো ছোটো ছোটো বীজাণু (প্রাণসত্তার) ও অপেক্ষাকৃত দৃশ্যমান। এরা যেমনি দেখে যে এই মানুষটি অসহায় অবস্থায় আছে, অমনি কিছু মজা দেখবার জন্যে মনের সেই স্বয়ংক্রিয় অংশে ঢুকে তার নানা দুর্ভোগ ঘটাতে থাকে। যেমন, কেউ হয়তো নিজের জিভটা গিলে ফেললে এবং দম আটকে গেল, কেউ বা জিভ কামড়ে রক্তপাত ঘটায়—নিয়ন্ত্রণের সমুচিত ক্রিয়ার অভাবে সতর্ক হওয়া যায়না। তখন ঐ সব শক্তিরা স্নায়ুকেন্দ্রে ক্রিয়া ক'রে আরো অনেক বিপর্যয় বিপদ আনে। সুতরাং সেই সময়ে পাহারা দিয়ে সতর্ক করবার মতো কোনো সহায়ক কাছে থাকা চাই, যে চেতনভাবে ঐ সব শক্তির ক্রিয়াকে প্রতিরোধ করতে পারবে। তেমন সহায়ক ছাড়া ঐরূপ চেতনাশূন্য অবস্থাতে যাওয়া অনুচিত। এই হলো সাধারণ নিয়ম। কারণ তদ্ভিন্ন ওর চেয়েও বেশিরকম অনিষ্ট ঘটতে পারে, যদি দেহত্যাগী অংশের সঙ্গে দেহস্থ অংশের কিছু দীপ্তিময় সংযোগসূত্র না থাকে, তাহলে বিপদ ঘটতেই পারে। সংযোগসূত্র বজায় থাকলে মারাত্মক কিছু হতে পারেনা। সংযোগসূত্র দুর্বল হলে অনিষ্টকারী বিরোধীশক্তি তাকে ছিন্ন ক'রে দিয়ে বিপর্যয় আনে, তখন আর দেহেতে ফিরে যাওয়া সাধ্য হয় না।

প্রশ্ন তাতে কি মৃত্যুও হতে পারে?

উত্তর হাঁ, কিছু পরে। তাই বলছি এ সব জিনিস নিয়ে খেলা করা বা কৌতূহল নিবৃত্তি করতে যাওয়া বিপজ্জনক। এটা তামাশার ব্যাপার নয়। স্থির মন নিয়ে ঠিক ঠিক নিয়ম অনুসারে অগ্রসর হওয়া চাই। আর একটি নিতান্ত জরুরী কথা—যদি তোমার মধ্যে ভয়ের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্র থাকে তাহলে এই গুহ্যবিজ্ঞানকে স্পর্শ মাত্র করবে না। এমন কি ঘুমের মধ্যে বিভীষিকার স্বপ্ন দেখে যদি ভয় পাও তাহলে এ কাজে হাত দিও না। তবে নিদারুণ ভয়ের ব্যাপারেও যদি ভয় না ক'রে শান্ত চিত্তে হাসতে পারো, যদি সকল রকম দুর্দৈব ও বিপত্তিজনক অবস্থাতেও বিচলিত না হয়ে সেগুলিকে শাবলে নিয়ে চলতে পারো, তাহলে জানবে যে এ বিদ্যা অর্জনের শক্তি তোমার আছে।

কেউ কেউ এমনই বীর্যবান ও সাহসী ব্যক্তি আছে যে স্বপ্নের মধ্যেও শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্বপ্নের মধ্যে লড়াই ক'রে শত্রুকে পরাস্ত করে। এমন লোকই এ বিদ্যা শেখার পাত্র হবার উপযুক্ত। কিন্তু যারা একটুতেই আতংকিত হয়ে ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতো দেহের আশ্রয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারা এদিকে যেন না ঘেঁষে।

এতে আরো একটি জিনিস থাকা চাই, অসীম ধৈর্য। কেমিস্ট্রি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন নতুন কিছু বের করতে হলে রাসায়নিক উপাদানগুলি নিয়ে বহু ধৈর্যের সঙ্গে পরীক্ষা চালিয়ে যেতে হয় যতক্ষণ ফল পাওয়া না যায়, তেমনি ঐ গুহ্যবিদ্যার বেলাতেও বছরের পর বছর চেষ্টাতেও কিছু ফল না মিলতে পারে, তখন তা এক ধেয়ে বোধ হতে থাকে। তোমার মনের স্থূল হিসেবী অংশ তখন বলে, "কেন মিথ্যে ওতে লেগে আছো, দেখতেই পাচ্ছ যে ওর মধ্যে কিছু নেই, ও সব শুধু গল্পকথা, মিথ্যা যত কল্পনা, অনর্থক ঐ নিয়ে সময় নষ্ট করছ।" তখন নির্ভরযোগ্য কিছু না পেলে বিশ্বাসকে অটুট রাখা কঠিন হয়।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, সাধারণ চেতনার পক্ষে ধর্মের প্রচলিত নির্দেশগুলি পালন করা কি খুব দরকার?

উত্তর ধর্মের নির্দেশ? কি জানি। কাকে বলো নির্দেশ?

প্রশ্ন যেমন জপ করা ইত্যাদি।

উত্তর ও, ঐ সব কাজ? তা ওতে যদি সাহায্য কিছু হয় তাহলে ভালোই। তা না হলে...এ সব জিনিস নির্ভর করে ব্যক্তিগত অবস্থা বিশেষের উপরে। আপেক্ষিক ব্যাপার। যেখানে তোমার এতে যত বেশি কাজ হচ্ছে আর যেখানে তোমার যতটা বিশ্বাস আছে সেই অনুপাতে ততখানি এর মূল্য। যদি এতে তোমার একাগ্রতা আনতে সাহায্য করে তাহলে তোমার পক্ষে তা ভালোই জিনিস। নতুবা সাধারণের চেতনাতে এই সব করা হয় অন্ধসংস্কার থেকে, এইরূপ ধারণাতে যে, "আমি যদি এই নিয়ম পালন করি, যদি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে মন্দিরে বা গির্জাতে যাই, তাহলে আমার কিছু সুরাহা বা লাভ হবে।" এমন ধরনের সংস্কার জগৎব্যাপী, কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এর কিছু মূল্য নেই।

প্রশ্ন: আমরা বছরের নির্দিষ্ট দিনে যে লক্ষ্মীর পূজা করি, আর মহাকালীর পূজা করি, তার কারণ কি?

উত্তর ওগুলি করতে তোমাদের আনন্দ হয় গো ছেলে। (হাসি)

প্রশ্ন কিন্তু ঐ সব বিশেষ দিনে আপনিও সকলকে বিশেষ আশীর্বাদ দেন।
উত্তর হাঁ, তোমরাও তো তাতে খুশিই হও? (হাসি)

প্রশ্ন : কেবল আমাদের খুশির জন্যেই কি দেন?
উত্তর তা কেন, পেয়ে আনন্দ হয় তো? খুশি হও বলা অশ্রদ্ধার কথা, বলা উচিত আনন্দ লাভ করো।

প্রশ্ন যেমন সেই মহাকালী পূজার দিনে?
উত্তর হাঁ হাঁ, আর কখনো বা তিনি আসেন তিন দিন আগে অথবা চারদিন পরে, অথবা বছরের অন্য কোনো সময়ে। কেবল বিশেষ দিনটিতেই যে আসবেন তার মানে নেই। তোমাদের আনন্দ দিতে আমি কখনো বা এমনিই তাঁকে ডাকি (হাসি)...তবে আমি যে ঐ সব পূজার অনুষ্ঠানগুলো বিশ্বাস করি তা ঠিক নয়।

সকল ধর্মেই মন্দির প্রভৃতি আস্তানা আছে যার সম্বন্ধে খুব জাঁক ক'রে বলা হয় যে এটিই সব চেয়ে উচ্চ ও মহৎ ধর্মস্থান,—ফ্রান্সে বা জাপানে বা অন্য দেশেও—একই দেবতার না হলেও তা একই রকম জিনিস—আমি দেখেছি যে সর্বত্র প্রায় একই রকমের কারখানা, সামান্য কিছু ইতর বিশেষ মাত্রই আছে—আর দেখলাম যে কোথায় কতটা ভগবৎ শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা একান্তই নির্ভর করেছে স্থানীয় ভক্তদের ভক্তিশ্রদ্ধার পরিমাণ কতখানি তারই উপরে। তথাপি তারা যতখানি বাড়িয়ে শক্তির কথা বলে আর বাস্তবিক যতখানি সেখানে আছে, এর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। যেমন ফ্রান্সের এক সুন্দর কারুকার্যখচিত বিরাট এক ক্যাথিড্রালে ঢুকে দেখি যে সেখানকার কেন্দ্রস্থলে সব চেয়ে পবিত্র বেদীর ঠিক মাথার উপরে জাল পেতে রয়েছে এক মস্ত কালো মাকড়সা ছাতাটি জুড়ে, আর সেখানে গিয়ে লোকে যখন যেমন শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করছে সমস্তই ঐ মাকড়সা শুষে নিয়ে আত্মসাৎ ক'রে পুষ্ট হচ্ছে। এমন দৃশ্য সুখদায়ক নয়। কিন্তু সেখানে বসে যারা প্রার্থনা করছে তারা মনে মনে ভগবৎ প্রসাদ অনুভব করছে—যদিও আসল ব্যাপারটি ঐ রকম—কিন্তু তাদের নিজেদের শ্রদ্ধাভক্তির গুণে তাদের পক্ষে ভালো কাজই হচ্ছে। আমি যদি তখন তাদের কাছে গিয়ে বলি, "তোমরা ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করছ কিন্তু তার সমস্ত শক্তিটা ঐ প্রাণসত্তাযুক্ত মাকড়সা শুষে খেয়ে নিচ্ছে," তাহলে সেটা উচিত হতো না। অথচ এমনি ব্যাপার আছে প্রায় সর্বত্র, প্রাণস্তরের সত্তারা সর্বক্ষণই প্রার্থনাকারীদের অন্তরের আবেগ ও শ্রদ্ধাভক্তির স্পন্দনগুলি আত্মসাৎ করতে থাকে। অবশ্য খুব কম, অতি অল্পসংখ্যক লোকই যায় খাঁটি ধর্মের মনোভাব নিয়ে —ভগবানের কাছে কিছু আদায় করতে নয়, কিন্তু আন্তরিক আস্পৃহা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে নিজেদের সমর্পণ করবার জন্য প্রার্থনা জানাতে। এমন মানুষ হয়তো লাখের মধ্যে একজন হয়, আর এরা হয়তো ঐ সব বাধা অতিক্রম ক'রে কিছু ভগবৎ করুণার স্পর্শ লাভও করে। কিন্তু বাকি প্রায় সকলেই যায় নিজের জন্যে লাভের মন নিয়ে, আত্মস্বার্থে। তাই সেখানে তেমনি আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, আর সেখানে গেলে তুমি তার একটা ঘ্রাণ পেতে থাকো আর মনে মনে ভাবো "বাঃ, কি সুন্দর নীরব শান্ত ধ্যানের উপযুক্ত স্থান।"

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, কিন্তু আসল জিনিসটা এই রকমই। আমি প্রত্যেক

জায়গাতেই বিশেষভাবে সন্ধান নিয়ে তাই দেখেছি। কিন্তু এমনও দেখেছি, হয়তো কোনো নগণ্য গ্রামে জনশূন্য পরিস্থিতির মধ্যে সামান্য একটি ক্ষুদ্র গির্জা রয়েছে, শান্ত, নিভৃত, নিঃশব্দে রয়েছে একটা আশ্চর্য আবাহন, ধ্যানের উপযুক্ত পরিবেশ। অবশ্য এমন স্থান খুবই বিরল। আমি ইটালির চমৎকার সব বিখ্যাত বা বৃহৎ গির্জাগুলিতে গিয়ে জেনেছি, সবগুই প্রাণস্তরের নানারকম সত্তাতে পরিপূর্ণ ও ভয়ংকর। মনে আছে, আমি ভেনিসের এক মন্দিরগাত্রের ছবি আঁকছিলাম, সেই সময়ে একটি দুঃখিনী রমণী তার কনফেশন জানাচ্ছিল পাদ্রীর কাছে। সে কেমন পাদ্রী তা জানা যায় না কারণ সে থাকে বাক্সের আড়ালে —তা বুঝি জানোনা? সে শোনে একটা ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে। অদৃশ্য অন্ধ শক্তিতে সেগুলি শুষে নিচ্ছে আর মেয়েটি আতংকে সংকোচে কুঁকড়ে গিয়ে তার কথা বলছে। সে দৃশ্য দেখলে কষ্ট হয়। অথচ এরা ভাবে যে খুবই পুণ্যকাজ করা হচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই হয় যে প্রাণরাজ্যের বিরোধীসত্তারা এই সব জিনিসকে জাল পেতে ধরে নেয় এবং উদরস্থ করে। সেই অদৃশ্য জগতের সত্তারা ব্যতীত অন্য কোনো সত্তা তা পারে না এবং তা চায় না। কেবল এরাই ওতে খুশিতে ফুলে ওঠে, যত বেশি লোকের ভিড় ততই ওদের আনন্দ।

কিন্তু যারা খাঁটি ও দিব্য সত্তা, তারা এমন বাহ্যিক পদ্ধতি গ্রহণ করে না, এতে তাদের সন্তোষ মেলেনা। লোকদেখানো পূজায় তাদের আনন্দ নেই কারণ গর্বভাব একেবারেই তাদের নেই। গর্বের ভাবটি যাদের মধ্যে আছে তারাই চায় যে লোকে তাদের বড়ো বলুক, খোসামোদ করুক। কিন্তু গর্ব যাদের নেই তারা সে সব চায় না। বরং যাকে তারা দেখে নিঃস্বার্থ ও মঙ্গলকামী, যার মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণা ও আনন্দবোধ আছে তাকে ঐ সব পূজা-অর্চনাকারীদের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়।

আমি জোরের সঙ্গেই তোমাদের বলবো যে কোনো দেবতাকে যদি তুমি সামনে বসিয়ে রেখে পূজা করতে থাকো, তাহলে সেই দেবতা হয়তো কিছুক্ষণ পর্যন্ত মুচকে হেসে তোমার ক্রিয়াকলাপ দেখবে কিন্তু খুব খুশি হবে না। নিশ্চয়ই না, তোমার সে কাজে দেবতা মুগ্ধ হবে না। অমন ভুল ধারণা যেন কোরোনা। আধ্যাত্মিক জগৎ ও বাস্তবের জগতের মধ্যে রয়েছে এক বিস্তৃত রাজ্য, যেখানে আধিপত্য করে প্রাণস্তরের সত্তারা, তারাই চায় ঐ সব জিনিস এবং তাতেই তাদের পুষ্টি ও তুষ্টি। যে যত বেশি পূজা পায় তার তত বেশি দাম বেড়ে যায় আর সে তাতে গর্বে বেশ স্ফীত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওতে সত্যিকার দেবতা খুশি হবে এ কথা কেমন ক'রে ভাবতে পারো...আমি বলছি আসল দেবতাদের কথা, এমন কি অধিমানসের স্তরের দেবতাও...যদিও এদের মধ্যে মানুষের মতো কিছু কিছু দুর্বলতা আছে। তবু উচ্চতর চেতনা নিয়ে তারা ওতে খুশি হয়না। তাদের কাছে ঐ সব অনুষ্ঠানের চেয়ে যার মধ্যে শুভবুদ্ধি, নিঃস্বার্থতা, সূক্ষ্মবোধ, আন্তরিক আশ্পৃহা দেখে—তার অনেক বেশি মূল্য। এ দুইএর মধ্যে বিস্তর তফাৎ। এমন কি যে সব ভীষণা ভয়ংকরী প্রতিমাকে কালী বলা হয় এবং গৃহদেবতা রূপে কোথাও কোথাও স্থাপনা করা হয়—এরা আসলে প্রাণস্তরের আর এরা প্রচুর প্রাণস্তরের শক্তিকে ধারণ করে। আমি এমন লোকদের জানি যারা এই কালীর ভয়ে নিত্য সশঙ্কিত হয়ে থাকতো, পূজার কিছুমাত্র ত্রুটি হলেই আরো বেশি আতংকিত হয়ে উঠতো। দৈবাৎ কোনো দুর্ভাগ্য উপস্থিত হলে তখন শুধু ভাবতো যে কালী

এই শাস্তি দিয়েছেন কোনো দোষের কারণে। এই রকমের দুশ্চিন্তা করা অতি মারাত্মক। আমি এই সব প্রাণস্তরের সত্তাদের সম্বন্ধে বিলক্ষণ জানি। মানুষেই এদের দেবতারূপে আহ্বান করে আর মানুষেই এই সব ভয়ংকরকে পূজা করে। তারা ভাবে যে সঠিক দেবতা বেচারাই সে পূজা পাচ্ছে।...এর চেয়ে বরং ভালো যদি এখনকার মানুষরা সংস্কারমুক্ত হয়ে এই সব ধর্মানুষ্ঠানের আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। নতুবা এই সব অদিব্য শক্তিরা ওরই সুযোগ নিয়ে তাদের অভিলাষ পূরণ করতে থাকবে। ওর চেয়ে এখন মানুষের বরং নেতিবাদ গ্রহণ করা দরকার। ওর থেকে মুক্ত হলে মানুষ আধ্যাত্মিক উচ্চতায় উঠে পূর্ণ সত্যশক্তির মূলগত কাজে যোগদান করতে ও অগ্রসর হতে পারবে। এই সব জিনিসকে পিছনে ফেলে তবেই উপরে ওঠা যায়।

প্রশ্ন মা, আপনি যে একদিন বললেন, রাত্রিকালে আপনি সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, তাহলে এই আশ্রমে কোথায় কি হচ্ছে তা কি সবই আপনি জানতে পারেন?

উত্তর: তার মানে আমি পুলিসম্যানের কাজ করি।

প্রশ্ন তাহলে মা, এই স্থূল দেহে আপনি যেমন এখন জানছেন আর ঐরূপ ভাবে তখন যেমন জানেন, তার মধ্যে তফাৎ...

উত্তর তুমি কি ভাবো যে আমি অক্লেশে সর্বত্র যেতে ও সমস্ত দেখতে পারি? আমার তো এই একটিমাত্র মাথা, দুটি হাত আর দুটি পা, এই নিয়ে তা করতে গেলে বিস্তর সময় লেগে যাবে আর ঐ কাজ নিয়েই সর্বক্ষণ ছুটোছুটি করতে হবে।

প্রশ্ন তা নয়, আমি জানতে চাইছিলাম এই কথা যে আশ্রমে কোথায় কি কাজ হচ্ছে সব যদি আপনি জানেনই, তখন আবার এর নানা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিত্য খবর দিতে আসার দরকার হয় কেন?

উত্তর: না না, খবর দিতে নয়, আসে নির্দেশ নিতে। সেটা এক কথা হলো না। রাত্রে গিয়ে যদি নির্দেশ দিই তা হয়তো শুনবেই না, কিংবা শুনলেও নিজের মতলবে উল্টোপাল্টা কাজ করে বসবে। না, না, তা হয় না। আর খবর দিতে আসা? তারা সেটা বলতে পেলে খুশিই হয়, সুতরাং জানলেও তাদের বলতে দিই। যদি তখন বলি, "জানি জানি ও সব কথা।" কখনো কখনো কাজের তাড়া থাকলে ঐরকম বলতে বাধ্য হই। তখন তারা ভাবে, "উনি আমার কাছে না শুনে কেমন ক'রে জানবেন?" ভাবে যে সঠিক খবরটা কেবল তারাই বলতে পারে। আমাকে বুঝিয়ে না বললে আমি ঠিক জিনিসটা বুঝবোই না। তাই আমি তাদের বলতে বাধা দিইনা। কেবল যখন তাতে অনেকটা সময় লাগে আর আমার তা শোনবার সময় নেই তখন বলি, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও সব আমি জানি, এখন বলো তুমি কি জানতে চাও।" এতে তারা ক্ষুণ্ণ হয়।

প্রশ্ন: কিন্তু মা, তারা যদি অন্যায় কিছু...

উত্তর: অন্যায় কাজ?

প্রশ্ন: হাঁ।

উত্তর কিংবা ভালো কাজও তো হতে পারে?

প্রশ্ন তা নয়, মন্দ কিছু ক'রে যদি ভাবে "মা তো সব জানছেন", তাহলে তথাপি তাদের সে কথা কি নিজে এসে প্রকাশ করে বলা ঠিক নয়?

উত্তর হাঁ। কারণ সে ক্ষেত্রে...যদি সে এমন কিছু মন্দ কাজ ক'রে থাকে যা করা উচিত নয় বলে সে জানে, আর ভাবে "মা তো সব জানেনই, তখন আর আমি আবার বলতে যাই কেন. এই ভেবে তখন সে নীরবে গুম্ হয়ে থাকে। অর্থাৎ অন্তরের দরজা বন্ধ ক'রে সে বুকের মধ্যে বা অন্য কোথাও কথাটা লুকিয়ে চেপে রাখে। তার বদলে সে যদি ওতে অসুখী হয়ে মনের মধ্যে ছটফট করতে থাকে, তখন অস্থির হয়ে ভাবে—মাকে এটা খুলে বলে ফেলা যাক। কিন্তু বলতে চাইলে অনেক বেগ পেতে হয়। গলার মধ্যে পুঁটলি পাকাতে থাকে, জিভ শুকিয়ে ওঠে, বলবার মতো কথা খুঁজে পায়না, তাই না? কিন্তু একবার সংকল্প যখন করেছ তখন চেষ্টা ক'রে বলেই ফেল একে একে সমস্ত ব্যাপারটা, কোন কিছু বাদ না দিয়ে, ভিতর থেকে সব কিছু টেনে বের ক'রে। এতে ফল হয় এই যে তোমার ভিতরকার দরজা উন্মুক্ত হয়ে খুলে যাবে আর আমি তার ভিতর দিয়ে তোমার চৈত্যসত্তায় ঢুকে যাবো। আর তার মধ্যে আমি ঢেলে দেবো আলো, শক্তি, চেতনা ও দৃঢ়সংকল্প, যাতে অমন কাজ আর কখনো করা সম্ভব না হয়।...বেশি মাত্রাতে ঢালা হলে পাত্র থেকে খানিকটা উপ্‌চে পড়ে যাবে কিন্তু তবু থাকে যেটুকু তাতেই কাজ হয়। আবার যদি সে চেষ্টা আসে তখন দেখবে যে সব কিছুই তো বলা শেষ, কিছুই বাকি নেই, সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেছে, এখন আর তা হবে না, তোমার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে যাবে।

প্রশ্ন বহুবারই মা, ক্লাসে এসে আমরা আপনাকে কত রকমের প্রশ্ন করতে থাকি, তার মধ্যে কতকগুলি অনায়াসে প্রতি সহজে আপনা হতেই বেরিয়ে আসে, আর কতকগুলির বেলা অনেক ইতস্তত করতে হয়...

উত্তর শোনো, তোমাদের বেশির ভাগ প্রশ্নই ঠিকভাবে হয় না, কারণ নিজেরাই স্পষ্ট করে জানোনা যে কোন জিনিস জানতে চাইছ। স্পষ্ট ধারণার অভাবে মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি কথা তাল পাকিয়ে ওঠে, কিন্তু চেতনার মধ্যে এমন কোনো ভাব নেই যা পরিষ্কার হতে চায়। মস্তিষ্কের মধ্যে এমন কতকগুলো কথা জোট পাকায় যার কোনো মানে হয় না। তাই তোমরা প্রশ্নটা ভালো ভাবে প্রকাশ করতে পারোনা, কারণ নিজেরাই তাই নিয়ে কিছু ভেবে দেখনি। সুতরাং সে প্রশ্ন চিন্তার ভেতর থেকে নয়, মাথারই ভিতর থেকে আপনা হতে বের হয়ে আসে, তাই না? কিন্তু যদি এমন কিছু অনুভূতি এসে থাকে যাকে সজ্ঞানে সচেতনে বলা যায় আর মাথার মধ্যে কথাগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে, তাহলে তোমার মস্তিষ্কও তার জবাব গ্রহণের জন্যে ঠিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে—তার বদলে কেবল কতকগুলো কথা যা তিন চারটে বাক্য মনে এসে গেল আর সেগুলো তেমনি বলে ফেললে—তাই হয় না কি? তবে তারও আমি জবাব দিয়ে থাকি, কারণ এটা জানি যে কেউ না কেউ...থাকেই এমন কেউ যার মস্তিষ্কে তা ঢোকে, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বললেও ঢোকেনা। তাই তোমাদের উচিত যা প্রশ্ন করবে তা আগে মনের মধ্যে কেন্দ্রীভূত ক'রে ভালো ক'রে ভেবে দেখা। নতুবা মনের যে অংশে বোঝবার শক্তি আছে সে অংশ প্রশ্ন

করে না. কেবল তার উপরভাসা অংশই এলোমেলো কতকগুলি কথা জড়িয়ে নিয়ে তাকেই অনবরত নাড়াচাড়া করতে থাকে, আর সেই অংশই প্রশ্ন করে কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না।

কতবার আমি একই রকমের কথা বারবার ক'রে বলি, এবং তার সপ্তাহখানেক পরে যদি জিজ্ঞাসা করি যে কি বলেছিলাম, তখন দেখি যে সেটা তোমাদের মনে নেই। আর কতবারই তোমরা ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো, কারণ আগেই তার জবাবটা শুনেও বুঝতে পারোনি। কেবল কানেই শুনেছ কিন্তু ভেতরে ঢোকেনি। যেমন পড়া করতে বসেও কেবল তার কথাগুলোই মুখস্থ করো, ভিতরে বোধের মধ্যে কিছু নাও না, কাজেই তা স্থায়িত্ব নেয়না আর তার ফলও কিছু হয় না, বুঝে রাখতে সাহায্য করে না। তার প্রমাণ এই যে, যখনই বলেছি "এর জবাব তো এইমাত্র বললাম," দেখি তার কিছুই মনে নেই।

প্রায়ই এমন হয় (ছোটোদের মধ্যে এবং তোমাদেরও মধ্যে) যে একজন একটা প্রশ্ন করলে এবং আমি তার জবাবও দিলাম, কিন্তু তবু পরমুহূর্তেই অন্য একজন অন্য ভাষাতে সেই একই প্রশ্ন করলে, যদিও এইমাত্র তার জবাবটা সে শুনেছে। এমনই হয়, কথাগুলো নিতান্ত ভেসে চলে যায় চিন্তার মধ্যে না ঢুকে আর বোধগম্য না হয়ে। অথচ প্রশ্নও ঠিক ভাবে করতে পারো না...ভেবে দেখনা বলে...শুধু এলোমেলো কথা বলে প্রশ্ন করো।

প্রশ্ন : মা, এখন একটা শেষ প্রশ্ন কাল হচ্ছে আমাদের স্পোর্ট শুরু হবার দিন, তাই...

উত্তর : তাই আমরা একটু অন্ধবিশ্বাস নিয়ে যদি প্রার্থনা করি যে কাল যেন তখন বৃষ্টি না হয়? (হাসলেন) তোমরা তো জানো যে মেঘের মধ্যে বাতাসের মধ্যে থাকে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্তারা যারা মানুষ না হলেও দুষ্ট বুদ্ধিতে দুষ্টামি করে। এরা প্রাণস্তরের অন্তর্গত, অনেক সময় বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম মেনেই চলে, কিন্তু কোনো কোনো আধাস্বাধীন সত্তা ইচ্ছামতো এনে ফেলে বৃষ্টিপাত দুর্যোগ ইত্যাদি স্থানীয় ভাবে। এখন যদি এদের বলি (এরা, বিনীত প্রার্থনা করা পছন্দ করে) যে, "বিনতি করছি, কাল আমাদের এখানে খেলা আরম্ভ হবে, দয়া ক'রে ঐ সময়টিতে কোনো বাধা দিওনা, বৃষ্টি যদি আনতেই চাও তো সন্ধ্যার পরে এনো। দয়া ক'রে ঐ সময়ে বৃষ্টিতে আমাদের খেলাটা নষ্ট কোরো না," তাহলে হয়তো প্রার্থনার ফল পাওয়া যাবে।

তোমাদের কি মনে আছে, যখন এখানে অনাবৃষ্টি চলছিল লোকে বলতে লাগল যে আমরা প্রার্থনা করলে বৃষ্টি আসবে, একদিন তাই বৃষ্টি আহ্বান করা হলো আর তার পরেই বৃষ্টি এলো? পরে আরো ভালোই বৃষ্টি হলো। এমনি হয় প্রাণস্তরের সত্তাদের কাজ।

এখন কি বলতে চাইছিলে তাই বলো।

প্রশ্ন : মা, কোনো বিশেষ কারণ ঘটলে যখন আমরা তোমায় ডাকতে থাকি, তখন কি না ডাকে তুমি...

উত্তর : হাঁ, হাঁ গো ছেলে।

প্রশ্ন তাহলে নিজের দরকারে ডাকাতে দোষ হয় না ?

উত্তর নিজের দরকারে ? তারই জন্যে তো এখানে তোমরা আছো। নিজের কাজটি যাতে ভালোভাবে করতে পারো সেইজন্যে যদি ডাকো তাতে কোনো দোষ হয় না, কিন্তু এটা তোমরা জানো যে তোমাদের কাজের পালা শেষ ক'রে যখন আমি এখানে ফিরে আসি তখন খুবই অবসন্ন হয়ে পড়ি, বিশ্রামের দরকার হয়।...ভিতর থেকে টান ধরে, কখনো বা খুব বেশিরকম।...খানিকক্ষণ পরে আবার সব ঠিক হয়ে যায়। মারাত্মক কিছু নয়, কিন্তু একটু বেগ পেতে হয়।

তবে ওতে আমার আপত্তি নেই। বরং তোমাদের বলি, "আমার সব ছেলেমেয়েরা, যখন তোমরা কঠিন কিছু করবে তখন ডেকো আমাকে, ডাকবেই আমাকে।" না, কিন্তু তাই বলে ফার্স্ট হবার জন্যে নয়, খেলাতে জিতবার জন্যে নয়, তাতে কারো অনিষ্ট বা অমঙ্গল যেন না হয়। এইজন্যে ডাকবে যাতে কাজটা তোমার সব চেয়ে ভালো ভাবে সম্পন্ন হয়, বাহাদুরি দেখাতে নয়, কিন্তু কাজকে যথাসাধ্য সফল করে তুলতে আর তাতে আনন্দ পেতে। আর সে কাজ যদি নিবেদন হিসেবে করতে চাও তো আরো উত্তম।

প্রশ্ন মধুময়ী মা, ঐরকম ভাবে তোমাকে টানা ছাড়া কি অন্য কোনো ভাবে তোমাকে ডাকা যায়না ?

উত্তর হাঁ, তাও করা যায় গো ছেলে, কিন্তু সে একটা কঠিন উপায়। যত বেশি সত্যিকার উচ্চতরভাবে ডাকা তত বেশি কঠিন।

কিন্তু যেমন ভাবে তোমরা ডাকো তাও ভালো, তার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই। কারণ এমন আমি দেখতে চাইনা যে কারো মাথার উপরে কালো মেঘ ঘনিয়ে আছে, দুর্ঘটনা আসন্ন দেখে আমি তার ভিতরে ঢুকে সাহায্য করতে গিয়ে দেখলো যে তার সকল দুয়ার এঁটে বন্ধ করা, আর সে অচেতনে ভাবছে যে নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারবে অথচ সেই দুর্ঘটনা ঘটেই গেল, এড়াতে পারলে না।...এমন ঘটনাও বাস্তবিক ঘটে গেছে। এমন হলে আমার পক্ষে তা আনন্দের হয় না।

সেইজন্যে আমি বরং এমন সহজভাবে ডাকাই পছন্দ করি।

তাহলে কাল তো বৃষ্টি হবে না, কেমন ?

আচ্ছা, পুনর্দর্শনায়, শুভ রাত্রি।

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(মাঝে মাঝে মায়ের ব্যাখ্যা সহ)

৫১৪—নিজের ভগবৎ সেবাকর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে মোটামুটি হিসাব করতে বসলে তুমি দেখবে যে মানুষকে ভালোবেসে অপূর্ণ ভাবেও সামান্য যতটুকু কাজ তুমি করেছিলে তাদের জন্যে, তারই দাম সব চেয়ে বেশী।

মা : এইজন্যই ভগবানকে পূজা করার চেয়ে তাঁর কাজেরই মধ্যে তাই হয়ে ডুবে যাওয়াই সব চেয়ে ভালো।

প্রশ্ন সম্পূর্ণ রূপে তাঁর হতে পারার গোড়াতে কি সেবার কাজ থেকে শুরু করা যেতে পারেনা ?

উত্তর নিশ্চয়, তোমার সকল কর্মকেই ভগবানকে নিবেদন করা তো ভালো কথাই গোড়ার দিকে, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ এখানে বলেছেন আরো অত দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবার কথা।

১৩-৫-১৯৭০

৫১৫—ভগবানের সেবকের তরফের দুইটি কাজ তাঁর কাছে খুবই প্রিয়। একটি হলো নীরব শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁর মন্দিরপ্রাঙ্গণে খাঁটি দেওয়া। আর একটি হলো জগতের সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষদের মধ্যে তাঁর সত্যক প্রতিষ্ঠা আনবার জন্য লড়াই করা।

৫১৬—মানবকল্যাণের কাজ যদি কেউ কিছুমাত্রও ক'রে থাকে তবে সে ঘোর পাপী হলেও তিনি তাকে আপন প্রিয় ভক্ত ও সেবকদের মধ্যে স্থান দেবেন। সে শাশ্বতের মুখ দেখবে।

মা শ্রীঅরবিন্দের সরাসরই ঐ চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর অনুগামী ভক্তরা এবং পাঠকরাও মামুলী নৈতিকতার বাঁধা ন্যায় অন্যায়ের জালগুলির পাশ থেকে মুক্ত হতে পারে।

১৫-৫-১৯৭০

৫১৭—দুর্বলচিত্ত হে নির্বোধ, তোমার ভয়ের পর্দা দিয়ে যেন ভগবানের মুখটি আড়াল কোরোনা, তাঁর দিকে নির্ভয়ে এগিয়ে যাও—রাজা কিংবা বিচারকের কাছে যাবার মতো ক'রে নয়, কিন্তু কেবল প্রেমিকের মতো হাসিমুখ নিয়ে।

৫১৮—কুস্তি লড়ার দোসরের মতো আপ্‌টে যদি ভগবানের সঙ্গে না লড়তে পারো, তাহলে তোমার আত্মার শক্তি গুপ্ত হয়েই থাকবে।

মা স্বর্গে অসুর তাঁর চুলের মুঠি ধরে তিন পাক ঘোরালে, কিন্তু তাঁর দ্বারাই সে নিহত হলো। অসুরের পক্ষে অমর হতে চার পাদ লাগে, তার মধ্যে শেষেরটাই দুঃসাধ্য ও কঠিন।

প্রশ্ন : মা, অসুরের পক্ষে চার পাদের কি অর্থ বুঝলাম না।

মা তার মানে যার যেমনই প্রকৃতি হোক, আর সে অসুরের মতো তাঁর বিরোধিতাই করুক অথবা ভক্তিতে ভালোই বাসুক, তবু স্বয়ং ভগবানই শেষ পর্যন্ত সেই শেষ পাদের গতি।

১৭-৫-১৯৭০

৫২০—স্বয়ং কৃষ্ণই প্রকট হয়েছেন কালীমূর্তিতে তাঁর ভয়ংকরী শক্তি ও ক্রোধপূর্ণ তীব্র প্রেম নিয়ে, যাতে মন-প্রাণ-দেহের সমস্ত অহংকে নাশ করে শাশ্বত আত্মাকে মুক্তি দিতে পারেন।

মা এ কথায় কি আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত, যদি আমাদের ক্ষুদ্র ও দুর্বল অহং ভাবটা ঘুচে গিয়ে তার বদলে ঐরূপে আত্মার জ্যোতির্বিকাশ হয়ে বিশ্বরহস্য উদ্ভাসিত হতে পারে? ২১-৫-১৯৭০

৫২১—সেমেটিক যুগে আমাদের প্রাচীন পিতামহদের পতন হয়েছিল, কারণ তাঁরা কেবল ভালো এবং মন্দ বৃক্ষের ফলগুলি খেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা যদি শাশ্বতজীবন-বৃক্ষের ফলও খেতেন তাহলে পতন এড়িয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু তাতে ভগবানের মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যটি ব্যর্থ হতো। তাঁর এই অকরুণাই আমাদের জন্য চিরন্তনের সুযোগ।

মা শ্রীঅরবিন্দ এখানে বোঝাতে চাইছেন যে আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ও বুদ্ধিতে আমরা ভগবৎ প্রজ্ঞাকে ও তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারি না। ২২-৫-১৯৭০

৫২২—নরক যদি যথার্থই থাকতো তাহলে সটান স্বর্গে উঠেও যাবার একটা শর্টকাট সোজা রাস্তা মিলে যেতো। কারণ ভগবান যে আমাদের ভালোই বাসেন।

৫২৩—ভগবান তাঁর ইডেন উদ্যান থেকে আমাদেরকে তাড়িয়ে বের ক'রে দেন, যাতে আমরা রুক্ষ দুর্গম দুর্দান্ত বন্ধুপথের যাত্রা পার হয়ে স্বর্গের দিব্যক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছতে পারি। তুমি যদি ভাবো যে এমন কঠোর দুঃখযাত্রার প্রয়োজন হলো কেন, তাহলে তা তোমার নিজেরই মনের বোকামি, কারণ তোমার আত্মার ভিতরদিকে কেমনতরো ইচ্ছা-পূরণের ও আনন্দের প্রত্যাশা লুকিয়ে আছে তার খবর নিয়ে দেখোনি।

মা যখন তোমার দুঃখদুর্দশার দিকে কোনো নজর না রাখাটা থাকবে না, সমস্ত বিকৃতিগুলো যখন ঘুচে যাবে, তখন বুঝতে পারবে যে ভগবান তোমার পরমানন্দ লাভের জন্যই সাহায্য করছেন। ২৩-৫-১৯৭০

৫২৪—সুস্থ মন ব্যথা মাত্রকেই ঘৃণা করে। যারা ব্যথা-বেদনাকে পুষে রাখতে চায় সেটা তাদের মনের অসুস্থতা ও বিকৃতির লক্ষণ; এবং তা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ভিতরের আত্মা কিন্তু ও সব আদৌ গ্রাহ্য করে না—ওস্তাদ কামার যেমন লোহাকে আগুনে ফেলে তার উপরে হাতুড়ি পেটে, ওতে তার ব্যথা লাগার কথা আদৌ না ভেবে কেবল ভাবে তার প্রয়োজনের কথা ও ইচ্ছাপূরণের কথা তেমনি রকমই ভাবে।

মা: ভগবানই হলেন আসল ওস্তাদ ও তিনিই একমাত্র প্রভু। ভিতরের চৈত্যসত্তা কেবল তাঁকেই মেনে চলে। ২৪-৫-১৯৭০

৫২৫—অহেতুক করুণা প্রকৃতির এক মহৎ দান। কোনো প্রাণীকে দুঃখ না দেওয়া মানুষের সব চেয়ে বড়ো পুণ্যকর্ম। তা কিন্তু ভগবান নিজে কিছুই করেন না, তাহলে কি সেই সর্বপ্রেমিকের চেয়ে এরা বড়ো ও মহৎ?

৫২৬—কোনো মানুষের দেহের বা মনের কষ্টকে নিবারণ করা যে সব সময়ে তার পক্ষে আত্মার বা মনের বা দেহের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, দয়ামায়াশীল বদান্য ব্যক্তিকে বাস্তবে প্রায়ই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা পেতে হয়।

মা ভগবৎ চেতনা যে কেমন তা জানতে পারাই মানুষের পরম সিদ্ধিলাভের পূর্ণতা ; আর বাকি যা কিছু তা চলতি পথের। ২৫-৫-১৯৭০

৫২৭—মানুষের দয়ামায়া আসে তার অজ্ঞান ও দুর্বল প্রকৃতি থেকে আর তা কাজ করে চিত্তাবেগের ক্রীতদাসের মতো। ভগবৎ কৃপা কিন্তু সব দিক দেখে বুঝে যথাস্থানে রক্ষা করে।

৫২৮—মমতা কখনো কখনো প্রেমের বদলে তারই মতো কাজ করে ; তা করলেও কিন্তু তা আসল জিনিসের তুল্য হয়না।

মা কেবল ভগবানের উদ্দেশ্যটি বুঝে নিয়ে তদনুযায়ী কাজ করা, তাই কি মানব-মঙ্গল করার সুনিশ্চিত পন্থা নয় ? ২৮-৫-১৯৭০

৫২৯—নিজের প্রতি মমতা জন্মায় আত্মপ্রেম থেকে। কিন্তু পরের প্রতি মমতা প্রেম থেকে নয়। কখনো কখনো তাদের দুঃখ দেখে নিজের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়ার সংকোচ উপস্থিত হয় তার থেকে ওটা আসে। ধনী লোকেরা যেভাবে দয়াদাক্ষিণ্য করে কাঙালী-ভোজন করায়। ও রকম মানবীয় মমতার বদলে আসল ভগবৎ করুণা এনে ফেলতে চেষ্টা করো।

৫৩০—মমতা নয় যা অন্তরকে ব্যথিত ও হৃদয়কে দুর্বল করে, কিন্তু চাই সেই ভগবৎ করুণা, যা শাশ্বত ও সহায়ক, তাই পেতে কামনা করো।

মা ভগবানকে না জেনে জগতে বেঁচে থাকা, এর চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য আর কি আছে ? অথচ প্রায় সর্বজনীন এই দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কারো মমতা আসেনা। কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের কথা নিজেরই সম্বন্ধে যে নিজে জেনেছে তার নিজেরই কাছে এর প্রতিকারও দেওয়া রয়েছে—কারণ সেদিক দিয়ে ভগবানের করুণার কোনো সীমা নেই। ১-৬-১৯৭০

৫৩১—মানুষকে ভালোবাসবে ও মানুষের সেবা করবে, কিন্তু তারা তোমার সুখ্যাতি করুক এমন বাসনা যাতে তোমার না আসে সে সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকবে। তুমি শুধু আপন অন্তরের মধ্যে অবস্থিত ভগবানেরই নির্দেশ মেনে চলবে।

৫৩২—ভগবানের কিংবা তাঁর দূতের নির্দেশবাণী যতক্ষণ পর্যন্ত না শোনা যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের মধ্যে প্রজার ক্রিয়া সম্বন্ধে কোনো ধারণা তোমার হবে না।

৫৩৩—ভগবানের মুখ সর্বত্রই দেখবে, বাইরের মুখোস দেখে ভুলবে না। জেনে রেখো যে সকল নিষ্ঠার মধ্যেই গহনে রয়েছে সত্যের গঠন কিংবা তার ভাঙন, সকল ব্যর্থতার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তার সার্থকতা, সকল দুর্বলতার মধ্যেই তার দৃষ্টির আড়ালে রয়েছে শক্তি, সকল বাধার পিছনেই রয়েছে মঙ্গল ও তীব্রতর আনন্দ। অবিচল ভাবে যদি দৃঢ় বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকো তাহলে তুমি শেষকালে দেখতে এবং অনুভব করতে পারবে সর্বশক্তিমান সর্বসত্যময় সচ্চিদানন্দকে।

মা অচল অবিচল ও নিরন্তরের প্রচেষ্টা এবং শ্রদ্ধা থাকলে আমরা অবশেষে সেই নির্মল ও অনির্বচনীয় মহাচেতনাতে মহানন্দে মিলে যাবো। ২-৬-১৯৭০

৫৩৪—মানবীয় প্রেম বেশি তৃপ্ত হয়ে পরে নিতে যায়, মানবীয় শক্তি বেশি কাজ করলে ফুরিয়ে যায়, মানবীয় জ্ঞান তার আপন রৌদ্রালোকের মধ্যে ছায়া ফেলে অর্ধেক জগৎকে আচ্ছন্ন করে,—কিন্তু দিব্য জ্ঞান বিপরীত সত্যকেও নিজের মধ্যে জড়িয়ে এক ক'রে নেয়, দিব্য শক্তি যতই খরচ হয় ততই আরো বাড়তে থাকে, দিব্য প্রেম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েও ম্লান হয় না।

প্রশ্ন মানবীয় প্রেম কি দিব্য প্রেমে, আর মানবীয় শক্তি কি দিব্য শক্তিতে, মানবীয় জ্ঞান দিব্য জ্ঞানে রূপান্তরিত হতে পারে?

মা প্রেম তো আসলে একই জিনিস।

সেই আসল প্রেমই মানবীয় যন্ত্রাধারের মধ্যে এসে বিকল্প রূপে বিকৃতি নিয়ে প্রকাশ পায়। শক্তি ও জ্ঞানের সম্বন্ধেও সেই কথা। সবই শাশ্বত ও অসীম। কিন্তু সংকীর্ণ ও সীমিত আধারে এলে আর তাকে চেনা যায় না। ৩-৬-১৯৭০

৫৩৫—পূর্ণ-সত্যসন্ধানী মন মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে সে পূর্ণ-সত্যে পরিণতি পেতে পারে না। দিব্যদর্শী মন মিথ্যাকে বাদ দেয় না,—কিন্তু কোন মারাত্মক দোষকে ঢাকবার জন্য সে মিথ্যার যে মুখোস নিয়েছে তাকেই ধরে ফেলে।

প্রশ্ন: দিব্যদর্শী মন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ এখানে এমন মনের কথা বলছেন যে মন ভগবানেই সমর্পিত হয়ে কেবল ভগবৎ প্রেরণাতেই কাজ করে। অর্থাৎ যে মানুষের মন কেবল ভগবানের কাজেই নিযুক্ত থেকে ভগবানেরই নির্দেশ অনুসারে চলে তাকেই বলা যায় দিব্যদর্শী মন। ৪-৬-১৯৭০

৫৩৬—যে কোনো জিনিসের মোট সত্যটুকু সব কিছুকে জড়িয়ে নিয়ে চাকার মতো অনবরতই ঘুরে চলেছে নিজেকে ঘিরে কিন্তু মূল সত্যকে কখনই স্পর্শ করছে না—অর্থাৎ ভগবানকে।

৫৩৭—নিখুঁত নিখুঁত সত্য অনেক আছে যা আমাদের হাতে পড়লে মারাত্মক অস্ত্র রূপে কাজ করতে পারে। কিন্তু মুদক্ষ হাতে তাই হতে পারে ভগবানের অমূল্য অস্ত্রাগারের আশ্চর্য শক্তিযন্ত্র।

মা : অজ্ঞানের জগতে সত্য জ্ঞানের একটি কোঁচা যদি পড়ে তাতেই সেখানে মহা বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে। ৫-৬-১৯৭০

৫৩৮—নিজেদের এই সামান্য ক্ষণভঙ্গুর শোকেতাপে আঁধারকরা ব্যক্তিগত অস্তিত্ব-টুকু নিয়ে আমরা নাছোড়বান্দার মতো আঁকড়ে থাকি, এমন কি যখন অখণ্ড বিশ্বানন্দ ডাক দিচ্ছে তখনও—এটি হলো ভগবানের সৃষ্টির এক অদ্ভুত রহস্য। এরই সমান হচ্ছে সেই অন্ধতা যাতে নিজের অহংএর ছায়া জগতের উপর আরোপ ক'রে বলতে থাকি যে এই হলো বিশ্বসত্য। এই দুই রকমের অন্ধকারে ভুলিয়ে রাখা হলো মায়াশক্তির প্রধান খেলা।

মা তাই তো হয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের অহংএর যন্ত্রক্রিয়া ও বোকামিতে শেষে ক্লান্ত হয়ে ও সব ছেড়ে শুধু ভগবানকেই পরম সত্য ও পরম প্রভু জেনে সেই চরণে লুটিয়ে না পড়ি। ৬-৬-১৯৭০

৫৩৯—নাস্তিকতা হলো চরম ভগবৎ উপলব্ধির কালো উল্কাপিণ্ড। ভগবানের যে সব আকৃতি আমরা গড়ি তা প্রতীক হিসাবে সত্যই, কিন্তু তাকেই নির্বিশেষ করতে চাইলে তা মিথ্যা হয়ে যায়। নাস্তিক আর অগমবাদীরা সেই ভুল আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫৪০—ভগবানের হাঁ-ও যেমন কাজের, না-ও তেমনি কাজের। নিজেই তিনি নাস্তিক হয়ে আপন অস্তিত্ব অস্বীকার করেন মানুষের জ্ঞানকে পূর্ণতর করবার জন্য। শুধু খ্রীষ্ট ও রামকৃষ্ণকে ভগবান জেনে তাঁদের বাণী শুনে রাখলেই চলবে না, হাক্সলি ও হেকেলের মধ্যেও তাঁকে জানতে হবে।

মা কেবল মনের জ্ঞানেই কিছু হবে না, যতই তা সর্বাঙ্গীণ হোক, কিন্তু তার মধ্যে নিজে বাস করলে তবেই সত্যের আলোকরশ্মি জ্বলবে। ৭-৬-১৯৭০

৫৪১—তুমি কি তোমার পীড়নকারী ও নিধনকারীর মধ্যেও ভগবানকে দেখতে পারো, সেই পীড়নের মধ্যেও? আর তুমি যাকে হত্যা করতে যাচ্ছ তখন সেই হত্যা-ক্রিয়ার মধ্যেও কি তাঁকে দেখতে পারো? তাহলে চরম জ্ঞানভাণ্ডারে তোমার হাত পড়েছে। কালীকে যে না ভজেছে সে কৃষ্ণকে পাবে কেমন ক'রে?

মা সবই তো সেই এক ভগবান, সে ছাড়া অন্য কিছু না।*

৮-৭-১৯৭০

---

* Bulletin of S.A.I.C.E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

"ছোট্ট হাসি"কে লেখা শ্রীমা'র পত্র

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

মা,

আজ তোমাকে লিখে জানাবার কিছুই নেই। অন্য দিনের মতো আজও আমি সারা দিন ধরে কাজ করেছি। ইতি—

শ্রীমা—আমি আশা করি এই যে নামটি শুরু হলো এটি তোমার নিকট একটি উপলব্ধি এনে দেবে এক সুখময় অনাবিল শান্তি—একটি সুগভীর নীরবতা।

এই রকমই আমার ইচ্ছা ও আশীর্বাদ।

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

মা,

আজ তোমাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে বন্দী করে রাখবো।

তাহলে শান্তি ও আনন্দের জন্যে আমার আর কোনো ভাবনা থাকবে না। যখন তুমি স্থৈত হয়ে আমার হৃদয়বাসী তখন এ-সকল জিনিষ তো আমার একেবারেই অপরিহার্য।

ইতি—

শ্রীমা—আমাকে পাকড়াতে তোমার বেশীদূর যেতে হবে না, কারণ আমি তোমার হৃদয়েই হাজির রয়েছি। যখনই তুমি তোমার চোখ খুলবে তখনই সেখানে আমাকে দেখতে পাবে। তোমার অনুভব ক্ষমতাকে সব সময় বহির্জগতে* ছড়িয়ে না দিয়ে অন্তর্মুখী করো।

তাহলে যেমন করে শীত-গ্রীষ্ম অনুভব করো ঠিক তেমনিভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করবে আমার উপস্থিতি।

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪

বেচারা মেয়ে, আমি আগ্রহ করে তোমাকে আমার কোলে তুলে নিয়েছি। গভীর স্নেহের সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছি আমার হৃদয়ের মাঝে যাতে তোমার মুখে দুঃখের কোনো ছাপই ফুটে না ওঠে এবং কোনো প্রকার প্রতিহিংসার কারণও তোমাতে দেখা না দেয়। তুমি আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ থাকো। আমার ভালবাসায় সিক্ত হয়ে ওঠো। ঝেড়ে ফেল সকল প্রকার অসন্তুষ্টি। তোমার চিঠিটি শ্রীঅরবিন্দকে দেখাবার জন্য রেখে দিয়েছি, সেই সঙ্গে আজকের এই চিঠিটিও রেখে দিলাম। এগুলি তোমাকে এই নোটবুকটির সঙ্গে ফিরিয়ে দেবো।

---

* (শ্রীমা'র মন্তব্য) আমি বলতে চাই যে, বাইরের ঘটনাবলীর জগৎ যা একান্তই ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়, তা থেকে সরে এসে তোমার অন্তরাত্মায় মনঃসংযোগ করো ; দেখতে পাবে সেখানেও রয়েছে এক স্বাধীন ইন্দ্রিয়ানুভূতি (দৃষ্টি, শ্রুতি, ঘ্রাণ, স্বাদ ও স্পর্শ)।

৩রা মার্চ, ১৯৩৪

(শ্রীঅরবিন্দকে) প্রভু, আমি তোমার সাহায্য এবং কৃপা ভিক্ষা চাইছি। আমার মন খুবই চঞ্চল ও বেয়াড়া হয়ে উঠছে। মনটি হয়ে উঠছে একটি কল্পনা-ভাণ্ডার এবং সর্বদাই আমার মস্তিষ্ককে পরিপূর্ণ করে রেখেছে রকমারি চিন্তা ও কল্পনা দিয়ে যার জন্য মায়ের উপস্থিতিকে সকল সময় আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। এরা আমাকে মায়ের চেতনার মধ্যে বাস করতে দিচ্ছে না। কাজেই কখনো কখনো আমি খুবই বিবর্ণ হয়ে পড়ছি।

প্রভু। এই সকল প্রভাব থেকে আমাকে মুক্ত করুন, আমাকে দিন সত্যকার শান্তি ও আনন্দ যা আমাকে মায়ের চেতনা অনুভব করতে দেবে এবং মায়ের চেতনার মধ্যে সর্বদা বাস করতে দেবে। আমি নিজে বাঁচবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হতে পারিনি।

আজ সকালে মা আমাকে আপনার সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা করতে বলেছেন। আমি আপনার সাহায্য ও করুণা ভিক্ষা করি। আশা করি আপনার সাহায্য আমাকে এই কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেবে। ইতি—

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর :

প্রথম প্রয়োজন হলো, এই সকল বাধা-বিপত্তির মধ্যে নিজেকে তুমি হারিয়ে ফেলবে না। এই রকম জিনিস প্রায়ই ঘটে, কারণ, এই সকল চিন্তা মানুষের মনে অতি সহজেই এসে পড়ে। কিন্তু যথা সময়ে সেগুলি সরে যায়। এমন কি খুব অল্প সময়ের মধ্যেও হতে পারে যদি তুমি শান্ত এবং দৃঢ়ভাবে বাধা-বিপত্তিগুলির সম্মুখীন হও। এ কেবল মনের গতানুগতিক অভ্যাস—একে দূর করা যায়।

তুমি যদি এগুলোকে তোমার নিজের মনের সৃষ্টি নয় বলে বুঝতে পারো, তাহলে তাদের এড়িয়ে চলা খুব সহজ হবে। যে জড় মন এই সকল বাধা দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই মনকে দেখতে শিখতে হয় বুঝতে হয় যে, সে-সব বাধাগুলি আসছে বাহির থেকে। তখন তাদিকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়, তাহলেই সেই বাধাগুলি সরে যায়।

এই বিষয়ের জন্য তুমি আমার ও মায়ের সাহায্য পাবে। অন্তরে নিশ্চিন্ত থেকো, যা প্রয়োজন তা করা হবে।

—

১১ই জুলাই, ১৯৩৪

শ্রীমা—স্নেহের বাছা, এই 'ভিশান'টিকে বুঝার পক্ষে এটা সত্যিই একটা অপ্রত্যাশিত উপায়। এমন ধরনের অর্থ আমি দিইনি। এই 'ভিশানের' মধ্যে যে সকল মূর্তি দেখা যায় তা সর্বদাই ব্যাপক হয়ে থাকে, এবং তার অর্থ এই ভাবেই বোঝাতে হয়।

পাহাড়-পর্বত সর্বদাই জড় প্রকৃতির প্রতীক যা শক্ত এবং কঠিন, অথচ তার মধ্যে রয়েছে জীবনীশক্তির প্রবাহ। জড়ের বাধার জন্যই এই জীবনীশক্তির প্রবাহ নিজেকে সকল বিঘ্ন হতে মুক্ত করে আলোর দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু একটু একাগ্রতা ও আগ্রহ থাকলেই এই সকল প্রতিবন্ধকগুলি হ্রাস হতে পারে এবং জীবন-প্রবাহ মুক্ত হতে পারে।

এই প্রতীকটি সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে, তবে এটি তোমার পক্ষেই বিশেষ করে প্রযোজ্য। আমি নিশ্চিতরূপেই বলতে পারি, তোমার এই সকল বাধাবিপত্তিগুলি পথ থেকে সরে যাবে এবং তুমি শীঘ্রই মুক্ত ও স্বপ্নময় চেতনায় বাস করতে পারবে।

২৪শে আগষ্ট, ১৯৩৪

...তাহলে যে-কাজটি করতে আমার তিনদিন লেগেছে, সেটি এখন স্থগিত রাখতে হবে যাতে পরে আরো ভালভাবে করতে পারি।

শ্রীমা এই কাজটি তোমার পক্ষে খুবই সুসাধ্য হবে, আমার ছোট্ট হাসি। আর তুমি যা বলেছো তা জীবনের পক্ষেও সত্য—একটা কাজ আরো ভাল করে করবার জন্যে সেটিকে কিছুদিন ফেলে রাখতে হয় যাতে পরে আরো ভালভাবে করতে পারা যায়।

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৫

স্নেহের ছোট্ট হাসি,

তুমি ঠিকই বলেছো, এই মেডেলগুলো দেখতে সত্যিই কুৎসিত। এর নাথার দিকটা দেখতে হাস্যোদ্দীপক। এই কারণেই এমন মেডেল আমি কাউকে দিইনি। কারণ যাকে দেবো তার যদি পছন্দ না হয় সে আবার আমাকে ফিরিয়ে দেবে।

আমাদের আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

১৮ই জুলাই, ১৯৩৫

ছোট্ট হাসি,

তুমি ভয় পেয়ো না। যদি ভয়ের কিছু দেখ কিংবা কোনো কিছু তোমার খারাপ লাগে, তৎক্ষণাৎ তুমি আমাকে স্মরণ করবে। তাহলে সে-সব চলে যাবে। যখন তুমি জেগে উঠবে তখন আর ওই সব মেঘগর্জন ও বজ্রপাতের ভয় তোমার থাকবে না। কেন এরা রাতের বেলায় ভয় দেখায়?

তুমি নির্ভয়ে আমার বাহু-বন্ধনের মধ্যে আশ্রয় নিও এবং নিশ্চিত থেকো যে কোনো কিছুই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। আমার রক্ষা-শক্তি সর্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। ইতি—

৮ই আগষ্ট, ১৯৩৫

ছোট্ট হাসি,

তোমার অবস্থাটি তুমি সুন্দর করে বর্ণনা করেছো। আর যখন তুমি ও-বিষয়ে সচেতন হয়েছো তখন আমার মনে হয় শীঘ্রই তুমি ওর উপর প্রভুত্ব অর্জন করবে।

একথা না বললেও চলে যে, আমাদের সাহায্য সব সময় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে যাতে তোমার মধ্যে শান্তি ও নীরবতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিশ্চয় জেন, ওই শান্তি ও-নীরবতা আর কখনোই তোমাকে ছেড়ে যাবে না। ইতি—

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫

(সূচীশিল্পের নমুনার বিষয়ে শ্রীঅরবিন্দের একখানি পত্র)

আঃ, কী সুন্দর মাছটি হয়েছে! শিল্পের মধ্যে প্রতিটি খুঁটিনাটি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতই এটা 'অতিমানস মৎস্য'।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৬

মা,

তুমি বলেছিলে আমার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যা এখনো তোমার দিকে খুলে ধরতে পারিনি, এবং সেই জন্যেই আমি ইচ্ছা করলেও তোমার ভালবাসাকে অন্তরে অনুভব করতে সমর্থ হই না।

যে দিকটি আমার এখনো খোলেনি সেটি কি? আমার হৃদয়? না কি অন্য কিছু? নিজেকে আমি এদিক থেকে বুঝতে পারিনি।

আমার দিক থেকে বলতে গেলে, আমি জানি এটি তোমার দিকে খুলে আছে এবং আমি সবসময়েই তোমার ভালবাসা অনুভব করি।

কিন্তু যদি প্রকৃতই এটি বন্ধ হয়ে থাকে তাহলে তা কি উপায়ে খুলবে? আমি কী করলে এটি খোলা হবে? সত্যিই আমি চাই ওই দিকটি আপনা থেকেই তোমার দিকে খুলুক এবং আমি যেন সর্বদা অনুভব করি চিরশান্তি।

ইতি —ছোট্ট হাসি

স্নেহের ছোট্ট হাসি,

আমি শুধু একটি পথই জানি: নিজেকে দিয়ে দেওয়া—ভগবানের কাছে নিঃশেষে সমর্পণ: যত বেশি তুমি দেবে তত বেশি খুলতে পারবে যত বেশি খুলবে ততই বেশি গ্রহণ করতে পারবে। আর এই আত্মসমর্পণের ফলেই উপলব্ধি হয় অন্তরে ভগবৎ-উপস্থিতি এবং আনন্দ।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৬

মধুময়ী মা,

নিজেকে ভগবৎ-চরণে 'উৎসর্গ' করে দেওয়া বলতে ঠিক কি বুঝায় আমি বুঝতে পারিনি।

নিজেকে আরো বেশি করে তোমার নিকট সমর্পণ করতে হলে আমাকে কি করতে হবে? কেমন করে, কি উপায়ে আমি আরো বেশি বেশি করতে পারবো? ইতি—

ছোট্ট হাসি

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর

যেমন করে কাজের মাধ্যমে তুমি নিজেকে সমর্পণ করো মায়ের কাছে, তাঁরই জন্য করো সকল কাজ; ঠিক তাকেই বলে অন্তর সমর্পণ বা উৎসর্গ। সাধারণতঃ মন-প্রাণ তাদের নিজেদেরকেই বেশি ভালবাসে। এটা চায় ওটা খোঁজে আর না পেলেই অখুশী হয়।

কিন্তু যখন তারা নিজেকে উৎসর্গ করে তখন এ সব চাওয়া-পাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। যা তাদেরকে দিয়ে যে কাজ করান তারা তাই-ই করে, তারা তখন কিছুই চায় না, শুধু মায়ের উপর নির্ভর করে—যাকেই ভালবাসে। তারপর তারা নিজেদের সত্তা হারিয়ে ফেলতে থাকে, তাদের পুরানো অভ্যাসগুলো লুপ্ত হয়ে যায়; সে স্থান পূর্ণ করে তখন মায়ের উপস্থিতি, মায়ের ইচ্ছা, মায়ের দিব্য ক্রিয়া।

মায়ের উত্তর :

আমার স্নেহ-ভালবাসা জানাই, আমার ছোট্ট হাসি।

৩০শে জুলাই, ১৯৩৬

...তোমাকে স্পষ্ট করে বলছি, যখন কারো মুখে শুনি বা কেউ আমার কাছে বলে তার আনন্দের অনুভবের কথা তখন আমি একটুও খুশী হতে পারি না। এরই জন্যে আমি নিজেকে এত হীন ভাবি। তখন আমি অনুভব করি যা পাওয়া আমার উচিত ছিল তা আমি পাইনি। আর এই জন্যেই আমি তোমার কাছে শান্তি ও নীরবতা চাই (আগের দিন যা তোমাকে বলেছি); কারণ যদি কেউ সর্বদাই এই শান্তি ও নীরবতা লাভ করতে পারে তাহলে সে কখনও নিজেকে হীন ভাবতে পারবে না। আমি তা হতে চাই না, আমি তেমন হীন ভাবতে চাই না। ইতি—

ছোট্ট হাসি

শ্রীঅরবিন্দের উত্তর :

শান্তি ও নীরবতা কাজ করে চলেছে তাদের প্রকাশের জন্য। মন-প্রাণ নিজেদের সমর্পণ করে দিলেই শান্তি ও নীরবতায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

মায়ের উত্তর :

তুমি এই শান্তি ও নীরবতার আনন্দ আগেই একবার অনুভব করেছো। তুমি জান সে কি বস্তু এবং নিশ্চয়ই সেসব আবার আসবে। বীর্যবন্ত এবং দৃঢ় হয়ে ফিরে আসবে। নির্ভরতা রেখো—নিজেকে বিচলিত করো না। তাহলেই সে কাজ ত্বরান্বিত হবে।

আমার ভালবাসা জেনো। ইতি—

১০ই আগষ্ট, ১৯৩৬

শ্রীমা—সর্বপ্রথম, তুমি কখনো বিষণ্ণ হবে না এবং বীরস্থির ও নির্ভরশীল হয়ে থাকবে যাতে ১৫ই আগষ্ট শ্রীঅরবিন্দ যা দেন তা গ্রহণ করতে পারো।

প্রীতি-স্নেহ জেনো। ইতি—

৩০শে আগষ্ট, ১৯৩৬

মাগো,

আমি বুঝতে পারছি, সব কিছুই আমি হারিয়ে ফেলেছি।

যা-কিছু আমার ভাল ছিল সবই আমি হারিয়ে ফেলেছি। আগে আমি ভাবতাম যা-কিছু করি সবই তোমার জন্যে—সকল কাজের মধ্যেই আমি অনুভব করতাম এই ভাবটি। কিন্তু এখন দেখছি আমার সেই ভাবটি হারিয়ে ফেলেছি। ইতি—

তোমার ছোট্ট মেয়েটি

আমার ছোট্ট মেয়েটি

তুমি কি এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছো। নিশ্চয়ই তার একটা কারণ আছে...অধিকন্তু এই সময়টায় যখন আশ্রম-দর্শকদের ভীড় বেশি হয় তখন এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয় যা চেতনাকে ঘোলাটে করে দেয়। কাজেই তুমি এ বিষয় নিয়ে দুঃখিত হয়ো না, শুধু শান্তি এবং ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করো। দেখবে সে অবস্থা আবার ফিরে আসবে। আমার ভালবাসা সর্বদাই তোমার সঙ্গে রইল যাতে তুমি এই কঠিন অবস্থা পার হয়ে আসতে পারো। ইতি—

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬

শাশ্বত ছোট্ট হাসি,

হাসো, খুব হেসে যাও, বিপদ যখন সামনে তখনও হেসে যাও! হাসি হলো সূর্যকিরণের ছটা যা সবস্তু মেঘ নিশ্চিহ্ন করে দেয়...তুমি যদি কোনো মৌলিক প্রতিকার চাও তা রয়েছে এর মধ্যে অকপট হও—পরিপূর্ণরূপে অকপট; যা হয় তোমার মধ্যে সবই আমাকে জানাবে। তাহলে খুব শীঘ্রই তুমি নিরাময় হয়ে উঠবে এবং সেই নিরাময় হবে সুখময়। ইতি—

তারিখহীন, ১৯৩...

ছোট্ট হাসি,

যাতে হাসিটি তোমার 'শাশ্বত' হয় তার জন্যে তোমাকে শিখতে হবে আমার কাছে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে।

এবং আরো ভালো হয় যদি তুমি কোনো কিছুতেই রাগ না করো। যদি রাগ এসেই পড়ে তাহলে তোমাকে শিখতে হবে তাড়াতাড়ি সেটা ভুলে যেতে; এবং তা যদি সম্ভব না হয় তবে আমার কাছে খোলাখুলিভাবে বলবে কি হয়েছে, যাতে আমি আমার ছোট্ট হাসির চেতনা থেকে সেগুলি দূর করে দিতে পারি এবং তাকে আনন্দ এবং শান্তি ফিরিয়ে এনে দিতে পারি।

আমার আশীর্বাদ জেনো। ইতি—

তারিখহীন, ১৯৩...

আমার ছোট্ট হাসি,

ধৈর্য এবং সাহস হারিও না, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

যখন তুমি Silence ফুলটি এব্রুয়ডারি করছিলে তোমার সেই তখনকার অবস্থাটি

আর হয়তো কখনো ফিরে আসবে না। জগতের এই রকমই নিয়ম। কোনো জিনিষই ঠিক অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয়বার ঘটে না। সব কিছুরই পরিবর্তন হচ্ছে—সব কিছুরই অগ্রগতি হচ্ছে। কাজেই পূর্বে তুমি যে মানসিক অবস্থা অনুভব করেছিলে ঠিক সেটাই ফিরে না এলেও ভবিষ্যতে তুমি তার চেয়েও গভীরতর এবং পূর্ণতর শান্তি অনুভব করবে।

আত্মাহুতিকে তীব্রতর করে রাখা দরকার, সকল বাধা-বিপত্তিকে জয় করবার সংকল্প রাখা দরকার আর সেই সঙ্গে প্রয়োজন ভগবানের কৃপার প্রতি অটল বিশ্বাস।

শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তরের জন্য সাধনা করেছেন। সুতরাং তুমি কেমন করে একথা বিশ্বাস না করে থাকবে যে, শ্রীঅরবিন্দের জয় হবে না? আমার ভালবাসা জেনো।

—ইতি

তারিখহীন, ১৯৩...

আমি শুধু তোমাকে এই কথা বলতে চেয়েছি যে তুমি তখন খুব সুখী ছিলে এবং শিশু ও পশুদের যেমন বিশ্বাস থাকে তোমারও ছিল ঠিক তেমনি বিশ্বাস। সুখী ছিলে কিন্তু জানতে না কেন তুমি সুখী? এখন তোমাকে শিখতে হবে কেমন করে সুখী হওয়া যায়। তোমাকে এখন কারণ জেনে সুখী ও বিশ্বাসী হতে হবে। ইতি—

—সমাপ্ত—

একরাশি ফুল

রবেন সেনগুপ্ত

পণ্ডিচেরী মহাতীর্থ,
কত লোক করে আনাগোনা
কত বৃদ্ধ, কত যুবা,
কত-না কিশোর
হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য দিয়ে
দণ্ডে দণ্ডে গড়ি তোলে শান্ত সে মন্দির—
যে-মন্দিরে করি অধিষ্ঠান
নররূপী ভগবান
বিতরেণ মানবেরে শান্তি ধ্রুবফল।
অমূর্ত যে সাধন-সম্পদ
স্তব্ধ হয়ে রহিয়াছে
হেথাকার আলোকে-বাতাসে
—মৃত্তিকার প্রতি অণু ঘিরে,
তারি স্পর্শ লাগি
ফিরে ফিরে আসে
উন্মুখ হৃদয় যত।
একদা একটি শিশু—
শান্ত সুদর্শন,
গ্রীবাদেশ ঢেকে আছে দীর্ঘলম্বী কেশে,
নয়নে কোমল জ্যোতি,
সুন্দর ললাট
তনুদেহে ঘিরে আছে স্বর্গের মাধুরী,
আসিল আশ্রমমাঝে
জননীর সাথে,
ফুল্ল কুসুমের মতো।
তখন দিয়েছে দেখা তরুণ প্রভাত
পথপার্শ্বে বৃক্ষচূড়ে,
সমুদ্র সৈকতে:
পল্লবের শিহরণে,
বিহঙ্গ-সংগীতে
চিরযাত্রী ধরণীর যাত্রা হয় শুরু
নবীন উদ্যমে।
পুষ্পগন্ধ-আমোদিত আশ্রম-প্রাঙ্গনে

জননী দাঁড়ায়ে আছে করি যোড় কর
মুগ্ধ শিশু বার বার চাহিতেছে
মাতৃমুখপানে.
তারপর সহসা কী ভেবে
আপনার দুটি হস্ত যুক্ত করি
নয়ন মুদিয়া
প্রণমিল ভূমিতে লুটায়ে।
প্রখর উষার আলো, দক্ষিণ সমীর
স্পর্শ করি ধন্য হলো ক্ষুদ্র শিশুটিরে:
সমগ্র আশ্রমভূমি চকিতে দেখিল চাহি
একরাশি ফুল
পড়ে আছে পদপ্রান্তে
বিশ্বজননীর।

অদ্বৈত সমুদ্র

শ্রীঅরবিন্দ

স্তব্ধতা আমাকে ঘিরে, অনির্বচনীয় ব্যাপ্তির প্রসার—
শ্বেতবিহঙ্গ পাখায়ে ভোরে আর ঘুরে ফেরে চারদিকে
নিঃশব্দ সমুদ্র যেন আকীর্ণ নিঃস্বর এক স্বর্গ লোকে
নীলাম্বরী চেয়ে আছে নীলাম্বরে, অনিমেষ অনিমিখে!

স্তব্ধতা ও সীমাহীন অসীম-অনুভবের একাত্মীয়ে
হৃদয় আমার ধায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নেয় আলিঙ্গনে,
নেয়, যতক্ষণ তার বিগত সর্বস্ব না-হয় যথার্থ
প্রচণ্ড শক্তির আর একক বিশালতার অন্বিতীয়ে।

নামহীন, দেহহীন কে যেন সেখানে ধ্যানমগ্নতায়
বিবেকে জাগর আর একাকী নির্জন, অনন্ত, অমর—
আর একা-একা তবু এক চিরায়ত আনন্দমর্মরে
হৃদয়ে রাখবে বলে চিরকাল, সব কিছু ভড়ো করে।*

অনুবাদ সুনীল মজুমদার

---

* মূল কবিতার শিরোনাম: Ocean Oneness

একমেবাদ্বিতীয়ম্

শ্রীঅরবিন্দ

সকলেই প্রতান্বিত, চলেছে সেই সর্বশক্তিমানের স্বেচ্ছাচারে—
তবু সকলেই ভাবে নিজস্ব বাসনা ও খেয়ালে চলে তারা যুগে :
ঘৃণা যে করছে, সে তো নিজেই জানেনা নিজেরেই সে যে ঘৃণা করে—
নিজেরই জন্য যে সব প্রেম ভালোবাসা চালা, দয়িত জানেনি নিজে।

সকলের ভেতরেই সেই এক সত্তা, রয়েছে হাজারো দেহে মিশে—
সেখানে প্রান্তরবেণুপে রাখালিয়া সুরে কৃষ্ণের বাঁশির বাজে তান
সেখানে ভস্মাচ্ছাদিত জটাজুটধারী মহাদেব থাকে ধ্যানে বসে—
মহাদেব আর কৃষ্ণ, দুজনেই যে আসলে এক, এক ভগবান।

আমাদের ভেতরেও কৃষ্ণ খুঁজে ফেরে প্রেম ও আনন্দরভস
আমাদের ভেতরেও মহাদেব বুঝে মরে ধরিত্রীর দুঃখশোক
আমাদের সকলের ভেতরেই রয়েছেন সেই আত্মা, সয়ে যান অসন্তোষ—
ব্যথাবেদনায় তিনি কেঁদে হন সারা, চান নিয়তির মুক্তি হোক।

আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়, সেতো আমারই কুণ্ঠিত অগৌরব—
শত্রুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়, এ যে কৃষ্ণেরই মুখাবয়ব।*

অনুবাদ সুনীথ বসুমদার

---

* মূল কবিতার শিরোনাম The One Self

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

Tales of Prison Life	Sri Aurobindo	5·00
Words of Sri Aurobindo	1st Series	2·50
Words of Sri Aurobindo	2nd Series	4·00
যোগসাধনা ও যোগের উদ্দেশ্য	শ্রীঅরবিন্দ	১·৫০
উত্তরপাড়া অভিভাষণ	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর আশ্রম		২·০০
গীতার ভূমিকা	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে	শ্রীঅরবিন্দ	০·৭৫
যোগসাধনার ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ	২·৫০
মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন	শ্রীঅরবিন্দ	৯·০০
মায়ের আলাপ	শ্রীমা	৩·০০
শিক্ষা	শ্রীমা	২·০০
শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী		২·০০
যোগসমন্বয় প্রসঙ্গ	অনির্বাণ	১৫·০০
মা কি বলেন	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩·০০
শতাব্দীর প্রণাম		
স্মৃতির পাতা ১ম পর্যায়		যন্ত্রস্থ
স্মৃতির পাতা ২য় পর্যায়		৪·০০
শ্রীঅরবিন্দায়ন (সচিত্র শ্রীঅরবিন্দের জীবন বাণী ও সাধনা)	নীরদবরণ	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দ-প্রসঙ্গ	দীনেন্দ্রকুমার রায়	১·৮০
শ্রীমা-প্রসঙ্গ	কে. আর. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	২·৮০
শ্রীঅরবিন্দ—জীবন ও যোগ	প্রমোদকুমার সেন	৫·০০
বিশ্বমানবের এগিয়ে চলা	চারুচন্দ্র দত্ত	৩·৫০
কে এই মা ?	পশুপতি ভট্টাচার্য	৫·০০
দিব্য জীবনের সন্ধানে		৩·৫০
শ্রীঅরবিন্দ ও মায়ের নূতন বার্তা	,, ,,	১·৫০
মা আজও আছেন	,,	৪·০০
শ্রীঅরবিন্দের দিব্যকর্মযোগ	সুধা বসু	৫·০০
Sri Aurobindo on Man	D. P. Chattopadhyaya	1·80
শ্রীঅরবিন্দ জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ		৭·০০

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

ফোন : ৩৪-২৩৭৬

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
Sreepore Bagharghole
P.O. Bonhooghly, 24 Parganas

Head Office :
34: 1, Puddapukur Road
Calcutta-20

Phone : 47-2869

With the best Compliments from :—

Ellora Enterprise

Paper & Board Merchants

57/2A, College Street
Calcutta-12

Phone: 34-3720

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works (P.) Ltd.

90, Benaras Road,
H O W R A H.
Phone 66-2434

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড.	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০
অষ্টম খণ্ড :	সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়	২·০০
	প্রথম খণ্ড থেকে অষ্টম খণ্ড একত্রে বাঁধাই	২০·০০

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা সংগ্রহ

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০১২

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবার্ষিকী। শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির যথাযোগ্য ভাবে শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করবে। অন্যতম একটি অংশ পালিত হবে শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা প্রকাশনের মাধ্যমে। শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা মূল ইংরাজী এবং ইংরাজী থেকে বাংলার অনূদিত ১৫ খণ্ডে প্রকাশ হবে। তাতে থাকবে তাঁর লেখা কাব্য ও গদ্য পুস্তকাকারে লেখা, গ্রন্থ ও উত্তর, প্রবন্ধ, পত্রাবলী ইত্যাদি। আশা করা যায় সমগ্র ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

প্রাক প্রকাশনী মূল্য—৩০৲ টাকা (ডাকমাশুল ৩৫৲ টাকা) (গ্রাহকদের জন্য)
প্রকাশ হবার পরবর্তী মূল্য—৪৫০৲ টাকা (ডাকমাশুল ৫০৲ টাকা)

শ্রীঅরবিন্দের সমগ্র রচনা সংগ্রহ অক্ষরগুলি [illegible] মোট ১৫ খণ্ডে প্রকাশ করা হবে। [illegible] চাটপে ছাপাই ও ভাল কাগজে মজবুত বাঁধাই হবে সুদৃশ্য জ্যাকেট মোড়া থাকবে। খুব কম সংখ্যা ছাপানো হবে।

—গ্রাহক হবার নিয়মাবলী—

১। ৩০৲ টাকা অগ্রিম দিয়ে গ্রাহক হতে হবে ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৬ তারিখের মধ্যে।
২। প্রতিটি খণ্ড প্রকাশ হলে গ্রাহকদের জানানো হবে এবং ২০৲ টাকা দিয়ে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৩। শেষ দুই খণ্ড অর্থাৎ ১৪ ও ১৫ খণ্ড সংগ্রহ করবার সময় গ্রাহকের জমা ৩০৲ টাকার সঙ্গে হিসাবনিকাশ করা হবে।
৪। যোগাযোগ করার স্থান :—

(ক) শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির,
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা–৭০০০১২

(খ) শ্রীঅরবিন্দ ভবন,
শ্রীঅরবিন্দ-ভবন, ৮ পেস্তমপীর সরণী, কলিকাতা–৭০০০১৬

[রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সরকারী সাহায্যের জন্য চেষ্টা চলছে। এতে সাহায্য পাওয়া গেলে বইএর মূল্য হ্রাস করা হবে।]

18 JUN